কবি ও কর্মী

রবীন্দ্রনাথ ও কালীমোহন ঘোষ

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

উৎসর্গ

কালীমোহন ঘোষের
দুই পৌত্র
আমার স্নেহভাজন
আলোকময় (বাবুই)
ও
শমীক (কুকুল)-কে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রী সলিল ঘোষ ❑ শ্রী অনাথনাথ দাস
❑ শ্রীমতী সুপ্রিয়া রায় ❑ শ্রীমতী সবুজকলি সেন
❑ শ্রীমতী দীপ্তি চট্টোপাধ্যায় ❑ শ্রী দিলীপ হাজরা
❑ শ্রী আশিস হাজরা ❑ শ্রী সমীরণ নন্দী
❑ শ্রী নন্দকুমার মুখোপাধ্যায়
❑ শ্রী সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

নিবেদন

কবি রবীন্দ্রনাথের এক অনন্য সৃষ্টি শ্রীনিকেতন, শান্তিনিকেতনের সম্পূরক বলেও তার খ্যাতি। এর অন্যতম রূপকার কালীমোহন ঘোষ। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহচরও তিনি।

মহাপ্রয়াণের কয়েকমাস আগে ১৯৪১ সালের ২১ জানুয়ারি কালীমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র শান্তিদেবকে তাঁর 'শুভার্থী' রবীন্দ্রনাথ এক মর্মস্পর্শী ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখেছিলেন, "... আমি তোর পিতার পিতৃতুল্য।" রবীন্দ্রনাথ কিভাবে কালীমোহনের 'পিতৃতুল্য' হয়ে ওঠেন, কিভাবেই-বা উভয়ের মধ্যে পিতাপুত্রের সম্পর্ক গড়ে ওঠে মূলত তাই এই বইয়ের বিষয়বস্তু।

আমরা জানি কবির জীবনব্যাপী কর্মসাধনার পরিচয় রয়ে গেছে বিশ্বভারতীর উপরোক্ত দুই প্রতিষ্ঠানে : শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে। এই কর্মসাধনা হল কবির মনুষ্যত্ব সাধনা। সেই সাধনায় যাঁরা তাঁর সহায়ক হয়েছেন, দৃষ্টি এবং মন মিলিয়েছেন আমরা তাঁদের 'পরিকর' আখ্যা দিয়েছি। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে বলা যায় এই সমপ্রাণ সহযোগীরাই তাঁর সৃষ্টিকার্যে নিজেদের 'সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছিলেন', 'আশ্রম-নির্মাণকার্যে' প্রত্যেকেই হয়েছিলেন 'নিপুণ স্থপতি'। এই পরিজনদের অবিচলিত অকৃত্রিম প্রীতি, 'সর্বভারবাহী সর্বত্যাগী সৌহার্দ্য' এবং 'অবিমিশ্র শ্রদ্ধা' ঋণী করেছে কবিকে, তাঁর জীবনকে করেছে সমৃদ্ধ। বিদায়লগ্নে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন রচনায় সেই সহকর্মীদের কাছে ঋণ স্বীকার করে বলেছেন, "নানা কর্মী, নানা বন্ধু আশ্রমের সাধনা ক্ষেত্রে সমবেত হয়েছেন এবং আপন আপন শক্তি ও স্বভাবের বিশিষ্টতা অনুসারে আশ্রমের গঠন কার্যে ক্রমশ বিচিত্র উপকরণ জুগিয়ে এসেছেন। সৃষ্টিকার্যে এই বৈচিত্র্যের প্রয়োজন আছে।"

আত্মোৎসর্গপরায়ণ কালীমোহন ঘোষও ছিলেন ওই রবীন্দ্র-পরিকরদের দলে। বিচিত্রকর্মা পুরুষ তিনি, পল্লীসেবাব্রতী ও শিক্ষাবিদ্‌রূপে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। শুধু বিলেত নয় রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে সমবায় প্রথা আর পল্লীসংস্কারের কর্মসূচি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করেছেন দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ এবং পশ্চিম এশিয়া। সকল কাজের কাজী তিনি। কখনো বিশ্বভারতীর প্রয়োজনে অর্থসংগ্রহের জন্য ছুটেছেন নিজামের দরবারে, আবার কখনো গুরুদেবের ভ্রমণসূচিকে চূড়ান্ত রূপ দিতে পৌঁছেছেন ঢাকা-পূর্ববঙ্গ কিংবা শ্রীলঙ্কায় (তৎকালীন সিংহল)। গান্ধিজী, নেহরু, সুভাষচন্দ্র সকলের কাছেই তাঁর স্বচ্ছন্দ গতায়াত। সর্বত্রই তিনি তাঁর গুরুদেবের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। আবার দেশের যেখানেই বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী কিংবা সাম্প্রদায়িক সংঘাত সেখানেই ডাক পড়েছে তাঁর, তিনি যে আর্তত্রাণের ব্রতীও।

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংগঠন রূপায়ণে কালীমোহন ও লেনার্ড এলম্‌হার্স্ট ছিলেন বুদ্ধদেবের দুই শিষ্য সারিপুত্র ও মোদ্‌গল্ল্যায়নের প্রতিভূ।

এই আপাতবিস্মৃত নিবেদিতপ্রাণ পল্লীসেবকের জীবনকথা প্রকাশে প্রয়াসী হয়েছেন দে'জ পাবলিশিং সংস্থার অধিকর্তা শ্রী সুধাংশুশেখর দে। উৎসাহ জুগিয়েছেন বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রী স্বপন মজুমদার। উভয়কেই জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

৭ই পৌষ ১৪১২ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন

সূচি

কালীমোহন-কথা

শ্রীনিকেতনের অন্যতম রূপকার কালীমোহন ঘোষের জন্ম হয় অবিভক্ত বঙ্গের ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর শহরের দক্ষিণে বাজাপ্তি গ্রামে। সময় ১৮৮২, মতান্তরে ১৮৮৪। পিতা দীননাথ ঘোষ, মাতা শ্যামা সুন্দরী। বাজাপ্তির দত্ত পাড়ার জমিদার কালীচরণ দত্ত তাঁর পাঁচ-ছ বছরের কন্যা শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে দরিদ্র অথচ কুলীন পরিবারের বারো-তেরো বছরের সন্তান দীননাথের বিবাহ দিয়ে জামাতাকে স্থায়ীভাবে বাজাপ্তি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন। দুই পুত্র, পাঁচ কন্যা ও পত্নীকে রেখে দীননাথ অকালে মধ্যবয়সে সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। শ্যামাসুন্দরী দেবী খুব কষ্টের মধ্যেই ছেলেমেয়েদের পালন করেন, একে একে পাঁচ মেয়ের বিবাহ দেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্গামোহনেরও বিবাহের পর অল্পবয়সে মৃত্যু ঘটে। কালীমোহন ছিলেন কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁকেও দারুণ আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়াশুনো করতে হয়। এন্ট্রাস পরীক্ষায় ভালোভাবে উত্তীর্ণ হবার পর তাঁর বিবাহ হয় চাঁদপুর শহরের প্রখ্যাত উকিল দীননাথ বসুর দ্বিতীয়া কন্যা মনোরমার সঙ্গে। কালীমোহনকে কলেজে পড়ানোর দায়িত্ব দীননাথবাবুই গ্রহণ করেন। কালীমোহন ভর্তি হলেন কোচবিহার রাজ কলেজে, সেখানকার ছাত্রাবাসে স্বল্পখরচে থাকার ব্যবস্থা ছিল। তখন ওই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

এমন সময়ে ১৯০৩ সালে বাংলাদেশকে দু'টুকরো করার ঘোষণার পর শুরু হয় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। কালীমোহন জড়িয়ে পড়েন সেই আন্দোলনে, ছেড়ে দেন কলেজের পড়া। অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্যরূপে মেতে ওঠেন পূর্ববাংলার গ্রামেগঞ্জে ইংরেজ শাসন বিরোধী ও বিদেশী পণ্য বর্জনের প্রচারে। সেই সময়ই তাঁর সুযোগ হয় বাংলাদেশের পল্লীগ্রামকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার। নিরক্ষর, দরিদ্র পল্লীবাসীরা তাঁকে অত্যন্ত কাছের লোক মনে করতেন, ভালোবাসতেন। তাছাড়া তখনকার শিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গেও কালীমোহনের নিবিড় পরিচয় ঘটে। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচারের কাজে গেলে আশ্রয় পান সোনারং গ্রামে। সেখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয় যুবক ক্ষিতিমোহন সেনের—দুই যুবকের মধ্যে গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব। উভয়ের আলোচ্য বিষয় তখন ছিল রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর কাব্য। ইতিমধ্যে ১৯০৬ সালে বরিশালে প্রাদেশিক সম্মিলন উপলক্ষে যে সাহিত্য সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কালীমোহন প্রাদেশিক সম্মিলনে যোগ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। কিছুকাল আগেই ১৯০৪ সালে জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথ পেশ করেছেন 'স্বদেশীসমাজ' গঠনের পরিকল্পনা। ১৯০৮ সালে অনুষ্ঠিত পাবনা সম্মিলনে সেই প্রসঙ্গেই তাঁর সঙ্গে আলোচনা হয় কালীমোহনের। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পছন্দ করলেন—জানালেন কিভাবে তাঁর

জমিদারীতে পল্লীসেবার কাজ আরম্ভ করবেন তার কথা। কালীমোহন তাতে আকৃষ্ট হলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সেই পল্লীসংস্কারের কাজে যোগ দিতে আহ্বান জানালে সানন্দে ও সোৎসাহে সম্মতি দিলেন কালীমোহন। কাজও আরম্ভ করলেন রবীন্দ্রনাথের জমিদারী শিলাইদহ অঞ্চলে—আর চারজন যুবক ভূপেশচন্দ্র রায়, অনঙ্গমোহন চক্রবর্তী, প্যারীমোহন সেন ও অক্ষয়চন্দ্র সেন হলেন তাঁর সঙ্গী। গ্রামে গ্রামে তাঁদের সকলকেই ঘুরতে হত। কিন্তু দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী কালীমোহনের শরীর অচিরেই ভেঙে পড়ে। কয়েক মাসের মধ্যেই কাশরোগে আক্রান্ত হন। অথচ পল্লীবাসের কাজে তিনিই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বস্ত সহচর। সেই সংকটের কথা স্মরণ করেই ১৯৩৯ সালে শ্রীনিকেতনের কর্মীদের সভায় গুরুদেব বলেছিলেন—"তখনকার দিনে এই কাজে আমার একমাত্র সহায় ছিলেন কালীমোহন। তাঁর রোজ দু'বেলা জ্বর আসত। ঔষধের বাক্স খুলে আমি নিজেই তাঁর চিকিৎসা করতুম। মনে করতুম তাঁকে বাঁচাতে পারব না।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসায় এবং স্বাস্থ্যোদ্ধারের ব্যবস্থায় আরোগ্যলাভ করেন কালীমোহন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সেকালের বাঙালিদের স্বাস্থ্যনিবাস গিরিডিতে পাঠিয়ে দেন। সেখানে কালীমোহনের স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি ঘটে। তাছাড়া সেখানকার অধিবাসী কয়েকটি ব্রাহ্ম-পরিবারের সঙ্গেও তাঁর গড়ে ওঠে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। স্বাস্থ্যের উন্নতি হলেও শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ নয়—এই বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আর শিলাইদহে পাঠালেন না—দায়িত্ব দিলেন শান্তিনিকেতনের শিশুবিভাগের দেখাশুনার। ১৯০৭/৮ সালে এ-ভাবেই কালীমোহনের শান্তিনিকেতনের কর্মজীবনের সূত্রপাত ঘটে। এই কর্মজীবনের পরিচয় পাই 'শান্তিনিকেতনের এক যুগ' গ্রন্থের লেখক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিচারণে—"কালীমোহনবাবুর মহৎ গুণ—কাজের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা। যে কাজই দেওয়া হত সে কাজটিই তিনি প্রাণ দিয়ে করতেন। বেশ কিছু দিন তিনি শিশুদের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন ; গৃহাধ্যক্ষ হিসাবে ছোটোদের আবাসগৃহে তাদের সঙ্গেই তিনি থাকতেন। তাদের সুখ সুবিধার প্রতি তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। মিষ্টভাষী মিশুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বলে ছোটোদের সঙ্গে ভাব জমাতে তাঁর একটুও বিলম্ব হত না। পড়াতেন বাংলা এবং ইতিহাস। পুরোনো ছাত্রদের মুখে শুনেছি তিনি ক্লাসে গ্রীক রোমান ইতিহাসের কাহিনী পড়ে শোনাতেন আর অতিশয় স্বদেশবৎসল মানুষ ছিলেন বলে সেইসঙ্গে ভারতীয় বীরদের শৌর্যবীর্যের কাহিনীও খুব গর্বের সঙ্গে জাঁকিয়ে বলতেন। ছেলেরা খুব রোমাঞ্চিত বোধ করত।"

শিশুবিভাগের দায়িত্বে থাকলেও গ্রাম-উন্নয়নের কাজ থেকে বিরত হননি কালীমোহন। অবসর পেলেই চলে যেতেন শান্তিনিকেতনে প্রতিবেশী ভুবনডাঙায় কিংবা সাঁওতালপল্লীতে। এ-কাজে তাঁর সহযোগী হত বিদ্যালয়ের বয়স্ক ছাত্ররা। কয়েকবছর পর ১৯১৩ সালে তাঁকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন রবীন্দ্রনাথের 'বিদেশী সখা' উইলি 'পিয়ার্সন।

১৯১১ সালে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য কালীমোহনবাবু ইংলন্ডে যাবার সুযোগ পান। এ-ব্যাপারে কিছু শুভানুধ্যায়ী ও বন্ধুবান্ধব তাঁকে আর্থিক সাহায্য করেন। ইংলন্ডে

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন তিনি। ওই ১৯১২ সালেই পুত্র-পুত্রবধূ সহ রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হন সেখানে। সে-সময়েই প্রকাশিত হয় ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'—ইংলন্ডের কবি ও ভাবুকসমাজে তা দারুণ আলোড়ন তোলে—শুরু হয় রবীন্দ্র-বন্দনা। কালীমোহনবাবু সে-সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীরূপে ইংরেজ সাহিত্যিক-শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের সান্নিধ্যলাভে সমৃদ্ধ হচ্ছেন, গড়ে তুলছেন তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। কবি ইয়েট্‌স্ আর এজরা পাউন্ডের সঙ্গে কালীমোহনবাবু ও কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। 'পিতৃস্মৃতি'-তে রথীন্দ্রনাথ লিখছেন—"চোখে পড়বার মতো আর-একজন ছিলেন য়েটস—অতি সহৃদয় মানুষ। তিনি তখন রাসেল স্কোয়্যারের নিকটবর্তী ওর্বান প্লেসে এক জুতোর দোকানের উপরতলার ছাদের ঘরে বাস করতেন। কালীমোহন ঘোষ ও আমি বহু সন্ধ্যা যাপন করেছি য়েট্‌সের চিলেকোঠায়, অনেক রাত অবধি গল্পগুজবে কেটেছে। বাবার কাছে নিত্যনতুন লোকের আনাগোনা চলছে। আমি ও কালীমোহনবাবু এদিকে আমাদের উদ্‌বৃত্ত সময়টুকু কাটাচ্ছি য়েট্‌স ও এজরা পাউন্ড-এর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে।"

এই সময়কার আর-একটি ঘটনা উল্লেখ্য—কবির অন্তরঙ্গ শিল্পী বন্ধু রোটেনস্টাইন তখন পার্লামেন্ট হাউসে কিছু ভারতীয় দৃশ্য আঁকছিলেন—তাতে বারাণসী ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিটির ছবি তিনি কালীমোহনবাবুর আদলেই আঁকেন—মডেল হিসেব তাঁকেই বেছে নিয়েছিলেন।

কিছুকাল ইংলন্ড-বাসের পর কালীমোহনবাবুকে ফিরে আসতে হল শান্তিনিকেতনে, কেন না বন্ধুদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুত অর্থসাহায্য তিনি পাননি। দেশে ফিরে আবার যোগ দিলেন শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের কাজে। বিদ্যালয়ের প্রতিটি অনুষ্ঠানে উল্লেখ্য ভূমিকা নিয়েছেন তিনি—পৌষ উৎসব থেকে শুরু করে মহর্ষি-স্মরণ সবকিছুরই সঙ্গে তাঁর সক্রিয় সম্পর্ক। আবার পল্লীসেবার কাজকেও ভুলে থাকেননি। তাঁর বাল্যজীবন কাটে পল্লী-পরিবেশে, যৌবনে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাংলার গ্রামাঞ্চলের মানুষের সুখ দুঃখ, অভাব-অভিযোগ ও নানাবিধ সমস্যার সম্যক্ পরিচয় পেয়েছেন। তারপর গুরুদেবের জমিদারীতে গ্রাম-উন্নয়নের কাজ করে সঞ্চয় করেছেন বিপুল অভিজ্ঞতা। এমন কি, সেসময় তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল শিলাইদহ অঞ্চলের লালন ফকির সম্প্রদায়ের—তাঁদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন বাউলগান। পল্লীজীবন সম্পর্কে তাঁর এই অভিজ্ঞতার কথা আশ্রমগুরুর অজানা ছিল না। তাই তিনি এই আদর্শবাদী গ্রামদরদী সহকর্মীকে কেবল বিদ্যালয়ের কাজে ধরে রাখেননি—বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে গ্রামজীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকার উপদেশ দিয়েছেন কালীমোহনকে। পরবর্তীকালের ইতিহাস রবীন্দ্রনাথের সেই ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিরই সাক্ষ্য দেয়।

১৯২২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি শ্রীনিকেতনের পল্লী সংগঠন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথের তরুণ ইংরেজ বন্ধু লেনার্ড নাইট এলমহার্স্ট্ অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আর শিশুবিভাগের অধ্যক্ষ কালীমোহন হলেন পল্লীসেবা বিভাগের পরিচালক। এ-প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্যটি উল্লেখ্য—'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে তিনি লিখছেন—"বস্তুত, এ দুই কাজের স্বরূপ ভিন্ন নয়। শিশুরা যেমন অসহায় আমাদের

দেশের গ্রামের লোকও তেমনি অসহায়। শিশুদের মতোই তাহারা নিজেদের ভালোমন্দ বোঝে না ; তাহাদের দেখিবার কেহ নাই, তাহারা একান্ত নিঃসম্বল, নিরাশ্রয়। সত্যকার দৃষ্টিতে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন একই ভাবের ভিন্ন বিকাশ মাত্র ; একটি শিশুচর্যা প্রতিষ্ঠান, আর একটি বয়স্ক-শিশুচর্যার স্থান।"

যা হোক্, রবীন্দ্রনাথের নির্দেশমত শ্রীনিকেতন পল্লী সংগঠন বিভাগের প্রাথমিক কার্যক্রম রচনা করেন এলমহার্স্‌ট্ ও কালীমোহন। স্থির হয় কাজ করার মধ্যে দিয়ে সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁরা কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করবেন। সেই কার্যক্রমের বর্ণনা দিয়েছেন কালীমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র শান্তিদেব ঘোষ।—"এলমহার্স্‌ট্ প্রথমেই পিতৃদেবের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে শ্রীনিকেতনের নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রামের মানুষদের সামগ্রিক জীবনের পরিচয় নিলেন। গ্রামবাসী ধনী দরিদ্র সকলের সঙ্গে পিতৃদেবের মাধ্যমে চেষ্টা করলেন তাদের জীবনের সামগ্রিক পরিবেশকে জানতে। তারপর তাঁরা স্থির করলেন গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনাকে দু'ভাগে ভাগ করে তাঁরা কাজে নামবেন। স্থির হল, শ্রীনিকেতনে চলবে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ লোক মারফৎ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক উন্নতির প্রয়োজনীয় নানা দিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ এলমহার্স্‌টের নেতৃত্বে ও পরিচালনাধীনে। তাকে কার্যকরীভাবে গ্রামের দরিদ্র সমাজে প্রয়োগ করবার দায়িত্ব থাকবে পিতৃদেবের উপরে। কাজে হাত দিয়ে পিতৃদেব স্থির করেছিলেন গ্রামবাসীদের মনকে সমবায়নীতি এবং আত্মবিশ্বাসে উদ্‌বুদ্ধ করতে হবে। সেই পথেই তাঁর কাজ শুরু হল। পল্লী উন্নয়ন বিভাগের কর্মীদের দ্বারা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা করলেন দরিদ্র কৃষিজীবীদের জন্য ঋণদান ব্যাংক, ধর্মগোলা, কৃষি সমবায়, স্বাস্থ্য সময়বায়, শিক্ষা সমবায়, শিল্প সমবায়। ব্রতীবালক দল গঠন করে, গ্রামবাসীদের সমবেত প্রচেষ্টায় গ্রামের পথঘাট তৈরি, জলাজঙ্গল ডোবা সংস্কার, এবং সালিসী বিচারের দ্বারা গ্রামবাসীদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ, মামলা মকদ্দমার মীমাংসার কাজে হাত দিলেন। গ্রামের স্বল্প শিক্ষিতদের জন্য ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার, ম্যালেরিয়া-নিবারণী সমিতি, অস্পৃশ্যতা বর্জন সমিতি গঠন করলেন। আঞ্চলিক লোক সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে এই অঞ্চলের গ্রামবাসীদের গান, বাজনা নাটকের অভিনয়, নানাপ্রকার কারুশিল্প ও খেলাধূলাতে উৎসাহিত করতে লাগলেন। ১৩৩৬ সালের বৈশাখ মাসে, পল্লীসেবা বিভাগের ব্রতীবালক সংগঠনের নেতা ধীরানন্দ রায়ের সম্পাদনায় 'ব্রতীবালক' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটি কিছুকাল পরে বন্ধ হয়ে যায়। ১৩৪৬ সালের বৈশাখে পল্লীসেবা বিভাগ থেকে 'দেশ-বিদেশ' নামে আরেকটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন পিতা নিজে। এই পত্রিকা দু'টি স্বল্পমূল্যে গ্রামের ব্রতীবালক ও কর্মীদের মধ্যেই বিলি করা হত—গ্রামবাসীদের নানাবিধ খবর শোনাবার জন্য। গ্রামসমাজের সর্বাঙ্গীণ পরিচয়ে পিতৃদেব যে কতখানি নিখুঁত ছিলেন তার নমুনা রক্ষিত আছে ১৯২৬ সালে প্রকাশিত 'বল্লভপুর' ও ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত 'রায়পুর' গ্রামের 'তথ্য-সংগ্রহ' পুস্তকে। গ্রন্থ দুটিতে সে-যুগের ওই দুটি গ্রামের পরিচয় যেভাবে রেখে গেছেন, তা পড়ে বিস্মিত হতে হয়। সে-যুগের কোনো গ্রামের এরূপ তথ্য সংগ্রহের কাজ আর কোথাও হয়েছিল কি না জানা যায় না।"

এ-রকম গ্রামোন্নয়নের কাজে কোনো বাধা আসেনি তা নয়। প্রথম বাধা এসেছিল তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকবর্গের কাছ থেকে—প্রকাশ্যে নয়, পরোক্ষে। শাসককুলের ধারণা ছিল পল্লীসংস্কারের কাজের পিছনে নিশ্চয়ই কোনো রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি আছে। তাদের এই ধারণা ও সন্দেহের অন্যতম কারণ ছিল কালীমোহনের যৌবনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ—তাই তারা সন্দেহের চোখেই দেখত কালীমোহনবাবুকে। দ্বিতীয় বাধা গ্রামের জমিদার, জোতদার ও মহাজনদের বিরূপ মনোভাব। তারা ভাবত গ্রামের গরিব লোকেরা যদি আত্মনির্ভর হয়ে ওঠে তাহলে ক্ষুণ্ণ হবে তাদের স্বার্থ। পল্লীসংগঠনের কাজের সূচনায় এই দুই প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করতে হয়েছিল কালীমোহনবাবুকে—অবশ্য মনোবল হারিয়ে ফেলেননি—গুরুদেবের প্রেরণায় পূর্ণ উদ্যমে সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করে গেছেন। তাঁর প্রাথমিক কর্তব্য হয়ে উঠেছিল গ্রামবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করা, তাদের মধ্যে অধিকারবোধ জাগিয়ে তোলা। কিন্তু কখন-ই উগ্র হিংসার পথে চালনা করেননি তাদের। বরঞ্চ সে পথ পরিহার করে সুফল পেয়েছেন—ধীরে ধীরে বিদেশী শাসক, জমিদার ও জোতদারদের মন থেকে মুছে গেছে প্রতিকূলতা বিরুদ্ধতা।

তিন বছর অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে এলম্‌হার্স্‌ট স্বদেশে ফিরে যান। তখন কালীমোহনবাবুর উপরে স্বাভাবিকভাবেই আরো বেশি দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। শুধু শ্রীনিকেতনের কাজ নয়, যে-ব্রিটিশ সরকার তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতেন তাঁরা-ই আবার মাঝে মাঝে কালীমোহনের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। ১৯২৭ সালে বাংলা সরকার দরিদ্র গ্রামবাসীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের উপযোগী একটি শিক্ষামূলক-প্রদর্শনী ট্রেনের ব্যবস্থা করেন—বাংলাদেশের ত্রিশটি স্টেশনে ওই প্রদর্শনী-ট্রেন থামে এবং অগণিত গ্রামবাসী সেই প্রদর্শনী দেখার সুযোগ পান। বিদেশী সরকার ওই প্রদর্শনী-পরিচালনার কাজে কালীমোহনের সাহায্য চান। গুরুদেবের সম্মতিক্রমে বিশ্বভারতী থেকে এক মাসের ছুটি নিয়ে কালীমোহনবাবু ওই প্রদর্শনী-ট্রেনের পরিচালনায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৯২৯ সালে বীরভূমে দুর্ভিক্ষ হলে বাংলা সরকার যে-কাজের মারফৎ সাহায্য দেবার পরিকল্পনা করেন তার বাস্তব রূপায়ণের দায়িত্ব বর্তায় কালীমোহনের উপরেই।

১৯৩০-৩১ সালে মূলত এলমহার্স্‌টের উদ্যোগে ও উৎসাহে কালীমোহনবাবু দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ এবং পশ্চিম এশিয়ায় যান। উদ্দেশ্য, ওই অঞ্চলের গ্রাম-উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং সমবায় প্রথা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন। স্ক্যান্ডেনিভিয়া থেকে ইজরায়েল—সর্বত্রই ঘুরেছেন তিনি—পরিচিত হয়েছেন সমবায়-পরিচালিত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে। স্বদেশে ফিরে এক বছরের মধ্যেই শ্রীনিকেতন-সংলগ্ন দশটি গ্রামে গড়ে তুলেছেন 'সমবায়-স্বাস্থ্য সমিতি'—এ কাজে তাঁকে সাহায্য করেছেন শ্রীনিকেতনের চিকিৎসক ও কর্মীবৃন্দ।

কালীমোহনবাবুর কার্যকলাপ কেবল শ্রীনিকেতনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি—সারা জেলায় তাঁর কাজের সীমানা ছড়িয়ে গেছে। বীরভূম জেলা প্রশাসনের সহায়তায় শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের অধ্যাপক, কর্মী ও ছাত্রদের নিয়ে ব্রতীবালক দল গঠন করে বোলপুর নিকটবর্তী মুলুক, জয়দেব-কেঁদুলি প্রভৃতি মেলার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায় প্রদর্শনীর প্রথম ব্যবস্থাপক ছিলেন

তিনি—তাঁরই উদ্যোগে শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে প্রদর্শনীর আয়োজন হয় বছরের পর বছর।

পল্লীসেবায় নিবেদিত-প্রাণ পিতা প্রসঙ্গে শান্তিদেব আরও লিখেছেন—"দরিদ্র-গ্রামজীবনের নানাবিধ উন্নয়নমূলক কার্যপ্রণালী প্রচলনের দ্বারা, দেশসেবার পথে প্রকৃত গুরুর মত পূজনীয় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ-ই পিতাকে পরিচালিত করেছিলেন। এইরূপ কর্মযজ্ঞের সাধনায় গুরুদেব-ই ছিলেন পিতার একমাত্র গুরু। ১৯৩১ সালে পিতৃদেব একটি চিঠিতে গুরুদেবকে লিখেছিলেন—'ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের ভদ্রপরিবারের দারিদ্র্যের মধ্যে জন্মলাভ করিয়া কঠোর সংগ্রামে আমার বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছে। সেজন্য সমাজের অবিচার অত্যাচারের দাগ এখনও অন্তরে জাগ্রত রহিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের ৪ বৎসর ক্রমাগত গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। তখনও দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি যে, আমাদের দুর্গতির মূল কারণ কোথায়? জনসাধারণের অসাড় চিত্তে কোনো নবীন ভাবধারা সঞ্চারিত করা কঠিন কেন? বল্লভপুরের পল্লী পরীক্ষণের কাজে ব্যাপৃত থাকার সময়-ও এদের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে যখন ভাবিত হইয়াছি ; তখনই দেখিয়াছি পল্লীসমাজের ধ্বংসের প্রধান কারণ আমাদের শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায় এবং ধনী মহাজন ও জমিদার তালুকদারগণের উদাসীনতা ও স্বার্থপরতা। পল্লীজীবনের যেটা organised unit সেটা বিচ্ছিন্ন। উহার প্রাণকেন্দ্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যই শ্রীনিকেতন। আমি অন্তত আপনার অভিপ্রায়ে ইহাই বুঝিয়াছি।'—এইরূপ বিবৃতি তাঁর লিখিত অন্যান্য চিঠি ও প্রবন্ধগুলিতে ছড়িয়ে আছে।"

১৯২৩ সালে কালীমোহনবাবু বীরভূমের গ্রামবাসী হিন্দু, মুসলমান ও সাঁওতাল সমাজের নিখুঁত বিবরণ 'পল্লীসেবা' শিরোনামায় তৎকালীন 'সংহতি'-পত্রিকার আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যায় (১৩০০) দুই কিস্তিতে প্রকাশ করেন। এ-যুগের সমাজবিজ্ঞানী গবেষকদের কাছে তা মূল্যবান দলিলস্বরূপ—কেন না এখনকার গ্রামবাসীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বা মানসিক পরিবর্তন কতখানি ঘটেছে—তা কালীমোহনের ওই দুই কিস্তি প্রবন্ধটির সাহায্যে পর্যালোচনা করা সহজ হবে।

কালীমোহনবাবু কেবল শ্রীনিকেতনের কর্মযজ্ঞের সঙ্গে নয়, বিশ্বভারতীর বৃহত্তর কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও বরাবর যুক্ত থেকেছেন। প্রতিষ্ঠানের উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক সমিতির সদস্য ছিলেন তিনি। বিশ্বভারতীর তৎকালীন অর্থ-সংকটের মোকাবিলায় কালীমোহনের ভূমিকা ছিল অনেকখানি। প্রায়ই তাঁকে গুরুদেবের স্বাক্ষরযুক্ত অর্থসাহায্যের আবেদন-পত্র নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের রাজা-মহারাজাদের কাছে ছুটতে হত। ১৯২৭ সালে হায়দ্রাবাদের নিজামের কাছ থেকে যে এক লক্ষ টাকা দান হিসেবে পাওয়া গিয়েছিল তার জন্য কৃতিত্বের অধিকারী কালীমোহনবাবু। নিজামের কাছ থেকে টাকা পাওয়ার সম্ভাবনার কথা জানামাত্রই কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ কালীমোহনবাবুকে লেখেন—"আপনার অদম্য উৎসাহের জন্যই এতটা success বা সম্ভাবনা হয়েছে। আমরা হলে পারতুম না।" টাকা পাওয়ার খবর জানামাত্রই গুরুদেব কালীমোহনকে টেলিগ্রামে অভিনন্দন জানান—"Heartiest appreciation of self and Viswabharati for success. Convey thanks to Mehdi and other friends and helpers."

শুধু অর্থ-সংগ্রহ নয়—বিশ্বভারতীর ব্যাপারে জনসংযোগের ক্ষেত্রেও কালীমোহনের ভূমিকা ছিল স্মরণীয়। বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচারে তিনি ছিলেন অক্লান্ত—তার একটি কারণ হল কালীমোহনবাবু অসাধারণ বাগ্মিতাশক্তির অধিকারী ছিলন। যার ফলে তিনি অনায়াসে শ্রোতার মন জয় করতে পারতেন—তাকে আকর্ষণ করতে পারতেন। তাঁর মূল কাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন দায়িত্বও তাঁর উপরে বর্তেছে। ১৯৩৪ সালে গুরুদেব যখন বিশ্বভারতীর অভিনয়ের দল নিয়ে সিংহল (শ্রীলঙ্কা) যান তখন তার ব্যবস্থাপনায় ছিলেন কালীমোহনবাবু। আবার ১৯৩৮ সালে তাঁরই নেতৃত্বে শান্তিনিকেতনের 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যানাট্যের দল সেকালের পূর্ববাংলা পরিক্রমা করে। ১৯২৬ সালে গুরুদেবের ঢাকা-পূর্ববঙ্গ সফরের সঙ্গী-ও ছিলেন তিনি।

এ-হেন কালীমোহনবাবু আঘাত পেয়েছেন বিশ্বভারতীর কর্মকর্তাদের কাছ থেকে। ১৯৩৩ সালের ঘটনা। কালীমোহনবাবু অনুভব করেছেন তৎকালীন কর্তৃপক্ষ তাঁকে আর সহ্য করতে পারছেন না। সেই অবস্থায় তিনি এক চিঠিতে পদত্যাগ করার বাসনা প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। কালীমোহনবাবু ওই চিঠিতে লেখেন

"শ্রীচরণকমলেষু গুরুদেব,

আপনাকে আরেক দুঃখের সংবাদ দিতেছি। অদ্য প্রাতে আমি শ্রীনিকেতনের কর্মে পদত্যাগ করিয়াছি। গভীর বেদনার সহিত আমার প্রতি আমি এই নিষ্ঠুর আঘাত করিতে বাধ্য হইয়াছি। যৌবনের প্রথম হইতেই বঙ্গদর্শনের ভিতর দিয়া আপনার নিকট হইতে দেশসেবার যে আদর্শ লাভ করিয়াছি—তাহার প্রেরণায় গভীর আনন্দে শ্রীনিকেতনের সেবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি গতবার মান্দ্রাজ হইতে ফিরে আসার পর হইতে যে অবস্থা হইয়াছে তাহা বিদূরিত হয় নাই। এখানকার influential সহকর্মীগণ বারবার কথা প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে আমি যেন তাঁহাদের কর্ম্মের পথে অন্তরায়। এই অবস্থায় অনেক বিবেচনার পর এই পদত্যাগপত্র দিয়াছি। যে অবস্থায়ই থাকি এবং যেখানে কার্য করি—আপনার আদর্শ প্রচারই আমার বাকি জীবনের কার্য হইবে। ৭/৮ দিন পর কলিকাতা গিয়া আপনার সহিত দেখা করিয়া আমার বক্তব্য জানাইব।

অনুগ্রহপূর্ব্বক এ বিশ্বাস রাখিবেন যে কোনো স্বার্থের জন্য যাচ্ছি না। কোথাও চাকুরীর চেষ্টাও করি নাই। গুরুতর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইবে এবং শান্তিনিকেতনের সহিত বাহিরের বিচ্ছেদও আমার প্রাণে গভীর বেদনা সঞ্চার করিবে। এ সব জানিয়াই এই দুঃখবরণ করিতেছি।

এই জীবন সংগ্রামেও আপনার আশীর্বাদ ভিক্ষা করি। আপনার প্রতি আমার একনিষ্ঠ ভক্তি ও শ্রদ্ধা সম্বন্ধে বিশ্বাস রাখিবেন ইহাই একান্ত অনুরোধ। অন্যথায় সেই অবিশ্বাসের আঘাত আমার পক্ষে সহ্য করা কষ্টকর হইবে। ইতি ভক্তিপ্রণত কালীমোহন।"

কালীমোহনবাবুর এই চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—"কল্যাণীয়েষু তুমি কাজে ইস্তফা দিয়েচ এ হতেই পারে না। তোমাকে কোনোমতেই ছুটি দিতে পারব না। তুমি গেলেই চলবে না। কার সঙ্গে তোমার কী অনৈক্য হয়েচে তা নিয়ে তুমি মন খারাপ করে এত বড়ো কাজ মাটি কোরো না। যারা তোমার মূল্য বোঝে না তাদের উপর আমি শ্রদ্ধা করতে পারিনে। যাইহোক দশজনে একসঙ্গে কাজ করতে হলে এরকম

মনান্তর মতান্তর হয়েই থাকে, তা নিয়ে তুমি ক্ষুব্ধ হোয়ো না—জেনো তোমার উপর আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর আছে। তোমার কর্ম্মত্যাগপত্র আমরা কিছুতে স্বীকার করব না। ইতি ২ মে ১৯৩৩ শুভানুধ্যায়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।”

একখানি চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দিলেন কালীমোহনের প্রতি তাঁর কতখানি আস্থা ও নির্ভরতা। শুধু কালীমোহনকে নয়—তাঁর বিরোধীপক্ষকেও রবীন্দ্রনাথ যেন সে-কথা জানিয়ে দিলেন। ফলে, তখনকার মতো কালীমোহনবাবু রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ শিরোধার্য করে শ্রীনিকেতনের কাজে ফিরে এসেছেন।

শ্রীনিকেতন ও বিশ্বভারতীর আদর্শে আত্মোৎসর্গপ্রাণ কালীমোহনের শরীর অকালেই ভেঙে পড়ে। প্রচণ্ড পরিশ্রম করতেন, ডুবে থাকতেন কাজের মধ্যে। পায়ে হেঁটে রৌদ্রে-জলে ঘুরেছেন, শেষ বয়সে মাঝে মাঝে গোরুর গাড়িতে—তখন মোটরগাড়ির আমদানি হলেও তিনি তার সুযোগ পাননি। অনিয়মিত জীবনযাপনের ফলে ১৯৩৯ সালে তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন—কাজের চাপের ফলে বাড়ে রক্তের চাপ। অবসর গ্রহণ করেন ২২ নভেম্বর। তাঁকে পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলা হয়। কিন্তু সরলপ্রাণ দয়ার্দ্র-হৃদয় মানুষটি গ্রামবাসীদের দুঃখকষ্টের কথা শুনলে স্থির থাকতে পারতেন না—অসুস্থ অবস্থাতেই যে-গ্রাম থেকে ডাক আসত পৌঁছে যেতেন সেখানে। গ্রামবাসীরা বুঝেছিলেন কালীমোহনবাবু তাঁদের একান্ত আপনজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং পরম আস্থাভাজন। গুরুদেবের বড়োদাদা ঋষিপ্রতিম দ্বিজেন্দ্রনাথ তাই কালীমোহন প্রসঙ্গে চৌপদী-ছড়ায় লিখেছেন—

> “কালীমোহনের অশেষ গুণ!
> যে তারে জানে—সে-ই জানে
> দীনদুখে হৃদয়ে জ্বলে আগুন
> অবিচার সহে না প্রাণে॥”

গ্রামবাসীদের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার ফলে তাঁর অসুস্থতা বেড়েই যায়। ১৯৪০ সালের ১২ মে তাঁর শান্তিনিকেতন বাড়িতে একদল গ্রামবাসীর সঙ্গে তাঁদের অভিযোগ ও সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা করার শেষে অকস্মাৎ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেন কালীমোহন। রবীন্দ্রনাথ তখন কালিম্‌পঙে—জীবনের প্রদোষবেলায় চরম আঘাত পেলেন তিনি—শান্তিদেবকে ১৯ মে এক চিঠিতে লিখলেন—“তোমার পিতার মৃত্যুসংবাদে গুরুতর আঘাত পেয়েছি। শান্তিনিকেতনে আসবার পূর্বে থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার নিকট সম্বন্ধ ঘটেছিল। কর্মের সহযোগিতায় ও ভাবের ঐক্যে তাঁর সঙ্গে আমার আত্মীয়তা গভীরভাবে বিস্তারলাভ করেছিল। অকৃত্রিম নিষ্ঠার সঙ্গে আশ্রমের কাজে তিনি আপনার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর আন্তরিক জনহিতৈষা শ্রীনিকেতনের নানা শুভকর কার্যে নিজেকে সার্থক করেছে। তাঁর মূর্তি আমাদের আশ্রমে এবং আমার মনের মধ্যে চিরদিনের মত প্রতিষ্ঠিত হয়ে রইল।

লোকহিতব্রতে তাঁর যে জীবন ত্যাগের দ্বারা পুণ্যোজ্জ্বল ছিল মৃত্যু তার সত্যকে খর্ব করতে পারে না এই সান্ত্বনা তোমাদের শান্তিদান করুক। ইতি ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭ শুভৈষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।”

রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় কালীমোহন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র শান্তিদেব তাঁর আত্মকথা 'জীবনের ধ্রুবতারায়' এ সম্বন্ধে লিখেছেন—"বাবা ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হবার কথা চিন্তা করে গুরুদেবের অনুমতি প্রার্থনা করেন। গুরুদেব তাঁকে সম্মতি দেন। তিনি গিরিডিতে ফিরে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নিয়মমতদীক্ষা গ্রহণ করে, সাধারণ সমাজভুক্ত হন। তখনকার দিনের অনেক ব্রাহ্মবাড়িতে ব্রাহ্মমন্ত্রগুলি কাচের ফ্রেমে ছবির মতো বাঁধিয়ে গৃহে টাঙানো হত। বাবা সেই রকমের কতকগুলি মন্ত্র কাচের ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেশের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরমাকে দেন, ঘরে টাঙিয়ে রাখার জন্যে। পরবর্তীকালে বাল্যবয়সে গ্রামে যখন গেছি তখন সেগুলি আমি দেখেছি। ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে ঠাকুরমার সঠিক কোনও ধারণা ছিল না। মন্ত্রগুলি তাঁকে পড়ে শোনানো হয়েছিল, কিন্তু তিনি সেগুলিকে হিন্দু ধর্মের পূজার মন্ত্ররূপেই ভাবতেন। সেই কারণেই যত্নসহকারে সেগুলিকে ঘরে টাঙিয়ে রাখতে তাঁর মনে কোনও দ্বিধা হয় নি।"

স্মর্তব্য, ১৯০৭ সালে শান্তিনিকেতনে কর্মজীবন সূচনাকালে কালীমোহন যখন গুরুতর কাশ রোগে আক্রান্ত হন তখনই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় গিরিডিতে পাঠান। এইখানে তখন বহু ব্রাহ্ম পরিবারের বাস ছিল। তাঁদের সঙ্গে কালীমোহনের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁর ব্রাহ্মধর্মে অনুরক্তির সেটিও অন্যতম কারণ বলে মনে হয়।

কালীমোহন ঘোষকে : রবীন্দ্র-পত্রাবলী

পত্র : ১

ওঁ

কলিকাতা

কল্যাণীয়েষু

অসুখবিসুখে ব্যস্ত থাকাতে তোমাকে ভাল করিয়া পত্র লিখিতে পারি নাই। এখনো শরীর যথেষ্ট ক্লান্ত আছে এবং কলিকাতার গোলেমালে মনও উদ্ভ্রান্ত হইয়া থাকে। কোনো কাজ করিতে পারি না। মীরা একটু নড়াচড়া করিবার অনুমতি পাইলেই তাহাদিগকে লইয়া পাহাড়ে যাইব স্থির করিয়াছি।

ইতিমধ্যে নবকান্ত জ্বরে পড়িয়াছিল, কাল তাহার জ্বর বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। তুমি যেরূপভাবে কাজের আয়োজন করিতেছ তাহা পড়িয়া উৎসাহিত হইয়াছি। যদি উপযুক্ত সহকারী লাভ কর তাহা হইলেই নিশ্চিন্ত হই।

অক্ষয় শিলাইদহে গিয়াছেন। একজন স্বদেশানুরাগী মুসলমানকে আমি কালোয়া প্রভৃতি গ্রামের কর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত করিয়াছি—ইহাতে মুসলমানের সহিত হিন্দুর মিলন সহজ হইবে।

মজঃফরপুরে বম্ব ফেলিয়া দুইটি ইংরেজ স্ত্রীলোককে হত্যা করা হইয়াছে শুনিয়া আমার চিত্ত অত্যন্ত পীড়িত হইয়া আছে। এইরূপ অধর্ম্ম ও কাপুরুষতার সাহায্যে যাহারা দেশকে বড় করিতে চায় তাহাদের কিসে চৈতন্য হইবে জানি না। কিন্তু তাহারা সমস্ত দেশকে বিষম দুঃখে ফেলিবে। ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া দুঃখ সহা যায় কিন্তু এমন পাপের বোঝা দেশ কি করিয়া বহন করিবে? ঈশ্বর দেশের কাজে সর্ব্বদা তোমাদের অন্তঃকরণে ধর্ম্মবুদ্ধি দিন, শুভবুদ্ধি দিন—তোমরা অসহিষ্ণু হইয়া কোনোদিন যেন অন্যায় না কর—উপস্থিত ফললাভের প্রলোভনে সত্য হইতে বিচ্যুত না হও। জগতে এমন কিছুই থাকিতে পারে না যাহাকে লাভ করিবার চেষ্টায় ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিতে হয়।

শচীন্দ্রদের সাহায্য লাভ করিয়া তাহাদের সহিত একত্র মিলিয়া কাজ করা আমি ভালই মনে করি। মঙ্গল কর্ম্মে যতই মিলিতে পার ততই ভাল। আমার দল এবং অন্যের দল বলিয়া কোনো কণ্টক যেন তোমাদের মনে না থাকে। দেশের কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই নাই—এই কল্যাণ প্রেমের দ্বারা মিলনের দ্বারা ত্যাগের দ্বারা ধর্ম্মের দ্বারাই হইবে। দেশহিতের নাম করিয়া লোকের মনে যে পাপের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে তাহা দেখিয়া চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত পাপ প্রবৃত্তির বহু উর্দ্ধে তোমার আদর্শকে

উজ্জ্বল করিয়া মহীয়ান করিয়া রাখ কিছুতে বিচলিত হইয়ো না। চারিদিকের নিদারুণ উন্মত্ততা তোমাকে স্পর্শ না করুক—ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন। ইতি ১৯শে বৈশাখ ১৩১৫

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ২

ওঁ

শিলাইদহ
নদিয়া

কল্যাণীয়েষু

সম্প্রতি শিলাইদহে আসিয়াছি। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় তুমি উপকার বোধ করিতেছ এবং তোমার ব্যাধি সাংঘাতিক নহে শুনিয়া অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হইলাম। আমার বোধহয় তুমি যদি কিছুদিনের জন্য বোলপুরে বায়ু পরিবর্তন করিয়া আসিতে পার তবে তুমি শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিতে পারিবে। সেখানে ক্ষিতিমোহন আছেন। অন্য হোমিওপ্যাথ ডাক্তারও রহিয়াছেন। আমি বোধ হয়, ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি সেখানে যাইব। রাধাকান্তবাবুর পুত্রবধূ আমি থাকিতেই বোলপুরে যাইবেন কথা ছিল কিন্তু আমি ত চলিয়া আসিয়াছি। এখন বেলা ও মীরা সেখানে আছে—তিনি সেখানে গিয়া পড়িলে বোধ হয় আমার অনুপস্থিতিতে বিশেষ অসুবিধা হইবে না।

এখানকার কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। আমি ইহাকে কতকটা বাঁধিয়া দিয়া যাইতে পারিব বলিয়া আশা করিতেছি। তাড়াতাড়ি করিয়া কিছুই হয় না।

নবকুমারকে কালিগ্রামের কাজে নিযুক্ত করিয়া দিব স্থির করিয়াছি। অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। ইতি ৭ই শ্রাবণ। ১৩১৫

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ৩

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু

আমি বোলপুরে আসিয়া এখানকার কাজে ব্যস্ত হইয়া আছি। শরীর যে বিশেষ ভাল তাহাও বলিতে পারি না। ভাদ্র মাস অতীত হইলে এখানে পূজার ছুটি আরম্ভ হইব [হইবে] তখন কোথায় যাইব এখনো স্থির করিতে পারি নাই।

এ বৎসরটা আমাদের পক্ষে বিশেষ আশঙ্কাজনক বলিয়া বোধ হইতেছে। বিরাহিমপুরের ফসল নদীবৃদ্ধিতে নষ্ট হইয়াছে কালিগ্রামের ধান বৃষ্টি অভাবে শুকাইতেছে। আমাদের দুই জমিদারীতেই যদি দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দেখা দেয় তবে সঙ্কটে পড়িতে হইবে।

ক্ষিতিমোহন বাবু বোলপুর বিদ্যালয়ের কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইঁহাকে পাইয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি—ইঁহার দ্বারা বিদ্যালয়ের বিশেষ উপকার হইবে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। তুমি যে আমাকে ইঁহার সন্ধান বলিয়া দিয়াছ সে জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ আছি।

নবকুমার এখনো কোনো নিয়মিত কাজে নিযুক্ত হয় নাই। পূজার পরে তাহাকে কাজ দিব। আপাতত সে এমন সকল কাজ করিতেছে যাহাতে কাজ শিক্ষা হয়।

ঈশ্বর তোমাকে নিরাময় করিয়া মঙ্গলের পথে অগ্রসর করুন। ইতি ৭ই ভাদ্র ১৩১৫।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ৪

ওঁ

শিলাইদহ

নদিয়া

কল্যাণীয়েষু

তোমার পত্র পাইয়া তোমার শারীরিক অস্বাস্থ্যের জন্য উদ্বিগ্ন হইলাম। যদি তোমার কোথাও বায়ু পরিবর্তনে যাওয়া স্থির হয় তবে আমি তোমাকে সাহায্য করিব—যথাসময়ে আমাকে সংবাদ দিয়ো।

চৈতন্য যখন প্রেমের ধর্ম প্রচার করিতেছিলেন তখন পাছে তাঁহার ধর্ম সমাজে লেশমাত্র কলুষ স্পর্শ করে এইজন্যই তিনি হরিদাসকে অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দিয়াছিলেন। যাঁহারা দেশের মঙ্গলসাধনব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকেও অত্যন্ত কঠোরভাবে সতর্ক থাকিতে হইবে। কোনো আত্মবিস্মৃত উন্মত্ততা, কোনো পাপ যদি ব্রতধারীদের মধ্যে ছদ্মবেশে প্রবেশ করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে তিরস্কৃত করা কর্তব্য হইবে।

যাহারা দলের মধ্যে থাকিয়া দলের ধর্মভিত্তিকে দুর্বল করিয়া দিতে চেষ্টা করে তাহারাই আমাদের প্রবলতম শত্রু। ফলাফল ঈশ্বরের হাতে—আমরা হারি বা জিতি, আমরা সদ্য সফলতা লাভ করি বা না করি আমরা যেন শত্রু মিত্র সকলের সমক্ষেই অকুণ্ঠিতভাবে মাথা তুলিয়া বলিতে পারি যে, আমাদের আদর্শ অতি উচ্চ—সেই মহোচ্চ আদর্শকে আমরা কোনো প্রলোভনেই কলঙ্কিত হইতে দিই নাই—আমরা দস্যু নই, তস্কর নই, খুনী নই, আমরা বীর, আমরা ত্যাগী, আমরা তপস্বী, আমরা স্বজাতির চরিত্র নষ্ট করিয়া দিয়া তাহাকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিতে পারিব এরূপ মূঢ়তা এবং দুর্বুদ্ধি মনের মধ্যে ভ্রমেও পোষণ করি না। যখন মঙ্গলের উত্তেজনা দেশের সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে তখন দেশহিতের নামে ভাল ও মন্দ নানা প্রকার লোক আকৃষ্ট হইয়া

আসে সুতরাং তখন দেশহিতের নামেই ধর্ম ও অধর্ম উভয়েই জাগ্রত হইয়া উঠে। এইরূপ সঙ্কটের সময় যদি আমরা আমাদের ধর্মব্রতের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য চেষ্টা না করি, যদি দলবৃদ্ধি আমাদের লক্ষ্য থাকে, যদি সেই মোহে অথবা আশু কার্যোদ্ধারের প্রলোভনে আমরা পাপকেও যজ্ঞস্থলে আহ্বান করিয়া লই তবে আমাদের সঙ্কল্প দেখিতে দেখিতে বিকৃতি ও দুর্গতির মধ্যে অবতরণ করিবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। "স্বদেশী"র চর্চা ত ভালই এবং "বয়কটের"ও প্রয়োজন থাকিতে পারে কিন্তু ধর্মের চেয়ে সত্যের চেয়ে ন্যায়ের চেয়ে তাহার প্রয়োজন বেশি এমন নাস্তিকের মত কথা কোনো অবস্থাতেই বলা চলে না। আমাকে লোকে গালি দিতেছে বা পরিহাস করিতেছে সে নিতান্তই ক্ষুদ্র কথা, তাহাতে কিছুই আসে যায় না—সময় বিশেষে এবং লোক বিশেষের হস্তে, গালিই যথার্থ পুরস্কার—কিন্তু পরম দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের দেশহিতযজ্ঞের মধ্যে আমরা শনিকে কলিকে বন্ধুর মত সাদরে আহ্বান করিতে প্রস্তুত হইয়াছি—জাতীয় জীবনের এত বড় মহৎ সাধনার সুযোগকে যেরূপ অবিচলিত ধর্মবুদ্ধির দ্বারা সর্বপ্রকার অশুভ হইতে রক্ষা করা উচিত ছিল তাহা বিস্মৃত হইতেছি। দ্রুতবেগে যাওয়াই সার্থকতা নহে, লক্ষ্যপথে মঙ্গলের পথে যাওয়াই সার্থকতা। চরিত্রই সেই লক্ষ্যপথে চালাইয়া লইয়া যাইবার হাল—জাতির সেই চরিত্রের হালটাকে যাহারা ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে তাহারাই কি আজ আমাদের এই সঙ্কটের পথের কাণ্ডারী? তাহারা আমাদিগকে বিশ্বাসবন্ধনের শিথিলতায়, ভ্রাতৃবিদ্রোহে এবং সর্বপ্রকার ভ্রষ্টতার মধ্যে লইয়া যাইতেছে ইহা নিশ্চয় জানিয়াও তাহাদিগকে সাধুবাদ দিয়া অন্যায় লোকরঞ্জনের পাপে কে লিপ্ত হইবে?

আমি কয়েকদিন হইল শিলাইদহে আসিয়াছি। এখন বোলপুর বিদ্যালয়ের ছুটি, এখানকার কাজকর্মও ছুটিতে বন্ধ আছে। কার্তিক মাসের আরম্ভেই আবার এখানে কর্মচক্র চলিতে আরম্ভ হইবে। এবার আমার সঙ্গে বিদ্যালয়ের দুইজন ছাত্র আছে—শিলাইদহের পরপারে নদীর চরে বোট লাগাইয়া আছি। শ্রীমতী লাবণ্যলেখাও এখানে আসিয়া আমার মেয়েদের সঙ্গে থাকিবেন এইরূপ কথা হইয়াছে। আপাতত মীরা আমার কাছে আছে, কাল বেলা আসিবে—লাবণ্যর সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য মেয়েরা উৎসুক হইয়া আছে। এখানে নৌকায় তোমার শরীর নিশ্চয় ভাল থাকিবে জানিলে তোমাকেও আসিতে লিখিতাম—কিন্তু সাহস হয় না—এখানে উপযুক্ত চিকিৎসক নাই—পাছে কোনো প্রকারে ঠাণ্ডা লাগিয়া তোমার অনিষ্ট ঘটে এই ভাবনা।

ক্ষিতিমোহনবাবুকে বোলপুরে পাইয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। তাঁহার দ্বারা আমাদের বিশেষ উপকার হইবে বলিয়া আশা করিতেছি।

মাঝে মাঝে তোমার সংবাদ দিয়ো। ইতি ২৪শে আশ্বিন ১৩১৫

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ৫

ওঁ

জোড়াসাঁকো
কলিকাতা

কল্যাণীয়েষু

তুমি গিরিডিতে গিয়া ভাল আছ শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। গিরিডিতে আমি যখন ছিলাম আমারও স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছিল। ওখানে তুমি যথাসম্ভব সমস্ত দিন বনের মধ্যে খোলা হাওয়ায় যাপন করিবার চেষ্টা করিবে।

তোমার পত্রে অরবিন্দ প্রকাশবাবু কথা পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। আমি যাহা বলিবার চেষ্টা করিয়াছি বর্তমান উত্তেজনার অবস্থায় দেশের লোক তাহাকে ভাল করিয়া না বুঝিয়া আমার প্রতি অসহিষ্ণু হইয়া উঠিবে ইহা স্বাভাবিক—সুতরাং আমার প্রতি সাধারণের বিমুখতায় আমি ক্ষুব্ধ হই নাই। আমার দুঃখ এই যে দেশহিতের আবেগ দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া তাহার মহত্ত্বের দ্বারা আমাদের প্রকৃতির মাহাত্ম্যকে উদ্বোধিত করিতেছি না—আমাদের দুর্বলতাকেই সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়া স্বাদেশিকতাকে তস্করবৃত্তিতে পরিণত করিতেছে। কর্তব্যের অনুরোধে ফলাফলের ক্ষুদ্র হিসাব ছাড়িয়া দিয়া অক্ষম যখন শক্তিমানকে আঘাত করিতে দাঁড়ায় এবং অকৃতকার্য হইয়া মারা পড়ে তাহাতেও মনুষ্যত্বের গৌরব উজ্জ্বল হইয়া সেই পরাভবকে মহীয়ান করিয়া তোলে, সেই পরাভব মানব ইতিহাসের চিরন্তন সম্পদস্বরূপ সঞ্চিত হইতে থাকে। কিন্তু মহৎ আবেগে মানুষকে মহৎ করিয়া না তুলিয়া তাহাকে যদি চোর ডাকাত মিথ্যুক ও খুনী করিয়া দাঁড় করায় তবে মনুষ্যসমাজে আমরা মাথা তুলিব কি লইয়া?

বঙ্গদর্শনে দেশহিত নামে একটি ছোট লেখা সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছি। এই বঙ্গদর্শন তোমাকে পাঠাইয়া দিলাম।

আমি যত শীঘ্র পারি বোলপুরে যাইব। সেখানে বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু শিক্ষকের অভাবে অত্যন্ত অসুবিধা ঘটিতেছে। সুযোগ্য, ধর্মনিষ্ঠ শিক্ষকের সন্ধান যদি তোমার জানা থাকে তবে শীঘ্র আমাকে সংবাদ দিয়ো।

ক্ষিতিমোহন বাবু সদলে ফিরিয়া আসিয়াছেন—তাঁহাকেও শিক্ষকের কথা জিজ্ঞাসা করিব।

তোমার মাসি আমাদের সঙ্গে কলিকাতায় আছেন। তিনি ভালই আছেন। বেলা তাঁহাকে ইংরেজি পড়া এবং শেলাই শিখাইতেছে। তাঁহার যেরূপ মেধা তাহাতে তাঁহার শিখিতে বিলম্ব হইবে না। বোলপুরের কাজে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া দিলে তাঁহার নানাপ্রকারে উন্নতি হইবার আশা করা যায়।

পিসিমা এখন অনেকটা ভাল আছেন। আমার শরীরের দুর্বলতা এখনো দূর হয় নাই।

তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে। ইতি ২৩শে কার্তিক ১৩১৫

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ৬

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তুমি যে অধ্যাপকটির কথা লিখিয়াছ তিনি কি গ্রাজুয়েট? বোলপুরের কাজে তাঁহাকে কত বেতনে পাওয়া যাইবে জানা আবশ্যক। ব্রজেন্দ্রবাবুর জামাতার জন্য একজন বেশ বলিষ্ঠ দৃঢ়চরিত্র লোকের প্রয়োজন—তুমি শিলাইদহে যাঁহার বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলে তাঁহাকে কি পাওয়া যাইবে? আমি বোলপুরের জন্য কয়েকটি ভাল লোক সংগ্রহ করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইতেছি। উপযুক্ত লোক পাওয়া অত্যন্ত কঠিন—বিশেষত আমরা খুব বেশি বেতন দিতে অক্ষম। বোলপুর বিদ্যালয়ে বি. এ পর্যন্ত পড়া শিক্ষকেরা ২৫ ও ৩০ টাকা বেতন লইতেছেন—যাঁহারা বি. এ পাস তাঁহাদের একজন ৩০ ও অজিত ৬০ টাকা লন।

এ কথা নিশ্চয় সত্য জানিবে, যে যে পর্যন্ত আমরা দেশের জনসাধারণকে যথার্থই আত্মীয় বলিয়া অনুভব না করিব, তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা ও উপেক্ষা দূর না হইবে ততদিন আমাদের মুখে দেশহিতের কথা অত্যন্ত মিথ্যা হইয়া থাকিবে। দেশের ভদ্রলোকের স্বার্থোন্নতির দলকে দেশহিতৈষীর দল বলা যায় না। বস্তুত আমাদের হৃদয় দেশ হইতে অনেক দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের অন্তরের মধ্যে পার্টিশনের অন্ত নাই—বাহিরের পার্টিশনে আমাদের কতই বা ক্ষতি করিবে? যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সমাজনীতি আমাদের ধর্মনীতি মিলনের অনুকূল না হইবে—যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের শাস্ত্র আমাদের ধর্মশিক্ষাই আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদকেই দেশের রক্ত দিয়া সজীব করিয়া রাখিতেছে ততক্ষণ এই সকল ভদ্রলোকের আকস্মিক উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যে আমাদের দেশের আপামর সাধারণকে এক করিয়া তুলিয়া ভারতবর্ষকে মহাদেশে পরিণত করিয়া তুলিতে পারিবে না। ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বারম্বার ভাঙিয়া পড়িব এবং এক প্রভুর পরিবর্তে অন্য প্রভুকে আশ্রয় ও এক শৃঙ্খলের পরিবর্তে অন্য শৃঙ্খল ধারণ করিতে থাকিবে।

তুমি গিরিডিতে কতকটা ভাল আছ শুনিয়া খুসি হইলাম। অগ্রহায়ণের আরম্ভেই তোমার টাকা পাঠাইব। আজ বোলপুরে চলিলাম। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ২৮শে কার্তিক ১৩১৫

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
জোড়াসাঁকো কলিকাতা

পত্র : ৭

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু

তুমি গিরিডিতে বেশ আনন্দে আছ এবং ভাল আছ শুনিয়া খুসি হইলাম। আমি এখন বিদ্যালয়ের কাজের আবর্তের মধ্যে পড়িয়া গেছি—ছুটির পরে সমস্ত নতুন বন্দোবস্ত করিতে হইতেছে। ছেলেও বাড়িয়াছে অধ্যাপকেরও অভাব ঘটিয়াছে এই জন্য নানা টানাটানির মধ্যে পড়িয়াছি। ঢাকার "জ্ঞান ঠাকুর"কে পত্র লিখিয়াছ শুনিয়া খুসি হইলাম। দেখি তাঁহার কিরূপ উত্তর আসে। লাবণ্যলেখার পড়াশুনা ভালই চলিতেছে। তাহার হাতে দুটি ক্লাস দিয়াছি। এখন আমি নিজে কিছুদিন তাহার সঙ্গে বসিয়া ক্লাস পড়াইতেছি ইহাতে অধ্যাপনার নিয়ম সে শিখিয়া লইতে পারিবে। প্রাতঃকালে তাহাকে ও মেয়েদের লইয়া উপাসনা করি ও উপদেশ দিই। আজ ক্ষিতিমোহন বাবুও তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। ইহাতে আমার নিজেরও যথেষ্ট উপকার হইবে আশা করি।

হরনাথের প্রতি আমি অন্যায় সন্দেহ করিতেছি বলিয়া আক্ষেপ করিয়া সে এক পত্র লিখিয়াছে। তাহাকে যে আমি এখনও বিশ্বাস করি তাহা নহে—তৎসত্ত্বেও আমি মনে বেদনা অনুভব করিতেছি। এক একবার মনে হইতেছে যে হয়ত তাহার মনের ভিতরে সকল দুর্বলতার মধ্যেও একটা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আছে। সে নিজের অহঙ্কারকে দমন করিতে না পারিয়া মিথ্যার মধ্যে জড়াইয়া পড়িতেছে অথচ সত্যের জন্য হয়ত তাহার তৃষ্ণা আছে।

তোমার চিকিৎসা কিরূপ চলিতেছে? ক্রিয়োজোট ঔষধটা ঘন ঘন না খাওয়াই কর্তব্য। এ ঔষধের কুফল আছে। যদি খোলা হাওয়া সেবন করিয়া তোমার কাশিটা ভাল থাকে তবে ঔষধটা পারতপক্ষে ব্যবহার করিয়ো না। সমস্তদিন যতক্ষণ পার শালবনের মধ্যে খোলা আকাশে বসিয়া কাটাইয়ো এবং পেটের গোলমাল না হইলে দুধ মাখন প্রভৃতি পুষ্টিকারক পদার্থ খাইয়ো।

নবকুমার ব্রজেন্দ্রবাবুর জামাতাটির ভার লইয়াছে। প্যারী জ্বরে ভুগিতেছে এবং এখনো আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। ইতি ২রা অগ্রহায়ণ ১৩১৫

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ৮

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু

আজ তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম।

অনেকদিন হইতে মনে মনে যে ধর্মে তুমি বিশ্বাস পোষণ করিতেছ সেই ধর্মে দীক্ষা

গ্রহণ যে তোমার কর্তব্য তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। অন্তঃকরণে যদি সত্যের আবির্ভাব হয় তবে সর্বপ্রকারেই তাহাকে স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। সমস্ত জীবনকে সত্যের অনুগত না করার মত এমন গ্লানি আর কিছুই নাই। তুমি নিজেবে তাহা হইতে মুক্ত করিবার জন্য যে প্রস্তুত হইয়াছ ইহাতে আমি বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। যিনি জগতের ধনমান খ্যাতি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে গোপন করিবে কেন? বাতি যেমন তাহার আলোক শিখাকে সকলের উর্দ্ধে তুলিয়া ধরে এবং এইরূপে চারিদিককে আলোকিত করিতে থাকে তেমনি করিয়াই আমরা আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ আবির্ভাবকে কোনো কারণেই প্রচ্ছন্ন না রাখিয়া তাঁহাকেই সকলের উর্দ্ধে প্রকাশ করিব এবং তাঁহার আলোক চারিদিকে বিকীর্ণ করিতে থাকিব। আলো যখন ভাল করিয়া না ধরে তখনি কেবল ধোঁয়া বাহির হইয়া কালিমায় সমস্ত ঢাকিয়া ফেলে—আলো যখন ধরিয়া উঠে তখন সমস্ত ধোঁয়াকে নিরস্ত করিয়া দিয়া সমস্ত সংশয় সঙ্কোচকে কাটিয়া ফেলিয়া অকুণ্ঠিত তেজে দীপ্যমান হইয়া প্রকাশিত হয়। তোমার জীবনের যে শ্রেষ্ঠ সত্য তাহাও তোমার জীবন বর্তিকার মুখে তেমনি উর্দ্ধশিখা হইয়া প্রকাশ পাক্। তাহার সমস্ত ভয় লজ্জা সঙ্কোচ একমুহূর্তে দূর হইয়া যাঁহার সঙ্গে তোমার অনন্ত জীবনের সম্বন্ধ তাঁহাকেই তোমার সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করাইয়া দিক্—তোমার বাক্য মন, তোমার অন্তর বাহির, তোমার কর্ম ও আকাঙ্ক্ষা সত্য হউক্—সত্যের দ্বারা সম্পূর্ণ হউক এই আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি।

আমার যদি দান করিবার মত কোনো সম্বল থাকে তবে তুমি আমার কাছে আসিলে তাহা লাভ করিবে। ইতি ৪ঠা পৌষ ১৩১৫

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চিঠিতে তোমার পীড়াবৃদ্ধির কথা পড়িয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। হঠাৎ আজ মনে পড়িল এলাহাবাদে কাশ রোগের একজন সুচিকিৎসক আছেন তাঁহার সন্ধান লইয়া তোমাকে জানাইব। তিনি অনেক অসাধ্যরোগ সারাইয়াছেন শুনিয়াছি।

রোগতাপ দুর্বলতার নিকট চিত্তকে পরাস্ত হইতে দিয়ো না। এ সমস্তই বাহিরের জিনিষ—ইহাকে সম্পূর্ণ বাহিরে রাখিতে চেষ্টা করিবে—অন্তরের গভীর নিকেতনে কেবল সমস্ত নিত্যপদার্থকে স্থান দিতে হইবে ইহাই জানিয়ো জীবনযাত্রার সাধনা। সেই অন্তরতম স্থানে নিজেকে শান্ত ও দৃঢ়ভাবে স্থিরপ্রতিষ্ঠ রাখিয়া নিজের বাহিরের রোগশোকতাপ জীবনের চঞ্চলতাকে দ্রষ্টারূপে নির্লিপ্তরূপে বাহিরে দেখিতে চেষ্টা করিবে। এই জীবন তোমার চিরজীবন নহে। তোমার অনন্ত জীবনের মধ্যে ইহা বুদ্বুদমাত্র—তোমার অন্তরাত্মাকে এই ক্ষুদ্র জীবনের লাভক্ষতি দুঃখসুখ নিন্দা প্রশংসার

সঙ্গে বিজড়িত করিয়া দেখিয়ো না—সে যে অমর, সে যে অক্ষয়, সে যে ব্রহ্মের মধ্যে অনন্তকাল আসীন—সে তোমার শরীরের অতীত, সংসারের অতীত—তাহাকে সেই অজর অশোক অভয় অনাময় ব্রহ্মের মধ্যেই উপলব্ধি করিবার চেষ্টা কর—তাহাকে তোমার শরীরের সঙ্গে, সংসারের সঙ্গে, বাহিরের জনতার সঙ্গে জড়াইয়া ফেলিয়ো না। এ সমস্ত হইতে মুক্তি লাভ কর, আনন্দের সহিত মুক্তি লাভ কর। যেখানে তোমার আত্মার চিরবিহারের স্থান সেই নির্মল পরিপূর্ণ শান্তিময় জ্যোতির্ময় চিদাকাশে—তুচ্ছভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতি যিনি জ্যোতির জ্যোতি তাঁহার আলোকের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করিয়া দাও। বাহিরের সমস্ত আঘাত প্রতিঘাত তুচ্ছ হইয়া যাইবে। কেবলি বাহিরের দিকে যতই দৃষ্টিপাত করিবে, বাহিরকেই চঞ্চল সংসারকেই যতই বড় করিয়া দেখিবে নিজের অন্তরাত্মাকে ততই ছোট করিয়া জানিবে, বাহির ততই তোমাকে আবদ্ধ করিয়া বন্দী করিয়া রাখিবে। তোমারই নিকট হইতে প্রশ্রয় লাভ করিয়া সে তোমাকেই পরাস্ত করিয়া দিবে। এই সমস্ত মোহজাল, এই সমস্ত অবসাদের আবেষ্টন ছেদন করিয়া চিরানন্দ মন্দিরে প্রবেশ কর—চিন্তা করিয়ো না, ভয় করিয়ো না, আপনাকে মিথ্যা পীড়ায় পীড়া দিয়ো না—আত্মাকে উজ্জ্বল করিয়া বাধামুক্ত করিয়া জান তাহা হইলে পরমাত্মাকেও প্রত্যক্ষ করিয়া নির্ভয় হইবে। ইতি ৭ই ফাল্গুন ১৩১৫

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ১০

ওঁ

জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়েষু

এবার কলিকাতায় আসিয়া আমাকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। কয় দিন কিছু অবকাশ পাই নাই—প্রত্যহই একটা-না একটা সভায় বক্তৃতা দিতে হইয়াছে সেইজন্য তোমার চিঠির উত্তর দিতে পারি নাই। কলিকাতার কাজ শেষ হইল এখন আমাকে বোলপুরে যাইতে হইবে। কাল সন্ধ্যার ট্রেনে যাইব। এবার দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকিতে হইয়াছে। মাঝে মাঝে আমার এইরূপ দূরে থাকাই কর্তব্য। তাহা হইলে বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ দায়িত্বভার সম্পূর্ণ রূপে নিজের উপরে গ্রহণ করিতে ক্রমশঃ প্রস্তুত হইতে পারিবেন।

তুমি অসুস্থ শরীর লইয়া নানাপ্রকার কাজে নিজেকে জড়িত করিয়াছ। স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করিয়ো না—উপনিষদ বলিয়াছেন—জিজীবিষেৎশতং-সমাঃ—শত বৎসর বাঁচিতে ইচ্ছা করিবে। তাহার অর্থ এই, যে-মানব-দেহ লাভ করিয়াছি শত বৎসর আয়ু পাইলে তবে তাহাকে পূর্ণভাবে সার্থক করিবার অবকাশ পাওয়া যায়। যে সুযোগ পাইয়াছি তাহাকে সম্পূর্ণ করিয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা করিতেই হইবে। দীর্ঘ আয়ু নহিলে

মানব জীবনকে সফল করিতে পারিবে না। পাকিবার পূর্বে ফল যদি ছিঁড়িয়া পড়ে তবে তাহা নষ্টই হয়। অতএব সমস্ত মনের ইচ্ছা ও চেষ্টার দ্বারা বাঁচিয়া থাকিতে চাহিবে।

রামমোহন রায়ের জীবন সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করি নাই—মুখে বলিয়াছিলাম অতএব কি বলিয়াছিলাম তাহা কোনো কাগজে পড়িতে পাইবে না। যদি কোথাও রিপোর্ট বাহির হয় তাহাতে আমার উক্তি কখনই ঠিকমত প্রকাশিত হইবে না—নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ও বিকৃতভাবেই বাহির হইবার সম্ভাবনা।

ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘায়ু করিয়া তোমাকে মানবজীবনের চরম পরিণতি দান করুন এই আমি আশীর্বাদ করি। ইতি ১৫ আশ্বিন ১৩১৬

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ১১

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

ঈশ্বর তোমাকে উচ্চনীচ সকলের বন্ধু করুন ও তিনি তোমার অন্তরতম বন্ধু হইয়া থাকুন এই আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি। ইতি ২৭ আশ্বিন ১৩১৬

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ...

[চিঠির অপর পৃষ্ঠায় 'রাখীবন্ধন' কবিতা]

ওঁ

শিলাইদহ

রাখীবন্ধন

প্রভু,

আজি তোমার দক্ষিণ হাত
রেখোনা ঢাকি!
এসেছি তোমারে, হে নাথ,
পরাতে রাখী।
যদি বাঁধি তোমার হাতে
পড়ব বাঁধা সবার সাথে
যেখানে যে আছে, কেহই
রবে না বাকি।
আজি যেন ভেদ নাহি রয়
আপনা পরে।

তোমায় যেন এক দেখিহে
বাহিরে ঘরে।
তোমার সাথে যে বিচ্ছেদে
ঘুরে বেড়াই কেঁদে কেঁদে
ক্ষণেক তরে ঘুচাতে তাই
তোমারে ডাকি।

শিলাইদহ
২৭ আশ্বিন ১৩১৬

পত্র : ১২

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

সমস্ত জীবন প্রায় লেখা নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি—এর থেকে কারো ভালো করব, উপকার করব সে কথা প্রায়ই ভাবি নি—এই রাশি রাশি লেখার ভিতর থেকে একটা কোনো বাণী ধীরে ধীরে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠবে সেও আমার চিন্তার মধ্যে ছিল না। সেই জন্যে তোমাদের কারো কারো কাছ থেকে মাঝে মাঝে যখন শুনতে পাই যে আমার এই লেখাগুলোর ভিতর থেকে তোমাদের মন একটা কোনো অবলম্বন লাভ করচে তখন সেটা আমার পক্ষে যেমন বিস্ময়কর তেমনি আনন্দের বিষয় হয়ে ওঠে। এতদিন যে কাজে জীবন যাপন করেছি সেটা যে কেবলমাত্র শিল্প নৈপুণ্য নয়, তার মধ্যে থেকে আমার অজ্ঞাতে আমার অন্তর্যামী তাঁর নিজের কোনো একটি নিগূঢ় প্রকাশকে পরিব্যক্ত করে তুলেছেন এটা তোমাদের কাছ থেকে জানতে পেলে নিজের জীবনকে সার্থক বলে মনে হয়।

তুমি ৭ই পৌষে এখানে আসতে পারলে খুসি হব। সেদিন লোকের ভিড় কিছু বেশি হবে, হয়ত তোমার পক্ষে কিছু অসুবিধা ও অনিয়ম ঘটে যেতে পারে এই আশঙ্কা হয় কিন্তু তবু এই উৎসবে তোমরা সকলে এসে যোগ দিলে তবেই আনন্দ সম্পূর্ণ হবে। যদি তোমার পাথেয়ের অভাব ঘটে আমি তা পূরণ করে দেব সে জন্য তুমি চিন্তিত হোয়ো না। এখানে এবার যতীনের সঙ্গে তোমার দেখা হতে পারবে। যতীন তোমাকে গভীর প্রীতির সঙ্গে স্মরণ করেন।

তুমি আমার অন্তরের আশীর্বাদ গ্রহণ কোরো। ইতি ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩১৬

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ১৩

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিখানি পড়ে বালিকাটির জন্যে মনের মধ্যে অত্যন্ত বেদনাবোধ করেছি। কেবল আমার এই আশা আছে ঈশ্বর তাকে সান্ত্বনা দেবেন—শুধু সান্ত্বনা দেবেন তা নয় এই বেদনার ভিতর দিয়ে তার জীবন গভীরতর পূর্ণতর হয়ে উঠবে। অনেক সময় গাছের ডাল কাটলে গাছ প্রবলতর তেজে বেড়ে ওঠে, প্রেমও সেইরকম আঘাত লাভ করলে দ্বিগুণ শক্তিমান হয়ে ওঠে। এখন কিছুদিনের মত নিজেকে অত্যন্ত রিক্ত এবং জীবনকে ব্যর্থ মনে হবে কিন্তু এই রিক্ততা এই ব্যর্থতা নিশ্চয়ই একদিন বড় একটি সার্থকতার কারণ হয়ে উঠবে। কোনো ভয় কোরো না—কিছুকালের এই বেদনায় কোনো অনিষ্ট করবে না। দুঃখের ভিতর দিয়ে যিনি মঙ্গলকে অপূর্ব আকারে উদ্ভিন্ন করে তোলেন তাঁর উপরে নির্ভর করে থাক। মনকে অত্যন্ত বেশি বেদনাশীল কোরো না—ঈশ্বর যাদের দুঃখ দেন তাদের কৃপাপাত্র মনে কোরো না—দৃঢ় বিশ্বাস এবং কঠিন ধৈর্য্যের সঙ্গে দুঃখকে স্বীকার করে লও,—দুঃখ ত পেতেই হবে তা নিয়ে মনকে অতিশয় বিগলিত কোরো না—তা নিয়ে হাহুতাশ করে লোককে আরো দুর্ব্বল করে তুলো না। দুঃখে সমবেদনা অনুভব করব না এ কথা আমি বলিনে—কিন্তু সেই সমবেদনায় অভিভূত হয়ে মঙ্গলের প্রতি নির্ভর শিথিল যেন না হয়—এইখানে নিজে খুব শক্ত হও এবং অন্যকেও শক্ত কর। যে লোক দুঃখ পায় কেবল কোমল হয়ে তার সঙ্গে মিলে গেলে হবে না, কঠিন হয়ে সেই ধুলিলুণ্ঠিতকে উপরের দিকে তুলতে হবে। দুঃখকে চরম বলে গণ্য করলে হবে না—তাকে অত্যন্ত বেশি স্বীকার করলেই সে জোর পায়। তাকে লক্ষ্য কোরো না—তাকে মেনো না—দেখেও তাকে দেখো না। ফুঁ দিয়ে আগুন নিবতে গেলে অনেক সময় তাকে বাড়িয়ে তোলা হয়—চাপা দিয়ে আগুন নিবতে হয়। যখন দেখবে কোনো জীবনে দুঃখের আগুন জ্বলছে তখন তাকে কেবল চোখের জলে সান্ত্বনা দিয়ো না তাকে শক্তি দাও কঠিনমুষ্টিতে জোর করে তার হাত ধরে তাকে দাহর ভিতর থেকে টেনে বের করে আনো।

এখানে তুমি এলে তোমার সঙ্গে অন্যান্য আলোচনা হবে। ইতি ৮ই ফাল্গুন ১৩১৬

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ১৪

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠি আজ পেলুম। এখানে এসে কাজে বড় ব্যস্ত আছি—অথচ তার মধ্যে মনে খুব একটা শান্তি অনুভব করচি—কাজের সঙ্গে ধ্যানের সম্মিলন না হলে তার গভীরতা থাকে না।

আজ জগদানন্দের চিঠিতে বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা জেনে মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে তাই এখানকার কাজ অসম্পূর্ণ রেখেও আমাকে সেখানে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে হচ্চে। যত শীঘ্র পারি যাব। জানিপুরে গিয়েছিলুম—আজ কুমারখালিতে আছি—আজই শিলাইদহ ফিরব তার পরে সেখান থেকে কাজের বন্দোবস্ত করে দিয়েই আমি চলে যাব।

দেখা শীঘ্রই হবে সেই সময়ে জীবনের আদর্শরক্ষার জন্যে মনের ভাব কি রকম হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আলোচনা করা যাবে।

মাঝে তোমার শরীর অসুস্থ হয়েছিল শুনে মন উদ্বিগ্ন হয়েছে। এক একবার মনে হচ্ছে হয় ত Byoin খেলে তোমার উপকার হবে। Vibronaতে এখন কি তেমন ফল হচ্চে না?

এখনি কুমারখালি কাছারিতে যেতে হবে—প্রজারা সেখানে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছে। ইতি ২৯শে আষাঢ় ১৩১৭

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ১৫

ওঁ

পতিসর

কল্যাণীয়েষু

ভাসিতে ভাসিতে অবশেষে পরশু রাত্রে পতিসরের ঘাটে আসিয়া আমাদের নৌকা ঠেকিয়াছে। এতদিন কত বিল নদী নালা ধানের ও পাটের ক্ষেতের মধ্য দিয়া আসিতে হইয়াছে—জল কূল ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

সারদা বাবুর চিঠি পাইয়াছি এবং তাহার উত্তরও দিয়াছি—তোমার মুখে অনেকবার তাঁহার কথা শুনিয়া তিনি আমার কাছে একপ্রকার পরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন।

প্যারীরও একখানি পত্র পাইয়াছি। যথাসাধ্য উৎসাহ দিয়া তাহাকেও পত্র লিখিয়া দিলাম।

ভরা ভাদ্রে হঠাৎ মনটা উতলা হইয়া ওঠাতে ইস্কুল পালাইয়া আসিয়াছি— কিন্তু মাঝে মাঝে গুরুমহাশয়ের ডাক পড়িতেছে অতএব বেশিদিন পালাইয়া থাকা চলিবে না। সম্ভবত আগামী শনিবারে এখান হইতে যাত্রা করিব। যদি পারি তবে বুধবারের পূর্বেই বোলপুরে পৌঁছিবার চেষ্টা করিব।

বামনদাস বাবু কিরূপ স্থির করিলেন তোমার পত্রে তাহার কোনো সংবাদ পাওয়া গেল না। বোধ হইতেছে তাঁহার আসা ঘটিবে না— অতএব অন্য লোকের সন্ধান করিতে হইবে। তোমার জানা কোনো যোগ্য লোক আছে?

আমার মনে হয় নগেনকে নিম্নতন ছাত্রদের অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষায় নিযুক্ত করিলে কোনো ক্ষতি নাই— কিন্তু অধ্যাপকদের সম্মতি পাওয়া যাইবে না আশঙ্কা করিয়া প্রস্তাব

করিতে পারিতেছি না। তাহাকে কর্মে নিযুক্ত করিয়া দিয়া তাহার অপমানভার মোচন করিয়া দেওয়াই কর্তব্য— তাহাকে চিরদিন অবনত করিয়া পাশে ঠেলিয়া রাখা উচিত নহে— ইহাতে তাহাকে দুর্গতির মধ্যে চাপিয়া রাখা হয়। যাহা হউক যদি সকলে অত্যন্ত আপত্তি না করেন তবে শিশু ছাত্রদের শিক্ষাভার তাহার প্রতি সমর্পণ করিলে নিশ্চয় সে প্রাণপণ যত্নে কাজ করিবে এবং তাহাতে বিদ্যালয়ের কোনো ক্ষতি হইবে না।

ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। ইতি ৮ই ভাদ্র ১৩১৭

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ১৬

ওঁ

শিলাইদা

কল্যাণীয়েষু

অবসাদের দ্বারা মনকে কিছুতেই অভিভূত হইতে দিয়ো না। ভাবকে যখনি কাজের ক্ষেত্রে উপস্থিত করিবে তখনি যদি দুর্বলতা চিত্তকে আক্রমণ করে তবে তাহার মত দুর্ভাগ্য আর কিছুই হইতে পারে না।

আমি বোধ হয় অতি শীঘ্রই এখান হইতে যাত্রা করিব। এতদিন এখানে লোকের ভিড় ছিল বলিয়া নাটকটা ভাল করিয়া লিখিবার সুযোগ পাই নাই। এখন নিরালা পাইয়া মন দিয়া লিখিতে সুরু করিয়াছিলাম— কিন্তু তোমাদের বোলপুরের আহ্বান আসিয়া পৌঁছিয়াছে আর আমাকে থাকিতে দিল না। অসম্পূর্ণ লেখাটা লইয়াই বোধ হয় ছুটিতে হইল— কর্মের আবর্তের মধ্যে গিয়া পড়িলে শীঘ্র শেষ হইবার কোনো আশা থাকিবে না। যাহাই হউক আমি এখান হইতে সম্ভবত পশুই রওনা হইব। অতএব সন্তোষকে খবর দিয়ো যেন আমার চিঠিপত্র এখানে না পাঠাইয়া কলিকাতায় পাঠায়। মনকে দৃঢ় করিয়া এবং প্রসন্ন করিয়া কাজে লাগ। ইতি ১৩ই আষাঢ় ১৩১৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ১৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

বিলাত যাওয়াই স্থির। অত্যন্ত ব্যস্ত। বইওয়ালা আমার বই কিনতে রাজি হল না। অতএব ঋণের উপর ভর করেই বেরতে হবে।

তোমার সেই দেশের যুবকটিকে (রমণীরঞ্জনকে) সঙ্গে নেওয়াই স্থির করচি। তাকে জিজ্ঞাসা কোরো সে ত কষ্ট সইত পারবে? জাহাজে তাকে তৃতীয় শ্রেণীতে যাত্রা করতে হবে। হয়ত Cooker এ নিজে রেঁধে খেলেই তার পক্ষে আরামের হবে। কেন না সেখানে

দিন রাত কেবল মাংস খাবারই ব্যবস্থা। সেটা তার শরীরে হয়ত সইবে না। আমিও মাংস খাব না কিন্তু প্রথম শ্রেণীতে যা খাবার দেয় তার মধ্য থেকে আমার খাবার বেছে নেওয়া শক্ত হবে না। যদি রমণী কষ্টসহিষ্ণু ও অধ্যবসায়ী হয় তাহলে কোনো ভাবনা নেই। শীঘ্র তাঁকে আসতে বোলো। আর বেশি বিলম্ব নেই কাপড় তৈরি করতে ও Passage Engage করতে হবে। দেরী হলে মুস্কিল আছে।

দ্বিপু যে তোমার অনুপস্থিত কালে তোমাকে কিছু দেবেন আমি সে আশা করিনে। সেটুকু যেমন করে হোক্ আমিই পুরিয়ে দেবার চেষ্টা করব। আমরা সম্ভবত অক্টোবরের ৫/৬ই ছাড়ব। ১৩১৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ১৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমি কবে যাত্রা করিব তাহা এখনো নিশ্চয় স্থির করিয়া বলিতে পারি না। যে জাহাজে যাইবার কথা তাহা ২৬ শে অক্টোবরে বম্বাই ছাড়িবে— কিন্তু শুনিলাম সে জাহাজ কিছু জখম হইয়াছে তাহাকে সারাইতে হইতেছে— যদি অন্য জাহাজে যাইতে হয় তবে হয়ত ৫/৬ দিনের মধ্যেই ছাড়িতে হইবে—নতুবা এখনো ১০/১২ দিন দেরি আছে।

রমণী আমাদের সঙ্গেই যাইবে। তাহার কাপড় চোপড় তৈরি করিতে দেওয়া হইয়াছে। সে এখন আমাদের এখানেই আছে।

আমেরিকায় যাইবার পূর্বে তুমি ইংরেজি ভাষাটা রীতিমত পরিশ্রম করিয়া পড়িয়ো নতুবা তোমার সেখানকার শিক্ষা কিছুতেই অগ্রসর হইবে না— সৌখিনভাবে নিজে নিজে বই পড়িবার কোনো মূল্যই নাই। ইস্কুলের ছাত্রের মত করিয়াই তোমাকে ইংরেজি লিখিতে ও পড়িতে শিখিতে হইবে। বানান ব্যাকরণ কিছু বাদ দিলে চলিবে না। এ জন্য তোমাকে যদি কিছু বিলম্ব করিতেও হয় তবে তাহাও শ্রেয় নতুবা তোমাকে বিস্তর বাধা ও লজ্জা পাইতে হইবে এবং সেখানে গোড়াতেই বিলম্ব করিয়া তোমার অল্প সম্বলের অনেকটা বৃথা নষ্ট হইবে। প্রত্যহ ৬/৭ ঘণ্টা কেবলি তোমাকে ইংরেজি ভাষার চর্চা করিতে হইবে— তোমার হাতের অক্ষরও যেরূপ অত্যন্ত কাঁচা তাহাও চলিবে না। প্রত্যহ dictation লেখা translation করা, Grammar এর exercise করা, ইংরেজি রচনা করা, কবিতা গদ্যে Paraphrase করা বড় লেখাকে ছোট করা, ছোট লেখাকে বড় করা ইত্যাদি ব্যাপারে প্রাণপণে খাটিতে হইবে। এ সম্বন্ধে সন্তোষ ও নেপালবাবুর কাছ থেকে আন্তরিক সাহায্য পাইবে এবং যদি ইতিমধ্যে আর কোনো ভাল শিক্ষক আসেন তবে তাঁর কাছ থেকেও উপকার আশা করিতে পারিবে। শচীন্দ্রবাবুও ইংরেজি রচনা প্রভৃতি সম্বন্ধে তোমাকে আনুকূল্য করিবেন। এই রকম করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষকের

কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পাঠ লইলে তোমার সমস্ত দিনই পড়া চলিতে পারিবে। যদি গ্রীষ্মে প্রস্তুত না হইতে পার তবে আগামী autumn session এ আমেরিকায় যাইবার জন্য ব্যবস্থা করিয়ো— লোভে পড়িয়া তাড়াতাড়ি করিয়া কাজ নষ্ট করিয়ো না— তোমার ইংরেজিটার গোড়া পাকা না করিয়া কদাচ যাইয়ো না— কারণ সেখানে গিয়া বালকদের সঙ্গে বালকদের মত করিয়া পড়িতে বসা তোমার পক্ষে কিছুতেই শ্রেয় হইবে না। ক্রমাগতই নানারকম করিয়া ইংরেজি লিখিবার চর্চা করিবে এই তোমাকে আমার পরামর্শ। মাদ্রাজ Thompson Co হইতে Sheppard's manual of English বইখানি আনাইয়া আগাগোড়া exercise করিয়া অভ্যাস করিয়া যাইবে। তোমার প্রতি আমার অন্তরের আশীর্বাদ রহিল— তোমার নিজের ইচ্ছা সফল হউক আর না হউক ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার উপর একান্ত নির্ভর করিবে— আকাঙ্ক্ষার চাঞ্চল্যকে সম্পূর্ণ বশে রাখিয়া কল্যাণের দুর্গম পথে নিষ্ঠার সহিত প্রসন্নমনে প্রফুল্লমুখে যাত্রা করিবে। ইতি ২৬শে আশ্বিন ১৩১৮।

শুভাকাঙ্ক্ষা
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ১৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

মাঝে কয়েকদিনের জন্য বোলপুর গিয়াছিলাম আজ আবার কলিকাতায় আসিয়াছি শীঘ্রই বোটে করিয়া গঙ্গা উজাইয়া নিরুদ্দেশ হইবার চেষ্টায় আছি।

তোমার আমেরিকায় যাওয়া আমার অভিপ্রেত নহে এমন সন্দেহ মনে রাখিয়ো না। প্রস্তুত হইয়া যাইবে ইহাই আমার ইচ্ছা। সেজন্য তোমাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইবে। সমস্ত দিন কেবলি ইংরেজি ভাষাকে ব্যাকরণ ও রচনার চর্চার দ্বারা আয়ত্ত করিতে হইবে নতুবা সেখানে দীর্ঘকাল বৃথা সময় নষ্ট হইবে।

রাখীবন্ধনের যে ঘোষণাপত্র সুরেন্দ্রবাবুরা বাহির করিয়াছিলেন তাহাতে আমার সম্মতি না লইয়া আমার নাম বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। তুমি ত জানই আমি এই সকল উৎপাত আড়ম্বর বৃথা আস্ফালন একেবারেই ভালবাসি না। সেদিনকার সভায় আমাকে লইয়া যাওয়াও তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল। আমি যাই নাই। কোনোপ্রকার রাজনৈতিক সভাসমিতির সঙ্গে আমার কোনো যোগ নাই। এবার নিতান্তই জবরদস্তি করিয়া সুরেন্দ্রবাবু আমার নাম বাহির করিয়া দিয়াছেন। [১৩১৮]

[পত্র অসম্পূর্ণ]

পত্র : ২০

ওঁ

শিলাইদা

কল্যাণীয়েষু

আগামী ১৪ই জ্যৈষ্ঠে আমাদের জাহাজ বম্বাই ছাড়িবে। কলিকাতা হইতে সম্ভবত ১০ই রওনা হইব। দেবলকে আমাদের সঙ্গে লওয়া সম্ভবপর হইবে না—প্রথম কারণ City line এ তৃতীয় শ্রেণী নাই— দ্বিতীয় কারণ তাহার সেশনের এত আগে হইতে তাহার ব্যয় বহন করা বর্তমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে একেবারেই সঙ্গত হইবে না। বউমা এবং রথীও আমার সঙ্গে যাইতেছেন— একলা হইলে আমার যাওয়াই হইত না।

বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থার বিশেষ কোনো সুবিধার কারণ দেখা যায় না। এবার শুনিলাম নতুন ছেলে নিযুক্তির আবেদন পাওয়া যায় নাই— বরঞ্চ ৫/৬টি পুরাতন ছাত্র বিদায় লইবে।

ব্যবস্থাবিভাগ হইতে এই মাসের হিসাব আমার কাছে পাঠাইয়াছেন তাহাতে দেখিলাম ৬২০০ টাকা দেনা হইয়াছে। বই বিক্রয়ের আয় কিরূপ হইবে জানি না। "পাঠসঞ্চয়" আশুবাবুর হাতে দিয়া আসিয়াছি কি ফল হয় পরে জানিতে পারিব।

আমরা এখানে আমাদের তহবিল হইতে মাসিক দুইশত টাকা সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। যদিও আমাদের বিলাত যাত্রা বহু ব্যয়সাধ্য হইবে তবু বিদ্যালয়ের অভাব পূরণে উদাসীন থাকিতে পারি না।

এ সকল আর্থিক সঙ্কট লইয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতে ইচ্ছা করি না। সচ্ছল অবস্থা অপেক্ষা এই দৈন্যই ভাল। যাঁহারা টাকার উপরেই নির্ভর করিতে চান তাঁহাদিগকে ঈশ্বর হয়ত একদিন বলপূর্বকই তাঁহার আশ্রম হইতে বিদায় দিবেন। যাঁহারা জীবন সমর্পণ করিয়া জীবন লাভ করিতে প্রস্তুত আছেন তাঁহারাই একদিন বাকি থাকিবেন। ঈশ্বর তুঁষ ঝাড়াই করিবার আয়োজন করিতেছেন। আমি ফিরিয়া আসি— যদি নিজে সত্য হইতে পারি তবে সমস্তকে সত্য করিয়া তুলিতে পারিব।

আমার যাত্রার আগে তোমাদের সঙ্গে হয়ত দেখা হইবার আশা নাই। আমি আর দুই চারিদিনের মধ্যে কলিকাতায় যাইব।

নিজের জীবনের সমস্ত চিন্তা ও সঙ্কটের ভার ঈশ্বরের চরণে বিসর্জন দিয়া সহজ হও, সুস্থ হও, বলিষ্ঠ হও— তাঁহার ইচ্ছাকে প্রফুল্ল চিত্তে মাথা পাতিয়া লও এবং এই কথা দৃঢ়নিশ্চিত ভাবে মনে স্থির রাখ যে সকল অবস্থাতেই সকল দারিদ্র্যের মধ্যেই যাহা শ্রেয় তাহাকে লাভ করা যায় এবং নিজের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাকেই প্রকাশ করিয়া কৃতার্থ হওয়া যায়। বাহ্য আয়োজনের মূল্য অতি অল্প— মনের ভিতরেই মূলধন সঞ্চিত হইয়া আছে। ইতি ২৯শে বৈশাখ ১৩১৯

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ২১

ওঁ

Oakridge Lynch-stroud Glos

কল্যাণীয়েষু

তোমার সম্বন্ধে সন্তোষের চিঠি দেখেছি। কিন্তু নিশ্চয়ই এদেশে তোমার ভয়ের কোনো কারণ নেই সে সম্বন্ধে তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আমি লণ্ডনে গিয়ে আর্ণল্ড সাহেবের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলাপ করে দেখব। তা ছাড়া এখানকার দুই একজন ভাল লোকের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়ে গেলে ভবিষ্যতের জন্যে তুমি নিরুদ্বিগ্ন হতে পারবে। আমি আমার বন্ধু Rothenstein এর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধে কথা কয়ে রেখেছি।

আমি আগামী শনিবারে লণ্ডনে যাচ্চি। দেখা হলে সকল বিষয়ে আলোচনা হতে পারবে। তুমি মনকে সম্পূর্ণ অক্ষুব্ধ রেখে দাও।

এখনি তুমি সতীশবাবুর কাছে কিছু কিছু ইংরেজি শিখতে সুরু করে দাও। আর কিছু না হোক রোজ অন্তত আধঘণ্টা বা পনেরো মিনিট করে যদি তুমি ইংরেজি dictation করতে থাক তাহলেও তোমার উপকার হবে। তোমার ইংরেজি এত বেশি কাঁচা যে তোমাকে একেবারে গোড়ার দিকের থেকে সুরু করতে হবে৷ তোমার বয়সের লোকের পক্ষে সেটা অত্যন্ত ক্লেশকর হবে। কিন্তু উপায় নেই। যত শীঘ্র পার এই কাজে লেগে যাও। ইতি ৫ ভাদ্র ১৩১৯

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ২২

ওঁ

508 W, High Street
Urbana Illinois
U.S.A

কল্যাণীয়েষু

কালীমোহন, বিদেশে এসে প্রথম কিছুদিন বড় গোলমালে যায়— তখন চিঠিপত্র লিখতেও মন লাগে না। পথে আটলান্টিক ভয়ঙ্কর দোলা দিয়েছিল— শরীরে প্রাণটা ছাড়া আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট ছিল না। জাহাজে যাত্রীগুলিও সুবিধামত ছিল না— কারো সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়নি— হবার চেষ্টাও করিনি। ডাঙায় নেমে দুই একদিন কোনোমতে নিউইয়র্ক শহরে কাটিয়েই এখানে দৌড় মেরেছি। সুবিধা এই, এখানে অনেকেই রথীকে খুব ভালবাসে— তাই আদর যত্নের ত্রুটি হয়নি। আমি এখানকার অধ্যাপক ব্রুকসের বাড়িতে ছিলুম। তাঁরা আত্মীয়ের মত আমাকে যত্ন করেছেন— এই রকম সহৃদয় মানুষের সঙ্গ বিদেশের বিদেশত্বকে অনেকটা কোমল করে আনে। আমাদের নিজের বাসায় কাল উঠে এসেছি। আমাদের বাড়িতেই সোমেন্দ্র এবং বঙ্কিম একটা

ঘরে আশ্রয় নিয়েচে। বঙ্কিমের সম্বল অল্প, তাই তাকে কাজ করে নিজের বাসাখরচ চালাতে হয়। এতদিন এখানকার একজন অধ্যাপকের বাড়িতে কাজ করছিল— এখন থেকে আমাদেরই বাড়ির সমস্ত কাজ করে তার দিন চলে যাবে। রথী কলেজে তার অধ্যয়নে যোগ দিয়েছে। এ জায়গাটি বড় শান্ত, তাই আমার খুব আরাম বোধ হচ্ছে। তোমাদের সমস্ত খবর দিয়ো। এখানে এসে অবধি Rothenstein এর কোনো চিঠি না পেয়ে মনটা বিমর্ষ আছে। তাঁর সংবাদ কি। ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয়ের কি হল? লণ্ডনের নভেম্বরের ধাক্কা সামলাতে পারচ কি? এখানে যথেষ্ট সূর্যালোক এবং মুক্ত আকাশ— চেহারাটা আমাদের দেশের মত। চণ্ডী ও দেবলকে আমার আশীর্বাদ জানিয়ো। আমার বই কি বের হয়েছে? ২২ কার্তিক [১৩২৯]

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ২৩

ওঁ

508 W. High street
Urbana Illinois
U.S.A
১ অগ্রহায়ণ ১৩১৯

কল্যাণীয়েষু

এ পর্যন্ত তোমাদের কোনো খবর পাইনি। কি রকম চলচে জানতে উৎসুক আছি। ক্রমশ তোমাদের উন্নতির পথ বাধামুক্ত হচ্ছে এ বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। আশা করি লণ্ডনের শীত ঋতু তোমার প্রতি নির্দয়তা প্রকাশ করছে না। প্রশান্ত তোমাকে ৫০০ টাকা পাঠিয়েছেন শুনে আমি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়েছি। তোমার যেটুকু অভাব ছিল এতেই বোধ হয় পূরণ হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি কোনো নূতন কর্ম নিয়োনা যেন। যা নিয়েছ সেইটেই রীতিমতো করে আয়ত্ত করে নাও—বেশি বিষয় নিলেই যে বেশি উন্নতি হয় তা মনেও কোরো না। তোমাদের কলেজের লাইব্রেরিতে বসে নিজে নিজে যতটা পার ইংরেজি সাহিত্য এবং তার সমালোচনা পড়ে নিয়ো। আধুনিক সাপ্তাহিক (যেমন Nation) এবং মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকাগুলি মনোযোগ করে পোড়ো— নইলে তোমার চিন্তা এবং ভাষা সেকেলে রকম হয়ে পড়বে। এখানকার [এখনকাব] কালের চিন্তাস্রোতের সঙ্গে সর্বপ্রকারে তোমার যোগ রাখা চাই। আমরা যখন ইংলণ্ডে ফিরে যাব তখন সকল দিকেই তোমার উন্নতি সুস্পষ্টরূপে লক্ষ্যগোচর হবে এই আশা করে আমার মন আনন্দিত হচ্চে। আমরা গ্রীষ্মের সময় সেখানে যাব এবং খুব সম্ভব তার পরে শেষ পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল য়ুরোপেই যাপন করব। রথীর ইচ্ছা তিনি এখানে তাঁর শিক্ষিতব্য বিষয়ের ভূমিকা করে নিয়ে তার পরে ইংলণ্ডে ও কন্টিনেন্টে তাঁর শিক্ষা সমাধা করবেন। দেবলের সংবাদ কি, আমাকে জানিয়ো। তার শরীর ভালো আছে ত? এবারকার মেলে জগদানন্দের যে চিঠি পেয়েছি [?] তার থেকে

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সমস্ত সংবাদ পাবে। আমি ত মনে মনে এই আশা করে আছি— দুই বছর পরে আমরা সবাই ফিরে গিয়ে আমাদের বিদ্যালয়কে নূতন জীবনে সঞ্জীবিত করে তুলতে পারব। ইতিমধ্যে কোনোমতে দীপটি জ্বালিয়ে রাখতে পারলেই হল। চণ্ডীর কোনো খবর পাইনি। গ্লাসগোতে তার কি রকম চলচে আমাকে জানিয়ো। দেবলকে আমার আশীর্বাদ দিয়ো। রোটেনস্টাইনকে আমার নমস্কার দিয়ো। তাঁকে বোলো তোমার হাত দিয়ে সতীশ বাবুকে যেন আমার ইংরেজি গীতাঞ্জলি একখণ্ড পাঠিয়ে দেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ২৪

ওঁ

2nd Dec, 1912
508 W. High Street
Urbana Illinois

কল্যাণীয়েষু

এদেশে এসে এতদিন পরে তোমার একখানি চিঠি পাওয়া গেল। আমি মনে করছিলুম নিশ্চয়ই তুমি ঠিকানার কোনো গোল করেছ—খুব সম্ভব Urbana লিখেছ Illinois লেখনি— কিম্বা Illinois লিখেছ Urbana বাদ দিয়ে। এদেশে আরো অনেকগুলো Urbana আছে। তুমি লিখেছ আরো দুখানা চিঠি পূর্বে Seymour সাহেবের Care এ পাঠিয়েছ কিন্তু সে দুখানা পাইনি—নিশ্চয়ই তোমার ঠিকানার কোনো অসম্পূর্ণতা ছিল।

তোমার নগদ পাঁচশো টাকা লাভের ইতিহাস পড়ে পুনশ্চ আশ্চর্য হওয়া গেল। আমি তোমার সম্বন্ধে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলুম। কিন্তু প্রশান্ত আমাদের সকলকে নিয়ে এতবড় একটা ঠাট্টা কেন ফেঁদে বসে আছে কিছুই বুঝতে পারচি নে— রহস্য ক্রমেই আরো গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠছে। যাই হোক তোমার কাছ থেকে সংবাদ পেলেই বৌমা নিশ্চয়ই টাকা পাঠাবার একটা ব্যবস্থা করবেন। ইতিমধ্যে দেবলের কাছে যা টাকা আছে তার থেকে তোমার খরচ চালাবার ব্যবস্থা কোরো, টাকা হাতে এলে শোধ করে দিয়ো। রথী বলছিল তার কাছে আপাতত যা টাকা আছে তাতে তোমার ভাবনার কোনো কারণ নেই—রথী এ সম্বন্ধে দেবলকে চিঠিও লিখে দেবে বলছিল।

ওখানে তোমরা পড়াশুনা প্রভৃতির যে রকম ব্যবস্থা করেছ তাতে আমি খুব খুসি আছি। এখানে ঠিক অমন সুবিধা পেতে না, তা ছাড়া আমেরিকান উচ্চারণ তোমাদের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠত। শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে তোমাদের যে বই কেনার দরকার তা কিনো—তার খরচ তোমাদের লাগবে না।

তোমার চিঠির ভাবে বোধ হচ্ছে, Newyork এ পৌঁছে তোমাকে যে চিঠি লিখেছিলুম সেটা তুমি পাওনি। সত্য কি?—এখানে শহরটি বেশ শান্ত নির্জন, আকাশ বেশ নির্মল, সূর্যালোক অবারিত— তাতে খুব একটু আরাম বোধ করচি। কিন্তু যে বিশ্রাম ও অবকাশ আশা করছিলুম সে আমার ভাগ্যে নেই। এ শহরে এসে অবধি চার সপ্তাহে চারটে

ইংরেজি প্রবন্ধ পাঠ করেছি— আমার পক্ষে সে কম শাস্তি নয়। তোমাদের মত আমারও এ Composition Class। এখানে দুই একজন য়ুরোপীয় জার্মান আছেন তাঁরা আমার এই আধা দার্শনিক আধা কাব্যিক লেখাগুলো খুব পছন্দ করচেন— ছাপাবার জন্যে অনুরোধ করেছেন— বিলাতে ফিরে গিয়ে তার পরে দেখা যাবে। সেখানে যিনি আমার বন্ধু আছেন তাঁর উপরেই আমার সমস্ত নির্ভর। তেমন বন্ধু আমি আর কোথাও পাব না। তাঁর জন্যে এক একবার এখান থেকে Aeroplane যোগে উড়ে যাবার ইচ্ছা হয়— কিন্তু Aeroplane এর চেয়ে কল্পনাযানটা নিরাপদ এবং শস্তা এইজন্যে তার বেশি আর এগল না। কিন্তু বসন্তকালে আমরা নিশ্চয় ফিরব সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। কার্তিক মাসের ভারতীতে 'বন্ধু' বলে Rothenstein এর উপরে আমার একটা লেখা বেরিয়েছে বোধ হয় দেখেছ। যদি না দেখে থাক, লিখো আমি পাঠিয়ে দেব। তোমার চিঠি পেয়ে মনটা এমন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল যে লণ্ডনে ফিরে যাবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছিলুম। কিন্তু এখানে আমার দীর্ঘকালের জন্যে বাড়ি ভাড়া করে এবং এখানকার কলেজে রথীর পড়ার সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে রীতিমতো আড্ডা গেড়ে বসে আছি— হঠাৎ নড়া আমার সামর্থ্যে কুলবে না— সেইজন্যে ধৈর্য অবলম্বন করে আছি। যাই হোক্ তোমার কোনো ভাবনা নেই— সম্পূর্ণ নিরুপায় হবার কোনো আশঙ্কা দেখছি নে। তার পরে কিছুকাল পরে আমরাও পুনশ্চ তোমাদের সঙ্গে গিয়ে জুটে পড়ব। ইংরেজি গীতাঞ্জলি নিশ্চয়ই একখণ্ড তুমি পেয়েছ। আমি একখণ্ড মাত্র পেয়েছিলুম তাও একজনকে দান করে ফতুর হয়ে বসেছি, কবে আর দুই একখণ্ড পাব সেই আশায় তাকিয়ে বসে আছি। অগ্রহায়ণ, ১৩১৯

স্নেহানুবদ্ধ
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ২৫

ওঁ

508 W, High Street
Urbana Illinois
১লা, পৌষ ১৩১৯

কল্যাণীয়েষু

এবারে তোমার চিঠিতে সমস্ত বিস্তারিত সংবাদ পেয়ে আনন্দিত হলুম। তুমি যে আর্থিক সঙ্কট থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে এতে আমি খুব নিশ্চিন্ত হয়েছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রশান্তর মৎলব আমি ত কিছুই বুঝতে পারলুম না। ওর মধ্যে কি কিছু পাগ্‌লামি আছে? আমি আগামী শনিবারে চিকাগো যাব। সেখানে নিঃসন্দেহ একটা জনচক্রের মধ্যে পড়তে হবে—কারণ সেখানে ইতিমধ্যে আমার পরিচয় কতকটা রটে গেছে এবং আমি সেখান থেকে চিঠিপত্র কিছু পেতে আরম্ভ করেছি। নিউইয়র্কের কাছে রচেস্টার শহরে National Federation of Religion Liberals দের একটি Congress বস্‌বে সেখানে আমাকে Race

Differences and Human Brotherhood সম্বন্ধে বক্তৃতা করবার জন্যে আহ্বান এসেছে। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। সেখানে Prof Euckenও বক্তৃতা করবেন—অনেক যোগ্য লোকের সঙ্গে আলাপ হতে পারবে। জানুয়ারি মাসের শেষভাগে সভা হবে। একেবারে চিকাগোর কাজ সেরে সেখানে যাত্রা করব। আমার মুস্কিল এই—রথী এখানে কলেজে যোগ দিয়েছে—আমেরিকায় একলা ভ্রমণ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হবে। কিন্তু বোধহয় দায়ে পড়লেই দেখা যাবে ব্যাপারটা নিতান্ত অসাধ্য নয়। ইংরেজি ভাষায় কোনো ভদ্র সভায় আমি যে কোনোদিন প্রবন্ধ পাঠ করব এও ত আমি কোনোদিন সম্ভবপর মনে করিনি। এই বক্তৃতা কাঙাল মার্কিনের দেশে এসে তাও ত আমার ঘটল।

বঙ্কিম এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে Electric Engineering শিক্ষা করচেন। সোমেন্দ্র এটা ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করচে। ওর ইংরেজি দুরস্ত করতে এখনো অনেকদিন লাগবে তা ছাড়া ওর একটু আয়েসি মেজাজ, সমস্ত প্রাণমন দিয়ে পড়াশুনো করা ওর ধাতে নেই। আমাদের এখানে এক একদিন তাপমান যন্ত্র Zeroর নীচে শুঁড় গুটিয়ে বসেছিল কিন্তু মস্ত সুবিধা এই যে সূর্যদেবের কার্পণ্য নেই। এখানে এসে অবধি আকাশের মুখ ভার ত প্রায়ই দেখিনি। জানুয়ারিতে শীত আরো কিছু বাড়বে। কিন্তু এদেশের বাড়িতে ঘরে ঘরে গরম হাওয়া কিম্বা গরম বাষ্প দিয়ে বেশ তাতিয়ে রেখে দেয়—শীত কোনোদিন তেমন অসহ্য বোধ হয় না। এমন শীত ইংলণ্ডে পড়লে মুস্কিল হত। নানা লোকের সঙ্গে তোমার আলাপ পরিচয় হচ্চে এতে আমি বড় আনন্দ বোধ করচি। রোটেন্‌স্টাইনের সঙ্গ তোমার পক্ষে মহৎলাভ। তাঁর মত এমন অকৃত্রিম বন্ধু আমি পাইনি। তাঁর বন্ধুত্ব আমার মনকে প্রসারিত করে দিয়েছে। এখান থেকে ফিরে গিয়ে আবার যে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে এইজন্যে আমি উৎসুক হয়ে আছি। ৭ই পৌষ নিকটবর্তী হয়ে এল। আশ্রমের কথা স্মরণ করে মনটা ব্যাকুল বোধ হচ্চে। আবার কবে আমরা সকলে মিলে উৎসবে সম্মিলিত হতে পারব কে জানে। সেই উৎসবের আনন্দ উপকরণই যেন জীবন পূর্ণ করে সংগ্রহ করে যেতে পারি। দেবলকে আমার আশীর্বাদ জানিয়ো—আশা করি এতদিনে সে রথীর কাছ থেকে টাকা পেয়েছে।

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ২৬

ওঁ

508 W. High Street
Urbana Illinois

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিতে সমস্ত খবর পেয়ে খুব খুসি হলুম। আমাদের এখানে আমার শোবার ঘরের এক প্রান্তে কম্বল পেতে ভোরের বেলা আমরা পাঁচটি প্রাণীতে মিলে ৭ই পৌষের উৎসব করেছিলুম। তার আগের রাত্রি পর্যন্ত আমার শরীর অসুস্থ ছিল—কিছুদিন

দিবারাত্রি অর্শের যন্ত্রণা অত্যন্ত বেড়ে উঠেছিল কিন্তু আমি দেখলুম সেই বেদনাতেই যথার্থভাবে আমার উৎসবের আয়োজন হচ্ছিল। রোগের যন্ত্রণা মানুষকে বাইরে থেকে টেনে এনে নিজের গভীরতার মধ্যে আকর্ষণ করে রাখে—আমি ঘরের কোণে আবদ্ধ হয়ে থেকে এই বেদনার দান গ্রহণ করছিলুম। তাই সেই বেদনা দিয়েই আমার ৭ই পৌষের উৎসবের আলো খুব উজ্জ্বল হয়ে জ্বলল—আমরা যে অন্য সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে পড়ে আছি তা মনেই হল না—আমাদের শোবার ঘরের কোণে দেয়াল ছিল না আড়াল ছিল না—সেখানে শান্তিনিকেতনের শীত প্রত্যুষের হাওয়া অবাধে বয়ে গিয়েছিল, আমি ত সেদিন সমস্তদিন খুব গভীর আনন্দে পূর্ণ হয়ে কাটিয়েছি—পূর্ণমঙ্গলের কাছে জীবনকে একান্ত উৎসর্গ করবার যে বাধা আমার মধ্যে আছে নিশ্চয় সেদিন তার কিছু কেটে গিয়েছে, এবং আশ্বাস পেয়েছি কোনো না কোনোদিন একেবারে কেটে যাবে, মানব জন্মের সফলতার পরিচয় না পেয়ে নিজেকে সমস্ত মিথ্যার জাল থেকে মুক্ত না করে কখনই এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করব না। যিনি এই রণক্ষেত্রে সশস্ত্রে পাঠিয়েছেন তাঁর কাছে পরাভবের বার্তা বহন করে নতশিরে কেমন করে দাঁড়াব?

তুমি যে তোমার আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে আঘাত পাচ্চ সে তোমার সৌভাগ্য। অবাধ আনুকূল্য আধ্যাত্মিক সম্পদের পক্ষে অনুকূল নয়। সেখানে তোমার নিজের মধ্যে নিজের শক্তি নিজের আনন্দ আছে, তোমার আত্মীয়েরা সেইখানে তোমাকে যাবার পথে তাড়না করচে। সেই জায়গায় একদিন তোমাকে পৌঁছতে হবে। সেইখানে গেলে তোমার সমস্ত অভাব একেবারে ঘুচে যাবে—অভাবের একেবারে মূলোচ্ছেদ হয়ে যাবে। তা না হলে মানুষ আপনাকে সম্পূর্ণকরে ত্যাগ করতে পারে না। তুমি আপনাকে নিবেদন করবার জন্যে পৃথিবীতে এসেছ এই জন্যে আত্মীয়দের সঙ্গে তোমার বিচ্ছেদ ঘটতে—তাদের যে কেবলই নেবার দিকে মন, দেবার দিকে নয়—তোমাকে তারা ভোগের উপকরণ বলে জানে, মনে করে তুমি তাদের ঘরকণার সামগ্রী—সুতরাং এখানে তাদের নিরাশ হতেই হবে এবং সেই নৈরাশ্যের বেদনায় তারা তোমাকে দুঃখ দেবে কিন্তু এই দুঃখই তোমার মঙ্গল পথের পাথেয় এই দুঃখ তোমার সৌভাগ্য এই দুঃখ দাগার দ্বারাই ঈশ্বর তোমাকে সংসার থেকে টেনে নিয়ে আপন বলে চিহ্নিত করে নিচ্চেন—এই চিহ্ন খুব পাকা হয়ে উঠুক, তাহলেই সবাই তোমাকে একদিন পথ ছেড়ে দেবে, বুঝবে যে তোমার মনিবের উপর ত জোর খাটবে না। এখনো তাদের মনে সন্দেহ আছে, এখনো চিহ্ন পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠেনি এইজন্যেই তারা বারবার তোমাকে দুঃখ দিচ্চে, চিহ্ন ফুটে উঠলেই তাদের কাজ শেষ হবে, আগুন নিবে যাবে।

ওখানে তোমাদের বন্ধুমণ্ডলী ক্রমশ জমে উঠ্‌চে শুনে খুব আনন্দলাভ করলুম। Ezra Pound আমাকে চিঠি লিখেছেন তাতে তোমার কথা বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন। এঁদের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা হলে তোমার খুব উপকার হবে।

ভারতী তোমাকে পাঠিয়ে দিলুম। তাতে "বন্ধু" বলে আমার যে প্রবন্ধ বেরিয়েছে সেইটের লক্ষ্য কে তা নিশ্চয়ই পড়ে বুঝতে পারবে। ইতি ১৭ই পৌষ ১৩১৯

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

508 W. High Street
Urbana, Illinois
27 Feb. 1913
[১৯ ফাল্গুন ১৩১৯]

কল্যাণীয়েষু

আমি তোমার পূর্ব ঠিকানায় তোমাকে একটা চিঠি লিখেছি এবং সেই সঙ্গে আমার রচেষ্টার কন্‌গ্রেসের বক্তৃতার একটা কপি পাঠিয়ে দিয়েছি। আশা করি সেটা এতদিনে পেয়েছ। পথের ঘোরাঘুরিতে তোমাকে যথাসময়ে চিঠিপত্র লিখতে পারিনি। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে চারটে প্রবন্ধ পাঠ করেছি, সেগুলো ওদের খুব ভাল লেগেছে। সেখানকার ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক Dr. Woods এই লেখাগুলো বই আকারে ছাপবার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন। Harvard Theological Journal-এ এর দুই-একটা লেখা ছাপাবার জন্যও অনুরোধ এসেছে, কিন্তু আমি ইংলণ্ডে না গিয়ে এর কোনো ব্যবস্থা করচিনে। The Problem of Evil নামে যে প্রবন্ধ পড়েছিলুম সেটা Hibbert Journal-এর সম্পাদক L. P Jacks-এর কাছে পাঠিয়েছি। Rattrey নামে অজিতের এক বন্ধু হার্ভার্ডে পড়ছেন, তিনি Jacks-কে চেনেন। তার খুব ইচ্ছা এটা হিবার্ট জার্নালে ছাপা হয়—তাঁর মতে Evil সম্বন্ধে এর চেয়ে ভাল ব্যাখা তিনি আর কোথাও দেখেননি। এটা এখানকার সকলেরই মনে বিশেষভাবে লেগেছে, তাই বোধ হচ্চে হিবার্ট জর্নালে ছাপবার কোনো বাধা হবে না।

Quest কাগজ আমি ভারতবর্ষে থাকতে এক বৎসর subscribe করেছিলুম। ও-কাগজটি আমার খুব ভাল লাগে। আমি এবার ইংলণ্ডে গিয়ে সেখানে আমার একটা কোনো লেখা নিশ্চয়ই পড়ব এবং ওঁদের journal-এ আমার একটা কোনো লেখা দেবার চেষ্টা করব।

আমি এখানে Mrs. Moody নামে একটি বন্ধু লাভ করেছি। ইনি আমেরিকার একজন শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবির বিধবা স্ত্রী। ইনি আমাকে আত্মীয়রূপে গ্রহণ করেছেন। আমাদের বিদ্যালয়ের প্রতিও তাঁর খুব একটা শ্রদ্ধা জন্মেছে। বোধ হচ্চে, তাঁর দ্বারা আমাদের বিদ্যালয়ের উপকার হতে পারবে, কোনোরকম করে বিদ্যালয়ের কোনো কাজে লাগবার জন্যে এঁর ইচ্ছা হয়েছে। লণ্ডনে এঁর একটা বাসা আছে—সেখানে তিনি আমাকে তাঁর সেই বাসায় রাখবার জন্যে বিশেষ পীড়াপীড়ি করচেন। যদি রথীরা এখান থেকে ছুটি পাবার আগেই আমার ইংলণ্ডে যাওয়া হয় তাহলে হয় ত তাঁর ওখানেই আমার থাকা হবে। তিনি আমাকে মার মত সেবা এবং কন্যার মত ভক্তি করেন, সুতরাং তাঁর ওখানে থাকতে আমার কোনো অসুবিধা হবে না। Chelsea-তে তিনি থাকেন, সেখান থেকে তোমাদের সঙ্গেও দেখাসাক্ষাৎ হবার সুবিধা হতে পারবে। সম্প্রতি আমরা তাঁরই বাড়িতে শিকাগো শহরে আছি—বোধহয় কাল-পরশুর মধ্যে আরবানায় ফিরে যাব।

আমাদের বিদ্যালয়ের আর্থিক অভাব সম্বন্ধে চিঠিতে প্রায় উদ্বেগের সংবাদ পাই—কিন্তু তার ভিতরে যে একটি চিরানন্দের উৎস আছে সেই দিকেই দৃষ্টি রাখতে

হবে, হিসাবের খাতা এবং টাকার তহবিলের দিকে নয়। আমাদের বিদ্যালয় যতবড় সম্পদ তার তত বড় মূল্য হওয়া উচিত—সে জন্য আমরা পূর্ণভাবে দিতে পারচিনে বলে পূর্ণভাবে বিদ্যালয়কে পেতে পারচিনে—আশ্রমদেবতা আজ আমার কাছে সেই মূল্যের দাবী করেছেন, তোমরা কি মনে করেছ আমি শোধ করে দিতে কুণ্ঠিত হব? কোনো বড় জিনিস কেউ কখনো ফাঁকি দিয়ে পেতে পেরেছে? আজ বিদ্যালয়ের এই অর্থাভাবই বিদ্যালয়ের গভীরতর অভাব পূরণ করবে—আমাদের ত্যাগের শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে আকর্ষণ করবে। অর্থের সচ্ছলতায় কেবলমাত্র অর্থই পাওয়া যায় কিন্তু মানুষের জীবনকে পাওয়া যায় না—এই জন্যই আমাদের বিদ্যালয়ের দেবতা চিরদিন দরিদ্রের সাজ পরে আছেন—তিনি আমাদের কাছে তাঁর ভিক্ষার ঝুলি ধরেছেন—আমাদের সত্যকার ত্যাগের দ্বারাই তাঁর পূজা সমাধা হবে।

তোমাদের পড়াশুনা বেশ ভালই চলছে শুনে আনন্দিত হলুম। আজ আমি এখানকার একটি বড় বিদ্যালয় দেখতে গিয়েছিলুম, সেখানে দেখবার জিনিস অনেক আছে—কিন্তু এ সমস্ত ধনী বিদ্যালয়—আমাদের মত অকিঞ্চনের কাছে এসব বিদ্যালয়ের আদর্শ কোনো কাজে লাগবে না। আমাদের সম্পদ অন্যদিকে—সেই দিকেই আমাকে সমস্ত মন দিতে হবে। সে এমন জিনিস যা এখানকার সাধনার অতীত—এদের ঐশ্বর্যের আড়ম্বর দেখে আমাদের সেই গৌরব যদি আমরা বিস্মৃত হই তাহলে আমরা নিতান্তই ঠকব—একথা দৃঢ়ভাবে মনে রেখো, আমদের বিদ্যালয়ে আমরা যে যজ্ঞ সমাধা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি আজ পৃথিবীতে কোথাও এমন যজ্ঞের আয়োজন হয়নি। আমাদের দেশের ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে লক্ষ লক্ষ টাকার বর্ষণ হয়েছে কিন্তু সেই টাকার জোরে তার মধ্যে প্রাণসঞ্চার হল না—আর আমাদের এক পয়সার সম্বল নেই কিন্তু আমরা জানি জীবনের নিরন্তর ধারা সেখানে কিছু শুষ্ক হবে না—আমাদের টাকার দরকার নেই—আমরা অমৃতের ভিখারী, আমরা জননীর আশীর্বাদ নিতে এসেছি।

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯শে জুন তারিখেই আমার বক্তৃতার দিন ঠিক কোরো। বিষয় Realisation Brahma। কি জানি যদি যেতে দেরি হয় এই জন্যে এর আগের কোনো তারিখ স্থির করতে সাহস হচ্চে না।

পত্র : ২৮

ওঁ

508 W, High Street
Urbana Ill
15th March 1913
[২ চৈত্র, ১৩১৯]

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে আনন্দিত হলুম। আমরা এখান থেকে যাত্রার আয়োজন করছি। খুব সম্ভব আগামী ১৭ই এপ্রিল নিয়ুইয়র্ক থেকে ছাড়ব—তাহলে এপ্রিলের শেষাশেষি তোমাদের ওখানে গিয়ে পৌঁছব। ইতিমধ্যে এখানে কিছু কিছু বক্তৃতা দেবার আছে—সেইগুলো তাড়াতাড়ি লিখে ফেলতে হবে। ভারতবর্ষের ideal সম্বন্ধে আমার ছটা প্রবন্ধ লেখা হয়েছে Quest Society কিম্বা কোথাও এগুলো Serially পড়তে ইচ্ছা করি। এর মধ্যে একটা আলাদা করে পড়লে তেমন জমবে না। বোধ হয় এ ব্যবস্থা করা শক্ত হবে না। Ezra Pound কোথায় এই রকম বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পার সেইরকম বন্দোবস্ত করতে পারবেন কি না।

শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে দেশে আমাদের বিস্তর করবার আছে সেজন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। বিদ্যালয় কিম্বা শিক্ষাপ্রণালী উদ্ভাবন করে অল্পই ফল হবে। গোড়া থেকে শিক্ষক তৈরি করে তোলা চাই। আমাদের বিদ্যালয়ে এই কাজের ভার আমাদের নিতে হবে। তোমরা তৈরি হয়ে গেলে এটা সম্ভবপর হতে পারবে। কিন্তু এজন্যে তোমাদের খানিকটা drawing এবং modelling শেখা দরকার হবে। সেটা তোমার পক্ষে হয় তা সুসাধ্য না হতে পারে কিন্তু দেবলের পক্ষে কঠিন হবে না। এ সম্বন্ধে তোমরা আলোচনা করে দেখো। ওদেশের ভাল ভাল সাহিত্যিকদের সঙ্গে তোমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে আসছে এতে আমি ভারি আনন্দ বোধ করছি। আমাদের ছাত্ররা এই সমস্ত সুযোগ সম্ভোগ করতে পায় না বলে তাদের জীবন তৈরি হয়ে ওঠে না। তোমাদের সঙ্গে পুনরায় শীঘ্র দেখা হতে পারবে বলে আমার মন বড় আনন্দ বোধ করচে। অনেক কথা আলোচনা করবার আছে।

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ২৯

2970 Groveland Ave
Chicago

কল্যাণীয়েষু

এখান থেকে আমাদের যাত্রার সময় নিকটবর্তী হয়ে এল। আগামী ১২ই এপ্রিল তারিখে আমরা নিউইয়র্ক থেকে রওনা হব। সেদিন অনেকগুলো জাহাজ ছাড়বে তার মধ্যে কোনটাতে যে আমরা যাব এখনো ঠিক হয় নি—হয়ত White Star line এর

Olympic জাহাজে ছাড়ব। যাই হোক তোমাদের সঙ্গে দেখা হতে আর দেরি নেই এই মনে করে খুব আনন্দ বোধ করছি। Quest এর সম্পাদক Mead সাহেবের একটা চিঠি পেয়েছি। আমি তাঁদের সভায় বক্তৃতা দেব এই সংবাদে তিনি খুশি হয়েছেন। আমার ছটা বক্তৃতা লেখা হয়েছে সেগুলোর পরস্পর যোগ আছে—আমার ইচ্ছা, সেই যোগ রক্ষা করে আমি সেগুলো পরে পরে পড়ি—তাহলেই ঠিকমত কাজ হবে। দেখা যাক সেখানে গিয়ে একটা ঠিক করা যাবে। আমার বক্তৃতার পালা এখনো শেষ হয়নি। কাল Wisconsin University তে বলতে যাব। তার পরে বিদায়ের পূর্বে হার্ভাডে আমার শেষ বক্তৃতা করে বিদায় গ্রহণ করব। Race Confict সম্বন্ধে আমার লেখাটা আমি পূবেই Modem Review তে পাঠিয়েছি—হয়ত এপ্রিল সংখ্যায় বেরবে। যদি এপ্রিলেই সেটা Hibbert Journal এ বেরয় তাহলে বোধহয় তাতে কারো কোনো আপত্তির কারণ হবে না—কিন্তু মডার্ন রিভিয়ুতে বের হবার পরে নিশ্চয়-ই হিবার্ট জর্নালে ওটা বের করা তাঁরা পছন্দ করবেন না। আমি হিবার্ট জর্নালে The Problem of Evil বলে একটা প্রবন্ধ পাঠিয়াছি—এই প্রবন্ধটি এখানকার সকলেরই খুব বিশেষভাবে ভাল লেগেছে। সম্প্রতি The Problem of Self বলে একটা লিখেছি এটা Harvard University পড়তে হবে। সেখানে যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলুম তখন শ্রোতাদের মধ্যে একজন আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন তোমরা ত Self এর বিলোপ সাধনকেই মুক্তি বল—সে সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য কি জানতে চাই। আমি প্রতিশ্রুত হয়েছিলুম যে এ সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধ তাঁদের শুনিয়ে তবে আমি এদেশ থেকে বিদায় গ্রহণ করব। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে। আমার ইচ্ছা আছে সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমার মত প্রকাশ করে এই Seriesটা শেষ করব। এই বক্তৃতাগুলো আমেরিকাতেই ছাপাবার ব্যবস্থা করে যাব। কিন্তু এগুলো ইংলণ্ডে আমার পড়বার ইচ্ছা আছে। দেখা হলে সকল বিষয়ে আলোচনা হতে পারবে। ইতি ৩০শে মার্চ [১৯১৩] [১৭ চৈত্র ১৩১৯]

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ৩০

Ramgarh
Kumaon Hills

কল্যাণীয়েষু

ঘরে তোমার বিপদের দিন উপস্থিত হয়েছে শুনে উদ্বিগ্ন হলুম। কিন্তু তোমার মনে শক্তি আছে—সকল প্রকার আঘাতে তোমার সেই শক্তিই আরো প্রবলরূপে উদ্বোধিত হবে তাতে সন্দেহ নেই। তোমার জীবনকে ঈশ্বর গৃহসংসারের মধ্যে আবদ্ধ হতে দেন নি—তিনি তোমাকে তাঁর বিশ্বলোকে আহ্বান করেছেন সেই জন্যই তিনি ক্ষণে ক্ষণে তোমার বন্ধনে টান দেবেন তাতে তুমি কিছুমাত্র ভয় কোরো না—জয়ধ্বনি করে তোমার যাত্রাপথে অগ্রসর হতে থাক। সংসারের সুখ সুবিধার আশ্রয় তোমাকে কখনই তোমার

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জওয়াহরলাল
পেছনে মাঝখানে কালীমোহন, ডানদিকে অনিলকুমার চন্দ।

প্রভু আঁকড়ে রাখতে দেবেন না কিন্তু তোমাকে কল্যাণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে এমন কোনো শক্তি কোথাও নেই। তোমার পায়ের তলায় যদি একদিন সূচ্যগ্র ভূমিও না থাকে এমন হয় তবু দেখবে ঈশ্বরের বাহু তোমাকে ধারণ করে রয়েছে। কেননা, দেখতে পাচ্ছ না কি, সংসারী ত সংসারে ঢের আছে—তারা নিজের ধান্দায় ঘুরে মরচে, কেউ সুখে আছে কেউ দুঃখে আছে কিন্তু সংসারের বাইরে তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু তোমাকে যে সেই বাইরের পথে অনেকদিন থেকেই দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে—তুমি যে আহ্বান শুনেছ—অতএব তুমি নির্ভীক হও—সমস্ত উদ্বেগ দূর করে দাও—ঈশ্বর বেছে বেছে তোমাকে যে গভীর সম্মান দিয়েছেন সেই সম্মানের উপযুক্ত হও। দুঃখদাতাকে প্রণাম কর এবং অভয়দাতার দক্ষিণ-হস্ত ধারণ কর। ইতি ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ৩১

ওঁ

শিলাইদা

কল্যাণীয়েষু

আমি সম্প্রতি পল্লীর কাজে মন দিয়াছি। এতদিন পরে এ কাজটি অগ্রসর হইবার পথে দাঁড়াইল বলিয়া আশা হইতেছে। একদিকে পতিসরের প্রজা ও জমিদারে মিলিয়া বৎসরে এগারো হাজার টাকা এই হিতৈষীফণ্ডের আয় করিয়া তুলিয়াছে অন্যদিকে আপনিই উদ্যোগী ও সাধক লোক জুটিয়া যাইতেছে। এখানকার এই সৃষ্টিকার্যে আমার মনটাকে অত্যন্ত টানিতেছে—কেননা আমাদের দেশের সমস্ত সমস্যা একত্রে আছে—হিন্দু মুসলমান নমঃশূদ্র ওখানকার অধিবাসী, শিক্ষা নাই, কৃষি ছাড়া ব্যবসায় নাই, সে কৃষিও কেবল ধানের, সামাজিক অবস্থা শোচনীয়, চিকিৎসার ব্যবস্থা ভালমত নাই, পথঘাট দুর্গম, সকলেই মহাজনের কাছে ঋণী—সকল দিক দিয়া ইহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। দেশের সম্বন্ধে আমদের সত্যকার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করি নাই—এই সকল কাজের দ্বারা সেই দায়িত্ব গ্রহণের দৃষ্টান্ত দেখানো হয়—আমাদের চেষ্টা সফল হইবে কি না জানি না কিন্তু আমাদের চেষ্টাই মূল্যবান। আমরা পনেরো বৎসর শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করিয়াছি—এখানে যদি দশ বৎসর আমরা নিরন্তর কাজ করিতে পারি তবে আমাদের এই চেষ্টার উদ্যম সমস্ত দেশে সঞ্চারিত হইতে পারিবে। এখানকার কাজের একটা পত্তন করিয়া দিয়াই আমি শান্তিনিকেতনে চলিয়া যাইব। পতিসরের কার্যপ্রণালী আলোচনা করিবার জন্য ক্ষিতিমোহনবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র অতুল, এবং বিশুর বন্ধু উপেন ভদ্র এখনো আসিয়াছে—আজ সন্ধ্যায় আমার শ্যালক নগেন্দ্রও আসিবে। ওখানে একটা ধানের কল বসাইবার উদ্যোগ হইতেছে সেটার জন্যও নানাপ্রকার ব্যবস্থা করার দরকার হইবে।

আত্মনিবেদনের পরিপূর্ণ আনন্দে তোমার চিত্তের সমস্ত অবসাদ ঘুচিয়া যাক এই আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি। ইতি ৩০ কার্তিক ১৩২২

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ৩২

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

গোরা যদি কিছুকাল আমাদের আশ্রমে অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকে তাহলে আমি খুবই খুসি হব একথা বলা বাহুল্য। তাকে আমার নাম করে লিখে দিয়ো। আমি কাল অর্থাৎ শুক্রবারে কলকাতায় রওনা হচ্ছি। হয়ত বা সোমবারে তোমাদের ওখানে আমার আবির্ভাব হতেও পারে। কলকাতায় গেলে দিনক্ষণ নিশ্চিত স্থির করে জানাব। ইতি বৃহস্পতিবার [১৩২৪]

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কালীমোহন—আজ বিজয়াদশমী। তোমাদের সকলকে আমার অন্তরের আশীর্বাদ পাঠাচ্ছি। এই মাসের শেষে দেখা হবে আশা রইল। অনেক কথা বলবার আছে। ইতি ১৩৩৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ৩৪

ওঁ

বর্লিন

কল্যাণীয়েষু

কালীমোহন, এবারে য়ুরোপে নানা দেশে ভ্রমণ করেচি। এদের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করে মন হতাশ হয়। তুমি জান, কতকাল থেকে আমি বলে আসছি আমাদের লক্ষ্মীছাড়া গ্রামগুলোকে দারিদ্র্য থেকে বাঁচাবার একটিমাত্র উপায় সমবায় প্রণালীতে ধন উৎপাদন ও ধন বিভাগ। এখানে তার কর্মপদ্ধতি ও সফলতা থেকে এটা স্পষ্ট বুঝতে পেরেচি এসব জিনিষ বই-পড়া বিদ্যের দ্বারা হয় না। সবচেয়ে দরকার মানুষের—যাদের

উদার কল্পনা, হৃদয় প্রশস্ত, উদ্যম অক্লান্ত এবং চিন্তাশক্তি প্রবল ও গভীর। এখানে যারা এই নিয়ে আত্মনিবেদন করেচে তারা ডেস্কে বসে কেরানীগিরি করে না, বেণের মতো টিপে টিপে টাকা ধার দেওয়ার আর খাজাঞ্চির মতো হিসেব রাখা তাদের কাজ নয়—তারা মনস্বী, তারা তপস্বী, তারা ত্যাগী—তারা দুর্গম পথে প্রবৃত্ত হয়ে অসাধ্য সাধন করেচে। নিজের চোখে দেখে এলুম। আর এতদিন ধরে তোমরা কী করেচ? লীগ অফ নেশনসে যিনি এই সমবায় ব্যাপারের সর্বোচ্চ অধ্যক্ষ তিনি সমবায় সম্বন্ধে আমার লেখা পড়ে গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেচেন—কোথা থেকে সেসব লেখা পেলেন জানিনে। কিন্তু ওঁদের শ্রদ্ধা দেখে মাথা হেঁট হয়ে যায়। এঁরা মনে করেন আমার ওখানে সমবায় প্রণালী বুঝি খুবই প্রাণবান এবং ফলবান। কিন্তু আমি তোমাদের কোনোদিনই জাগাতে পারলুম না। দেশে সরকার বাহাদুরের বাহাদুরীতে যে ক'টা অত্যন্ত টিমটিমে সমবায়ের বাতি জ্বলেছে তোমরা তারি মধ্যে একটা জ্বালিয়েচ, সেটাও যে উজ্জ্বলতম তা নয়। কিছুই তোমরা ফলিয়ে তুলতে পারোনি— তার একমাত্র কারণ বুদ্ধির হৃদয়ের এবং উদ্যমের সুবিপুল জড়তা। শেষকালে কি এদের এখান থেকেই লোক নিয়ে যেতে হবে? দেশের লোক দিয়ে দেশের কাজ করা যদি অসাধ্য হয় তবে এমন দেশকে বাঁচিয়ে রেখেই বা লাভ কি? এখানে এসে অবধি জিজ্ঞাসুর দল আমাকে ঘিরে বসে প্রশ্ন করেচে। শুধু ছাত্রদল নয়, ভাবুক, কর্মী ও অধ্যাপকবৃন্দ। আমার যা কিছু বলবার কথা সব বলেচি—উৎসাহের সঙ্গে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেচে। জানি কথাগুলো কাজে ফলবে। মনে মনে ভাবি এখানেই হয় তো আমার কাজের ক্ষেত্র। মরুভূমিতে বীজ ছড়িয়ে ছড়িয়ে আমার মন ক্লান্ত হয়ে গেছে, দিতে গিয়ে নিজেকেই সর্ব্বস্বান্ত- করেচি, তোমরা কিছু পাওনি। সুদীর্ঘকাল থেকে সমবায় নীতির পরেই আমার সকলের চেয়ে আশা ছিল—কিন্তু সকলের চেয়ে এইটেই ব্যর্থ হয়েচে। এই কথাটা খুব করেই বুঝেচি যে, চিত্তের দৈন্য না ঘুচলে অন্নের দৈন্যও ঘোচে না—হৃদয় যেখানে অনুর্বর স্বয়ং অন্নপূর্ণাও সেখানে ফল দিতে পারেন না। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। ডেস্কে বসে আপিসের বড়োবাবুগিরি কোরো না—সমস্ত মন দিয়ে ভাবতে ও সমস্ত হৃদয় দিয়ে কাজ করতে শেখো—দুঃখীদের মধ্যে গিয়ে বোসো, তাদের বোঝো তাদের বোঝাও, তাদের করুণা করো, বাধাবিপত্তিগুলোকে পদে পদে প্রাণ দিয়ে অতিক্রম করো পুঁথির বুলি দিয়ে নয়। ইস্কুলের ছাত্রের চেয়ে আর আপিসের কেরানীর চেয়ে বড়ো হয়ে উঠতে যদি পারো তবে দেশকে বাঁচাতে পারবে নইলে মহতী বিনষ্টিঃ। ইতি ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ [১৮ ভাদ্র, ১৩৩৭]

শুভার্থী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ৩৫

ওঁ

NORDDEUTSCHER LLOYD BREMEN | D BREMEN

কল্যাণীয়েষু

কালীমোহন, সোভিয়েট রাশিয়ায় জনসাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্যে কত বিবিধ রকমের উপায় অবলম্বন করা হয়েছে তার কিছু কিছু আভাস সুরেনের চিঠি থেকে পেয়ে থাকবে। আজ তোমাকে তারি মধ্যে একটা উদ্যোগের সংক্ষেপ বিবরণ লিখে পাঠাচ্ছি।

কিছুদিন হল মস্কৌ শহরে সাধারণের জন্যে একটি আরামবাগ খোলা হয়েছে। বুলেটিনে তার নাম দিয়েছে Moscow park of education and recreation। তার মধ্যে প্রধান মণ্ডপটি প্রদর্শনীর জন্যে। সেখানে ইচ্ছা করলে খবর পাওয়া যায় সমস্ত প্রদেশে কারখানার শত সহস্র শ্রমিকদের জন্য কত ডিস্পেন্সারি খোলা হয়েছে, মস্কৌ প্রদেশে স্কুলের সংখ্যা কত বাড়ল, ম্যুনিসিপ্যাল বিভাগে দেখিয়েছে কত নতুন বাসাবাড়ি তৈরি হল, কত নতুন বাগান, শহরের কত বিষয়ে কত রকমের উন্নতি হয়েছে। নানারকমের মডেল আছে, পুরানো পাড়াগাঁ এবং আধুনিক পাড়াগাঁ, ফুল ও সবজি উৎপাদনের আদর্শ ক্ষেত সোভিয়েত আমলে সোভিয়েত কারখানায় যে সব যন্ত্র তৈরি হচ্ছে তার নমুনা, হাল আমলের কো-অপরেটিভ ব্যবস্থায় কি রুটি তৈরি হচ্ছে আর ওদের বিপ্লবের সময়েতেই বা কি রকম হোত। তাছাড়া নানা তামাসা নানা খেলার জায়গা একটা নিত্য মেলার মতো আর কি। পার্কের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র জায়গা কেবল ছোট ছেলেদের জন্যে, সেখানে বয়স্ক লোকদের প্রবেশ নিষেধ, সেখানকার প্রবেশদ্বারে লেখা আছে ছেলেদের উৎপাত কোরো না। এইখানে ছেলেদের যতরকম খেলনা, খেলা, ছেলেদের থিয়েটার, সে থিয়েটারে ছেলেরাই চালক, ছেলেরাই অভিনেতা। এই ছেলেদের বিভাগ থেকে কিছু দূরে আছে Creche, বাংলায় তার নাম দেওয়া যেতে পারে শিশুরক্ষণী। মা বাপ যখন পার্কে ঘুরে বেড়াতে প্রবৃত্ত তখন এই জায়গায় ধাত্রীদের জিম্মায় ছোট শিশুদের রেখে যেতে পারে। একটা দোতলা মণ্ডপ (Pavilion) আছে ক্লাবের জন্যে। উপরের তলায় লাইব্রেরি। কোথাও বা সতরঞ্চি খেলার ঘর আছে, কোথাও আছে মানচিত্র আর আছে দেয়ালে ঝোলানো খবরের কাগজ। তাছাড়া সাধারণের জন্যে আহারের বেশ ভালো কো-অপরেটিভ দোকান আছে, সেখানে মদ বিক্রি বন্ধ। মস্কৌ পশুশালা বিভাগ থেকে এখানে একটা দোকান খুলেচে, এই দোকানের নানারকম পাখী মাছ চারাগাছ কিনতে পাওয়া যায়।প্রাদেশিক সহরগুলিতেও এই রকমের পার্ক খোলবার প্রস্তাব আছে।

যেটা ভেবে দেখবার বিষয় সেটা হচ্ছে এই যে জনসাধারণকে এরা ভদ্রসাধারণের উচ্ছিষ্টে মানুষ করতে চায় না। শিক্ষা, আরাম, জীবনযাত্রার সুযোগ সমস্তই এদের যোলো আনা পরিমাণে। তার প্রধান কারণ জনসাধারণ ছাড়া এখানে আর কিছুই নেই। এরা সমাজ গ্রন্থের পরিশিষ্ট অধ্যায় নয়—সকল অধ্যায়েই এরা আছে।

আর একটা দৃষ্টান্ত তোমাকে দিই। মস্কৌ শহর থেকে কিছুদূরে সাবেক কালের একটি প্রাসাদ আছে। রাশিয়ার প্রাচীন অভিজাত বংশীয় কাউণ্ট আপ্রাকসিনদের সেই ছিল বাসভবন। পাহাড়ের উপর থেকে চারিদিকের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখতে—শস্যক্ষেত্র, নদী এবং পার্বত্য অরণ্য। দুটি আছে সরোবর আর অনেকগুলি উৎস। থামওয়ালা বড় বড় প্রকোষ্ঠ, উঁচু বারাদা, প্রাচীনকালের আসবাব ছবি ও পাথরের মূর্তি দিয়ে সাজানো দরবার গৃহ, এছাড়া আছে সঙ্গীতশালা, খেলার ঘর, লাইব্রেরি, নাট্যশালা, এছাড়া অনেকগুলি সুন্দর বহির্ভবন বাড়িটিকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে আছে। এই বৃহৎ প্রাসাদে অল্‌গভো নাম দিয়ে একটি কো-অপরেটিভ স্বাস্থ্যাগার স্থাপন করা হয়েছে—এমন সমস্ত লোকদের জন্য যারা একদা এই প্রাসাদে দাসশ্রেণীতে গণ্য হত। সোভিয়েত রাষ্ট্রসঙ্ঘে একটি কো-অপরেটিভ সোসাইটি আছে, শ্রমিকদের জন্য বাসা নির্মাণ যার প্রধান কর্তব্য ; সেই সোসাইটির নাম বিশ্রান্তিনিকেতন— The Home of Rest। এই অল্‌গভো তারই তত্ত্বাধীনে। এমনতরো আরো চারটে সানাটোরিয়ম এর হাতে আছে। খাটুনির ঋতুকাল শেষ হয়ে গেলে অন্তত ত্রিশ হাজার শ্রমক্লান্ত এই পাঁচটি আরোগ্যশালায় এসে বিশ্রাম করতে পারবে। প্রত্যেক লোক একপক্ষ কাল এখানে থাকতে পারে। আহারের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত, আরামের ব্যবস্থা যথেষ্ট, ডাক্তারের ব্যবস্থাও আছে। কোঅপরেটিভ প্রণালীতে এইরকম বিশ্রান্তিনিকেতন স্থাপনের ক্রমশই সাধারণের সম্মতি লাভ করছে।

আর কিছু নয়, শ্রমিকদের বিশ্রামের প্রয়োজন এমনভাবে আর কোথাও চিন্তাও করেনি, আমাদের দেশের অবস্থাপন্ন লোকের পক্ষেও এরকম সুযোগ দুর্লভ।

শ্রমিকদের জন্যে এদের ব্যবস্থা কি রকম সে তো শুনলে, এখন শিশুদের সম্বন্ধে এদের বিধান কি রকম সে কথা বলি। শিশু জারজ কিম্বা বিবাহিত দম্পতির সন্তান সে সম্বন্ধে কোনো পার্থক্য এরা গণ্যই করো না। আইন এই যে শিশু যে পর্যন্ত না আঠারো বছর বয়সে সাবালক হয় সে পর্যন্ত তাদের পালনের ভার বাপমায়ের। বাড়িতে তাদের কিভাবে পালন করা বা শিক্ষা দেওয়া হয় স্টেট সে সম্বন্ধে উদাসীন নয়। ষোল বছর বয়সের পূর্বে সন্তানকে কোথাও খাটুনির কাজে নিযুক্ত করতে পারবে না। আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত তাদের কাজের সময় পরিমাণ ছয় ঘণ্টা। ছেলেদের প্রতি পিতামাতা আপন কর্তব্য করছে কিনা তার তদারকের ভার অভিভাবক বিভাগের পরে। এই বিভাগের কর্মচারী মাঝে মাঝে পরিদর্শন করতে আসে, দেখে ছেলেদের স্বাস্থ্য আছে, পড়াশুনো কিরকম চলছে। যদি দেখা যায় ছেলেদের প্রতি অযত্ন হচ্চে তাহলে বাপমায়ের হাত থেকে ছেলেদের ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু তবু ছেলেদের ভরণপোষণের দায়িত্ব থাকে বাপমায়েরই। এইরকম ছেলেমেয়েদের মানুষ করবার ভার পড়ে সরকারি অভিভাবক বিভাগের।

ভাবখানা এই, সন্তানেরা কেবল তো বাপমায়ের নয়, মুখ্যত সমস্ত সমাজের। তাদের ভালোমন্দ নিয়ে সমস্ত সমাজের ভালোমন্দ। এরা যাতে মানুষ হয়ে ওঠে তার দায়িত্ব সমাজের, কেননা তার ফল সমাজেরই। ভেবে দেখতে গেলে পরিবারের দায়িত্বের চেয়ে সমাজের দায়িত্ব বেশি বই কম নয়। জনসাধারণ সম্বন্ধেও এদের মনের ভাব ঐরকমেরই। এদের মতে জনসাধারণের অস্তিত্ব প্রধানত বিশিষ্ট সাধারণেরই সুযোগ সুবিধার জন্যে

নয়। তারা সমগ্র সমাজের অঙ্গ, সমাজের কোনো বিশেষ অঙ্গের প্রত্যঙ্গ নয়। অতএব তাদের জন্য দায়িত্ব সমস্ত স্টেটের। ব্যক্তিগত ভাবে নিজের ভোগের বা প্রতাপের জন্য কেউ সমগ্র সমাজকে ডিঙিয়ে যেতে গেলে চলবে না। যাই হোক, মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিকমতো ধরতে পেরেচে তা আমার বোধ হয় না। সে হিসাবে এরা ফাসিস্টদেরই মতো। এই কারণে সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টির প্রতিপীড়নে এরা কোনো বাধাই মানতে চায় না। ভুলে যায় ব্যক্তিকে দুর্বল করে সমষ্টিকে সবল করা যায় না, ব্যষ্টি যদি শৃঙ্খলিত হয় তবে সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না। এখানে জবরদস্ত লোকের একনায়কত্ব চলচে। এইরকম একের হাতে দশের চালনা দৈবাৎ কিছুদিনের মতো ভালো ফল দিতেও পারে কিন্তু কখনই চিরদিন পারে না। উপযুক্ত মতো নায়ক পরস্পরাক্রমে পাওয়া কখনই সম্ভব নয়। তাছাড়া অবাধ ক্ষমতার লোভ মানুষের বুদ্ধিবিকার ঘটায়। একটা সুবিধার কথা এই যে যদিও সোভিয়েট মূলনীতি সম্বন্ধে এরা মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অতি নির্দয়ভাবে পীড়ন করতে কুণ্ঠিত হয়নি তথাপি সাধারণভাবে শিক্ষার দ্বারা চর্চার দ্বারা ব্যক্তির আত্মনিহিত শক্তিতে বাড়িয়েই চলেচে—ফাসিস্টদের মতো নিয়তই তাকে পেষণ করেনি। শিক্ষাকে আপন বিশেষ মতের একান্ত অনুবর্তী করে কতকটা গায়ের জোরে কতকটা মহামন্ত্রের জোরে একঝোঁকা করে তুলেচে তবুও সাধারণের বুদ্ধির চর্চা বন্ধ করেনি। যদিও সোভিয়েত নীতি প্রচার সম্বন্ধে এরা যুক্তির জোরের উপরেও বাহুবলকে খাড়া করে রেখেচে তবুও যুক্তিকে একেবারে ছাড়েনি এবং ধর্মমূঢ়তা এবং সমাজপ্রথার অন্ধতা থেকে সাধারণের মনকে মুক্ত রাখবার জন্যে প্রবল চেষ্টা করেছে। মনকে একদিকে স্বাধীন করে অন্যদিকে জুলুমের বশ করা সহজ নয়। ভয়ের প্রভাব কিছুদিন কাজ করবে কিন্তু সেই.ভীরুতাকে ধিক্কার দিয়ে শিক্ষিত মন একদিন আপন চিন্তাস্বাতন্ত্র্যের অধিকার জোরের সঙ্গে দাবি করবেই। মানুষকে এরা দেহের দিকে নিপীড়িত করেছে মনের দিকে নয়—সাহস বেড়েছে কিন্তু চিন্তনশক্তি বাড়েনি। যারা যথার্থই দৌরাত্ম্য করতে চায় তারা মানুষের মনকে মারে আগে—এরা মনের জীবনীশক্তি বাড়িয়ে তুলছে। এইখানেই পরিত্রাণের রাস্তা রয়ে গেল।

আজ আর ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে পৌঁছব নিয়ুইয়র্কে। তার পরে আবার নতুন পালা। এরকম করে সাত ঘাটের জল খেয়ে বেড়াতে আর ভালো লাগে না। এবারে এ অঞ্চলে না আসবার ইচ্ছায় মনে অনেক তর্ক উঠেছিল কিন্তু লোভই শেষকালে জয়ী হোলো। ইতি ৯ অক্টো ১৯৩০ [২২ আশ্বিন, ১৩৩৭]

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ৩৬

কল্যাণীয়েষু

তুমি কাজে ইস্তফা দিয়েচ এ হতেই পারে না। তোমাকে কোনোমতেই ছুটি দিতে পারব না। তুমি গেলেই চলবে না। কার সঙ্গে তোমার কী অনৈক্য হয়েছে তা নিয়ে

তুমি মন খারাপ করে এত বড়ো কাজ মাটি কোরো না। যারা তোমার মূল্য বোঝে না তাদের উপর আমি শ্রদ্ধা করতে পারিনে। যাই হোক দশজনে একসঙ্গে কাজ করতে হলে এরকম মনান্তর মতান্তর হয়েই থাকে, তা নিয়ে তুমি ক্ষুব্ধ হোয়ো না—জেনো তোমার উপর আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর আছে। তোমার কর্মত্যাগপত্র আমরা কিছুতে স্বীকার করব না। ইতি ২ মে ১৯৩৩ [১৯ বৈশাখ, ১৩৪০]

শুভানুধ্যায়ী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ৩৭

ওঁ

মংপু

কল্যাণীয়েষু

বিজয়ার আশীর্বাদ ইতি ২৫/১০/৩৯ ৮ কার্তিক ১৩৪৬

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ৩৮

ওঁ

জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়েষু

পত্রে তোমার কার্যবিবরণ পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমি আজকাল ব্যস্ত আছি। বর্তমান উৎপাত সম্বন্ধে আমার মত বিস্তারিত করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সভায় পাঠ করিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু কেহ সভা আহ্বান করিতে সাহস করিতেছে না পাছে এখনকার অসহিষ্ণু যুবকের দল মতের অনৈক্যে উন্মত্ত হইয়া কোনোপ্রকার উপদ্রব করিয়া বসে। দেশের লোকের এতদূর পর্যন্ত স্থিরচিত্ত ও শুভবুদ্ধির অভাব—এতটা অসহিষ্ণুতা আমাদের অকল্যাণের একটা বড় লক্ষণ। ধর্মবোধ একবার যে কোনো কারণেই বিকৃত হইয়া গেলে মানুষ আর আত্মসম্বরণ করিতে পারে না—তখন তাহাকে লইয়া ব্যবহার করা একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠে। অনেক দুঃখ অনেক আঘাত পাইয়া তবে ইহার প্রতিকার হইতে পারিবে। এই প্রকার উদ্দাম প্রমত্ততার মধ্যে চিত্তকে ধর্মবিশ্বাসে অবিচলিত রাখিয়া ধৈর্য ধরিয়া আপনার কাজ করিয়া যাইবে এই আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি। দেশব্যাপী উত্তেজনার স্রোতে আত্মবিস্মৃত হইয়া ভাসিয়া যাইয়ো না—সমস্ত ক্ষোভ ও বিক্ষেপের মধ্যে সর্বোচ্চ সত্যকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন কর্তব্য সাধন করিবে—আশু প্রয়োজন সিদ্ধির প্রলোভনে কোনোমতেই ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইবে না—মনে রাখিয়ো ধর্ম দেশের অপেক্ষা বড়—সকল প্রয়োজনের অপেক্ষা মহৎ। ****

[এই অংশটি ছেঁড়া] উন্নতিলাভের জন্য ব্যাকুলতা জানাইয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। আজ সে পত্রের উত্তর দিলাম। যদি তাঁহার শ্বশুর মহাশয় বোলপুর আশ্রমে তাঁহাকে রাখিতে সম্মত থাকেন তবে সেখানে তাঁহার অধ্যয়ন অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিব। যদিও পূর্বের ন্যায় নিয়ত আমি বোলপুরে থাকিতে পারিব না তথাপি প্রায় মাঝে মাঝে সেখানে আমাকে যাপন করিতেই হইবে। কলিকাতার গোলমালে তাঁহার কোনো উপকার হইবার আশা নাই—এখানে আমি অবকাশপত্র পাই না **** [এই অংশটি ছেঁড়া]

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ৩৯

ওঁ

কল্যাণায়েষু

তোমাদের কাজকর্মের খবর পেয়ে খুসি হলুম। আমি একটু ফাঁক পেলেই যাব। অত্যন্ত জড়িয়ে পড়েছি—এখানে আর দুই একটি লোকের জোগাড় করতে পারলেই ছুটি পাব। আমাকে ক্লাস পড়াতে হচ্চে।

নতুন উৎসাহে তোমরা কাজে লেগে যাও—আমিও সময় হলেই গিয়ে বসে পড়ব। গোড়ায় সৃষ্টিকার্যটা সম্পূর্ণ তোমাদের নিজের হাতে হলেই ভাল হয়। আমি এখন এর মধ্যে থাক্‌লে ঘুরে ফিরে আমারই আইডিয়া তোমাদের উপর চাপ দেবে। তাতে তোমাদের স্বাধীন উদ্যম বাধা পায় এবং এরকম কাজ স্থায়ী হয় না। তোমরা ভাবতে থাক এবং গড়তে থাক।

কালিগ্রামের সেই কাজটির জন্য আমি পতিসরে লিখে দিচ্চি। দেখি এখনো সে কাজটার ফাঁক আছে কিনা।

তোমাদের ডাক্তার এতদিনে পৌঁছে গেছে। মানুষটি কি রকম হবে, না ব্যবহার করলে বোঝা যাবে না। নিজের ব্যবসায়িক উন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি আছে বলে বোধ হয় সেইজন্যে ভাবনা আছে। আমাদের ওখানে লক্ষ্মীছাড়া ক্ষ্যাপা লোকের প্রয়োজন—কিন্তু জগতে অধিকাংশ লোকই সুবুদ্ধি—কি করা যাবে বল।

বিদ্যালয় নিয়ে পড়েছি—তিন ঘণ্টা ক্লাস করতে হয়—এর উপর সবুজপত্র। পালাব ভেবে বেরিয়েছিলেম, ভগবান আরো বেশি করে জড়িয়ে ফেলবার উদ্যোগ করচেন। সুধাকান্ত আজ ফিরবে।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ৪০

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কাল ৭ই পৌষ গিয়াছে আজ আমার এই নির্জন চরের মধ্যে তোমার চিঠিখানি পাইলাম। তোমরা মনে করিয়ো না আমি বিশ্রাম করিতে আসিয়াছি—কিছুদিনের জন্য নির্জনবাস আমার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আমার নিজের আবরণটাকে বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া আসিবার জন্য এমনি একটা ধাক্কা পাইতেছি যে আমি তোমাদের উৎসব বা আর কিছুতেই যোগ দিতে পারিতেছি না। ঠিক এ যেন নিজের কাছ হইতে নিজে পালাইবার প্রয়াস। আজন্মকালের এই আমার অহং—এ কি আমাকে ছাড়িতে চায়? আমাকে এ যে আপনার সম্পত্তি বলিয়া ঠিক করিয়া বসিয়াছে, ইহার এই বহুকালের অধিকারটাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া, আপনাকে উদ্ধার করিতে হইবে বলিয়া ভারি একটা আন্তরিক বেদনা বোধ করিতেছি। লোকজনের ভিতরে থাকিলে কেবলি সেটা ভুলিয়া যাই—চিরদিনের যে অভ্যস্ত অহং সেই কেবল বাহির হইয়া আসিয়া আমাকে পরিহাস করিতে থাকে এই পরাভব আমি সহ্য করিতে পারি না। বারবার হার মানিতে হইয়াছে কিন্তু তাই বলিয়া সেই হার চিরদিনই স্বীকার করিয়া বসিয়া থাকিতে পারি না। তাই আপনার সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ করিয়া ফেলিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছি। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করিবেন, তোমাদের সাধনা পূর্ণ হইবে—তোমরা সত্য হইয়া উঠ—নিজের সমস্ত অসত্য আবরণ দিনে দিনে ক্ষয় করিয়া সত্য হইয়া অভয় প্রাপ্ত হও। আপনাকে প্রশ্রয় দিয়ো না—তাহার আবদার শুনিয়ো না—যখন তাহাকে মারিতে হইবে খুব শক্ত করিয়াই মারো—তার পরে তোমার বেদনা লইয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াও, সকল বেদনাই পরিপূর্ণরূপে সার্থক হইবে। জয় হউক্ তোমাদের মধ্যে সত্যের জয় হউক, মঙ্গলের জয় হউক্, বাধামুক্ত নির্মল আত্মার জয় হউক। রবিবার

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাল সোমবারে একবার কলিকাতায় যাইব।

পত্র : ৪১

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কালীমোহন, Young সাহেবকে চিঠি পাঠাই। আমি এখন জলে। পদ্মার ঢেউগুলো যেমন পলাতক ছেলেদের মত দৌড় দিচ্ছে আমিও তথৈবচ। তোমাদের "গুরু"র আসনে কাঠের মূর্তি হয়ে বসে থাকা আমার ধাতে সয় না—এই যে আমার পদ্মা আমাকে কিছুমাত্র সম্মান করে না এই ত আমাকে ঠিকমত চিনেছে।

সঞ্জীব এবং নিখিল সম্বন্ধে যথানিয়মে চোলো—তাদের অভিভাবকেরা কিছুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করছে না। প্রমথ আমাকে বলছিল, বিকালে শুধু দুধের পরিবর্তে সব

ছেলেরই জন্যে আরো কিছু পেট-ভরানো জিনিষ দরকার। যদি তাই বোঝে তাহলে ছাতু প্রভৃতি আরো কিছুর ব্যবস্থা করে দিতে পারো।

Oilcloth বোধ হয় অন্নদা নিয়ে যাবে—কিন্তু তার সঙ্গে আমার ও সম্বন্ধে কথা হয়নি।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র : ৪২

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমার চিরদিনের ইচ্ছা তোমরা তোমাদের নিজের প্রাণ দিয়ে চেষ্টা দিয়ে তপস্যা দিয়ে বিদ্যালয়কে তোমাদের নিজের জিনিষ করে নেবে। আমি নিয়ত তোমাদের মধ্যে থাক্‌লে তোমাদের নিজের উদ্যম অলস হয়ে যায়—সকল বিষয়েই আমার পরামর্শ নেবার কথাই তোমাদের মনে হয়। তাতে সমস্ত বিদ্যালয়ের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে প্রাণসঞ্চার হয় না। বরঞ্চ জিনিসটা খুব সুসম্পূর্ণ না হয় সেও ভাল কিন্তু তার আগাগোড়াই তোমাদের নিজের প্রাণে সচেতন হয়ে ওঠে এইটেই আমি চাই—ওর কোনো অংশে কোনো কোণে কল না থাকে। নতুন শিক্ষক যাঁরা যাচ্চেন তাঁদের টেনে নেবার চেষ্টা কর। গোড়ায় যদি বা কোনো বাধা পাও দমে যেয়ো না। জোরের সঙ্গে অপরাহত আশা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে যে সংকল্পে প্রবৃত্ত হবে তার বাধা দিনে দিনে ক্ষয় হবেই। ছাত্রদের সকলকেই তোমাদের দলে টানবার চেষ্টা কোরো—তারও বাধা বিস্তর—কিন্তু বাধাকেই চিরসত্য মনে কোরো না—বাধা না থাক্‌লে তপস্যার মূল্য থাকে না—বাধা না থাক্‌লে তপস্যা ক্রমশই আফিমের ঝিমুনিতে পরিণত হয়। কাজের মধ্যে যেখানে পৌরুষ আবশ্যক সেখানে যেন তোমাদের দৈন্য না ঘটে—অর্থাৎ তুফান দেখলেই যদি দমে যাও তাহলে মাঝিগিরির কোনো মানেই থাকে না। মন যখন অবসন্ন দুর্বল রুগ্ন হয় তখনই বাধামাত্রকেই সে মস্ত করে দেখে—মন সুস্থ-সবল থাকলে বাধা দেখ্‌লেই তার উদ্যম চতুর্গুণ বেড়ে ওঠে। তার পরে তোমাদের একথা মনে রাখ্‌তেই হবে—দরজায় বারম্বার ধাক্কা দিতে দিতে দরজা খোলে—একবার একটু নাড়া দিয়েই দরজার উপর অভিমান করে ফিরে চলে যাওয়া অক্ষমতার চূড়ান্ত পরিচয়। ছাত্রদের সম্বন্ধেই বল বা তোমাদের নিজের সম্বন্ধেই বল—এক অভিপ্রায় মনের মধ্যে সুদৃঢ় রেখে নিয়তই তার ব্যাঘাত গুলো ক্ষয় করবার জন্যে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রত্যহই চেষ্টা জাগিয়ে রাখাই পুরুষোচিত। এই জায়গায় আমাদের দুর্বলতা আছে—সেটা আমাদের জাতিগত। এইখানে তোমাদের প্রাণপণে সতেজ হতে হবে। ভয় কোরো না, দ্বিধা কোরো না, লজ্জা কোরো না—নিজের সংকল্পের উপরে শক্তির উপরে এবং সত্যের উপরে অটল বিশ্বাস রেখো—এবং একথা বারম্বার মনকে জানিয়ে রেখো যে আর কেউ যদি তোমার সঙ্গে যোগ না দেয় তাতে কিছুই আসে যায় না। আজ হোক্ বা বছর পাঁচেক

পরে হোক তুমি জয়ী হবেই। তাড়াতাড়ি ফল পাবার লোভ দুর্বলের লোভ। আমি বারবার তোমাদের বলছি কর্মের মধ্যে পৌরুষকে রক্ষা কোরো—কিছুতেই হার মেনো না এবং বাধার সঙ্গে লড়াই করতে মনে আনন্দ বোধ কোরো—কেননা, ফল পাওয়াটা নয়, সেই লড়াই করাটাই প্রধান জিনিষ—বস্তুত সিদ্ধির চেয়েও সাধনা বড়। লড়াই না করে যা পেয়েছ সে ত ফাঁকি—সে পেয়েও পাও নি। কেননা জিনিসটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে পাওয়া চাই নইলে পাওয়াটা স্বপ্নমাত্র। তাই বাধা সাধনার সর্বপ্রধান সহায়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র-পরিচিতি

কালীমোহন ঘোষকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের মোট ৪২-খানি চিঠি ১৩৯৯ বঙ্গাব্দের 'দেশ'-পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় সংকলিত হয়। এর মধ্যে ৩৪ ও ৩৫ সংখ্যক চিঠি দুখানি আছে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালায়—বাকিগুলি কালীমোহন ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র শান্তিদেবের সংগ্রহে। প্রকাশিত চিঠিগুলির মধ্যে ৩৫-সংখ্যক চিঠিটি 'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থে প্রবন্ধাকারে মুদ্রিত। ৩৬ সংখ্যক চিঠিটিও বিক্ষিপ্তভাবে পূর্ব-প্রকাশিত। আর ২৭ সংখ্যক চিঠিখানি বিগত ২৫ জানুয়ারি, ১৯৯২ কলকাতা—রবীন্দ্রসদনে আয়োজিত কালীমোহন ঘোষ স্মরণ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকায় সংকলিত। বাকি ৩৯ খানি এ-যাবৎ অ-গ্রন্থিত।

উল্লেখ্য, এই পত্রাবলী 'দেশ'-সম্পাদক সাগরময় ঘোষের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়।

পত্র : ১

কলকাতা থেকে লিখিত হলেও রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে প্রধানত শিলাইদহ-বাসী। কিছুকাল আগে ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ তাঁর কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু ঘটে। শোকার্ত রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে আশ্রয় নিয়ে পল্লী পুনর্গঠনের কাজে ব্রতী হন। প্রায় চারমাস তিনি শান্তিনিকেতনে অনুপস্থিত ছিলেন। মাঝে-মধ্যে কলকাতায় এসেছেন সাংসারিক প্রয়োজনে। এই চিঠি লেখার মাসখানেক আগে চৈত্র, ১৩১৪ কালীমোহন ঘোষ রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে তাঁর পল্লীসেবার কাজে যোগ দিয়েছেন।

(ক) **অসুখবিসুখে** : এইসময়ে কলকাতায় জোড়াসাঁকো বাড়িতে হাম-বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়।

(খ) **অক্ষয়** : অক্ষয়কুমার রায় [সেন?] শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মোহিতচন্দ্র সেন-কর্তৃক নিযুক্ত হন। পরে শিলাইদহের পল্লীসংগঠনের কাজে যোগ দেন।

(গ) **মুসলমানকে** : সম্ভবত এর নাম ছিল খয়রাতুল্যা।

(ঘ) মজঃফরপুরে বম্ব : "মজঃফরপুরে ব্যারিস্টার কেনেডীর স্ত্রী ও কন্যা বোমার আঘাতে নিহত হইলেন। (৩০ এপ্রিল ১৯০৮। ১৭ বৈশাখ ১৩১৫) হত্যাকারী দুইজন যুবক—ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্লকুমার চাকী। কিংসফোর্ড নামে কলিকাতার জনৈক ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করিতে গিয়া ভুলক্রমে দুইটি নিরাপরাধ প্রাণ নষ্ট হইল। এই সংবাদ দেশেবিদেশে বিশেষ একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিল। এই ঘটনার একমাসের মধ্যে [৪৮ ঘণ্টার মধ্যে] কলিকাতার অন্তঃপাতী মানিকতলার এক পোড়োবাগানে একটি বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হইল ও সেইসঙ্গে বহু যুবকও ধরা পড়িল। ইহার কয়েকমাস পূর্বে 'বর্তমান রণনীতি' নামে একখানি বই প্রকাশিত হয়, উহার লেখক মানিকতলার মামলার অন্যতম আসামী। এই সকল তথ্য আবিষ্কৃত হইলে দেশের লোক স্তম্ভিত হইয়া গেল। [রবীন্দ্রজীবনী দ্বিতীয় খণ্ড—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়]

এই গুপ্তহত্যা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মতামত বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করেন 'পথ ও পাথেয়'-প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শন'-পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। (রবীন্দ্র-রচনাবলী দশম খণ্ডে 'রাজা ও প্রজা' গ্রন্থে সংকলিত)। ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় চৈতন্য লাইব্রেরীতে প্রবন্ধটি পাঠ করেন। সভাপতিত্ব করেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রবন্ধটিতে বিপ্লবীদের অনুসৃত পন্থা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা ও তাঁদের প্রতি তাঁর মনোভাব দুই-ই সুপরিস্ফুট।

এই প্রবন্ধ পাঠের পর কাগজপত্রে যথেষ্ট সমালোচনা শুরু হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ বুঝেছেন বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার করে বলা দরকার। তাই আবার লিখলেন 'সমস্যা' নামে প্রবন্ধ—যেটিকে 'পথ ও পাথেয়'-এর পরিপূরক বলা যায়। (আষাঢ়, ১৩১৫—প্রবাসী)

তাছাড়া ঐ একই প্রসঙ্গে তাঁর মনোভার জানিয়েছেন নির্ঝরিণী সরকার-কে ৬, ১৫ ও ৩০ মে লিখিত তিনখানি পত্রে। (চিঠিপত্র সপ্তম খণ্ড)।

(ঙ) শচীন্দ্র : শিলাইদহ-জমিদারীর বিখ্যাত ম্যানেজার জানকীনাথ রায়ের পুত্র।

(চ) পাপের অগ্নি : বিপ্লবীদের রুদ্রপন্থা প্রসঙ্গে কবির মন্তব্য।

পত্র : ২

(ক) হোমিওপ্যাথি : অসুস্থ কালীমোহন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগ এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

(খ) ক্ষিতিমোহন : ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৮০—১৯৬০) এই চিঠি লেখার আগের মাসে (আষাঢ় ১৩১৫) ক্ষিতিমোহন শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেন। কালীমোহন ও ক্ষিতিমোহনের বন্ধুত্বের কথা গ্রন্থমধ্যে আলোচিত হয়েছে। ক্ষিতিমোহন কবিরাজী-চিকিৎসা করতেন—কবি সেই কারণে সম্ভবত কালীমোহনকে শান্তিনিকেতনে যাওয়ার কথা বলেছেন।

(গ) **রাধাকান্তবাবুর পুত্রবধূ** : রাধাকান্ত আইচ-এর কন্যা লাবণ্যরেখা— বাল্যবিধবা অবস্থায় শান্তিনিকেতনে আসেন। পরবর্তীকালে অজিতকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

(ঘ) **বেলা** : জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা (১৮৮৬—১৯১৮)

পত্র : ৩

(ক) **ক্ষিতিমোহনবাবু** : শান্তিনিকেতনের কাজে যোগদান-প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন—"বোলপুর স্টেশনে যখন নামি, তখন প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। সে আমার জীবনের একটি স্মরণীয় রাত্রি। আর তার পরের দিনের প্রভাতও কম স্মরণীয় নয়। বোলপুর থেকে পায়ে হেঁটে শান্তিনিকেতনের কাছে এসে শুনি উদাত্ত কণ্ঠের গান—'আপনি জাগাও মোরে'। দেহলী নামে তাঁর গৃহের দ্বিতলে দাঁড়িয়ে কবি গান ধরেছেন। আজও সেই গানের সুর আমার কানে লেগে আছে।"

(খ) **তুমি যে আমাকে** : স্বদেশী আন্দোলনের প্রচারে পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানোর সময় রবীন্দ্র-কাব্যানুরুক্তির সূত্রে কালীমোহনবাবুর সঙ্গে ক্ষিতিমোহনবাবুর অন্তরঙ্গতা হয়। কালীমোহনবাবুই সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর কথা বলেন। অজিতকুমার চক্রবর্তীকে রবীন্দ্রনাথ এ-প্রসঙ্গে লিখছেন :— "এই ছেলেটির [কালীমোহন] কাছ থেকেই ক্ষিতিমোহনবাবুর কথা আমি প্রথম শুনি। তাঁর সাহিত্যানুরাগ ও বিদ্যাবুদ্ধির কথাতেই আমি উৎসাহিত হয়েছি তা নয়, এর মধ্যেও ওই লোকপ্রেমের সংবাদ পেয়েছি, ইনিও ঐ বালকটির সঙ্গে গ্রামে কাজ করে ফিরেছেন—লোকসেবার উৎসাহ তাঁর পক্ষে যেরকম স্বাভাবিক সেইটে জেনেই আমি তাঁকে বোলপুরে আবদ্ধ করতে এত উৎসুক হয়েছি। সুশিক্ষিত সুযোগ্য এম. এ ডিগ্রীধারী বেতন দিলেই পাওয়া যায়, কিন্তু যে জিনিসটা পুঁথিগত নয়, সেটা আমাদের দেশে কত দুর্লভ তা ত জান।"

পত্র : ৪

(ক) **বায়ু পরিবর্তনে যাওয়া** : এই চিঠির অব্যবহিত পরেই বায়ু-পরিবর্তনের জন্য কালীমোহন গিরিডি যান।

(খ) **চৈতন্য যখন** : এই চিঠিতে সন্ত্রাসবাদ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত ব্যক্ত হয়েছে। 'আত্মশক্তি ও সমূহ'-গ্রন্থের 'দেশহিত'-প্রবন্ধের সঙ্গে তুলনীয়।

পত্র : ৫

(ক) **আমি যখন** : স্বাস্থ্য-পুনরুদ্ধারের জন্য ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বরে রবীন্দ্রনাথ কিছুকালের জন্য গিরিডিবাসী হন। স্বদেশী-গান রচনার জন্য এই গিরিডি-বাস তাঁর জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। মাসখানেকের মধ্যে তেইশটি স্বদেশী গান তিনি রচনা করেন।

(খ) **অরবিন্দপ্রকাশবাবু** : ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যাপক অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ।

(গ) **বলিবার চেষ্টা করিয়াছি** : 'পথ ও পাথেয়', 'সমস্যা' এবং 'সদুপায়' (শ্রাবণ, ১৩১৫) প্রবন্ধাবলী দ্রষ্টব্য।

(ঘ) **বঙ্গদর্শনে দেশহিত** : চারসংখ্যক-চিঠির পত্র-পরিচিতি দ্রষ্টব্য।

(ঙ) **পিসিমা** : কবিপত্নী মৃণালিনীদেবীর গ্রাম-সম্পর্কীয়া পিসিমা রাজলক্ষ্মীদেবী। কবিপত্নীর অকালমৃত্যুর পর ইনিই রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন-সংসার দেখাশুনা করতেন।

পত্র : ৬

(ক) **অজিত** : অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৯৮৬—১৯১৮)

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সুখ্যাত শিক্ষক। রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম প্রধান ব্যাখ্যাতা। 'আশ্রম-নির্মাণকার্যে একজন নিপুণ স্থপতি— (রবীন্দ্রনাথ : আশ্রমের রূপ ও বিকাশ)

(খ) **পার্টিশনের অন্ত** : ১৯০৫ সালে ১৬ অক্টোবর বঙ্গচ্ছেদ ঘোষিত হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য।

পত্র : ৭

(ক) **বিদ্যালয়ের কাজের** : এই কর্মব্যস্ততার কথা রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-কেও জানিয়েছেন—"নতুন সেশন আরম্ভ হয়েছে। তাই নিয়ে আমাকে বিশেষ ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। আমাকেও ক্লাশ নিতে হচ্ছে, তাতে ক্লাশের সুবিধা হচ্ছে কিনা বলা কঠিন, কিন্তু আমার সমস্ত অবসর মারা যাচ্ছে। (পত্র ১৩১৫ অগ্রহায়ণ, স্মৃতি-পৃ ৭৫)। এই সময়ে বালিকা বিদ্যালয়-ও স্থাপিত হয়েছে শান্তিনিকেতনে। অবশ্য তার আয়ু ছিল মাত্র দু'বছর। ১৯০৮ অক্টোবর থেকে ১৯১০ সেপ্টেম্বর।

(খ) **ক্রিয়োজোট্** : হোমিওপ্যাথি ওষুধ।

(গ) **প্যারী** : প্যারীমোহন সেনগুপ্ত। কবি। শিলাইদহে পল্লী উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত ছিলেন—শিলাইদহ ও কালীগ্রামের বিভাগীয় ম্যানেজার।

পত্র : ৮

যে ধর্মে : "অনেক সময়ে শরীরের জন্য কালীমোহন গিরিধি প্রভৃতি স্থানেও থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন, তখন ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি তাঁহার গভীর আকর্ষণ হয়। স্বর্গীয় গুরুদাস চক্রবর্তীর কাছে তিনি ব্রাহ্ম সমাজে দীক্ষাও গ্রহণ করেন। পরবর্তী জীবনে মানুষের সেবাই তাঁর প্রধান ধর্ম হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতের প্রাচীন অধ্যাত্ম আদর্শের প্রতি তাঁহার পরিচয় ও শ্রদ্ধা দিন দিন গভীর হইতেছিল।"

('কালীমোহন স্মৃতি'—ক্ষিতিমোহন সেন। প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৭। পৃ ৩৬৮-৭০) 'জীবনের ধ্রুবতারা'—শান্তিদেব ঘোষ। দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ৩৫।

পত্র : ১০

(ক) **কলিকাতায় আসিয়া** : "ভাদ্র মাসের গোড়াতেই (৪ ভাদ্র ১৩১৬) কবি শিলাইদহের নির্জনবাস হইতে 'কলিকাতায় অহোরাত্র লোকজনের ভিড়ে'র মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। সেখান হইতে 'পালাইতে পারিলে' বাঁচেন। আসিলেই পাঁচরকম পাবলিক কাজ করিতেই হয়, তাহা ভালো লাগুক আর না লাগুক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ব্যবস্থায় কবিকে ছাত্রসভায় একটি বক্তৃতা করিতে হয়।" (রবীন্দ্রজীবনী-দ্বিতীয় খণ্ড) এই সময়েই কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ শিক্ষাসমাপ্ত করে আমেরিকা থেকে ইউরোপ ঘুরে ফিরেছেন। সেই উপলক্ষে নানারূপ সামাজিক উত্তেজনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের দিন কেটেছে। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছেন—"দেদার বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছি ; প্রাণ বেরিয়ে গেল। এখনি এক বক্তৃতা-অভিযানে চলেছি।" (পত্র ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯০৯)

(খ) **দীর্ঘকাল অনুপস্থিত** : ১৩১৬ সালের শ্রাবণ মাস থেকেই শিলাইদহে আশ্রয় নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—নির্জনে 'গোরা'-উপন্যাস রচনাই তাঁর উদ্দেশ্য—কিন্তু সেখানে উপস্থিত হয়েছেন জগদীশচন্দ্র বসু ও অজিতকুমার চক্রবর্তী।

(গ) **নানা প্রকার কাজে** : কালীমোহনবাবু তখন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কাজে নিযুক্ত—তাঁর শারীরিক অসুস্থতার জন্য কবির দুশ্চিন্তা এখানেও প্রকাশ পেয়েছে।

পত্র : ১১

এই চিঠির অপর পৃষ্ঠায় 'রাখীবন্ধন' কবিতাটি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। কবিতাটি 'গীতাঞ্জলি' কাব্যে ৪৩-সংখ্যক গান রূপে সংকলিত। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রজীবনী দ্বিতীয় খণ্ডে জানাচ্ছেন—"শান্তিনিকেতনে অজিতকুমারকে একটি রাখিসংগীত পাঠাইয়া দিলেন—'প্রভু আজি তোমার দক্ষিণ হাত' (২৭ আশ্বিন ১৩১৬।। গীতাঞ্জলি ৪৩)—" রবীন্দ্রনাথ কি অজিতকুমার-কালীমোহন উভয়কেই রাখি-সংগীত পাঠিয়েছেন? অবশ্য রাখি-উৎসব কিভাবে হওয়া উচিত সে-সম্বন্ধে তিনি এক সুদীর্ঘ ও স্মরণীয় চিঠি লিখেছেন অজিতকুমারকে— বলেছেন, "তোমাদের আশ্রমে তোমাদের রাখিবন্ধনের দিনকে খুব একটা বড়ো দিন করে তুলো। বড়ো দিন মানেই প্রেমের দিন, মিলনের দিন—যে প্রেমে যে মিলনে ভারতের সকলেই আহুত ভারতবর্ষের যজ্ঞক্ষেত্রে আজ বিধাতা যাদের নিমন্ত্রণ করে এনেছেন আমরা তাদের কাউকেই শত্রু বলে দূরে ফেলতে পারব না।

***"—'ভারততীর্থ' কবিতার মূল 'সুর এখানে-ই যেন ধ্বনিত হয়েছে।'

পত্র : ১২

যতীনের সঙ্গে : যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্বদেশী যুগে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কলেজে পড়ে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করতে আসেন। আদর্শবাদী শিক্ষকরূপে তাঁর পরিচিতি ছিল। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা যে পল্লীসেবার কাজ আরম্ভ করেছিলেন তাতে যতীন্দ্রনাথ বিশেষ ভূমিকা নেন। 'দেশ' পত্রিকার ২৩ শ্রাবণ, ১৩৪৯ সংখ্যায় তাঁর রচনা 'রবীন্দ্র-স্মৃতি'—থেকে জানা যায় পল্লীসেবার কাজে শিক্ষাদানের

দায়িত্ব ছিল তাঁর প্রধানত ভুবনডাঙা গ্রাম-ই ছিল তাঁদের কর্মকেন্দ্র। অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন—অজিতকুমার চক্রবর্তী, বঙ্কিমচন্দ্র রায়, ভূপেশচন্দ্র রায়, সত্যেশ্বর নাগ, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। পল্লীপ্রীতি-ই যতীন্দ্রনাথ ও কালীমোহনকে প্রীতিবন্ধনে বেঁধেছিল।

পত্র : ১৪

(ক) **এখানে এসে** : ২১ আষাঢ় শান্তিনিকেতন থেকে শিলাইদহে যান রবীন্দ্রনাথ। সেখানে পৌঁছে প্রতিমাদেবীকে লিখছেন—"ইচ্ছা করে অনেকদিন ধরে এইরকম এখানে শান্তি ও নির্মলতার মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে কাটিয়ে দিয়ে যাই—।" কিন্তু 'অনেকদিন ধরে' শান্তিতে থাকা সম্ভব হয়নি। সাতদিন সেখানে জমিদারী পরিদর্শনে ব্যস্ত থেকেছেন। গোরাই নদী ও পদ্মার শাখা-প্রশাখা দিয়ে নৌকায় পরিক্রমা করেছেন জানিপুর, কয়া প্রভৃতি জমিদারীর বিভিন্ন মহাল— উদ্দেশ্য পুত্র রথীন্দ্রনাথকে পরিচিত করা। পাশাপাশি রচনা করে চলেছেন গীতাঞ্জলির ১১০-১২২ সংখ্যক গানগুলি।

(খ) **জগদানন্দ** : শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের খ্যাতনামা শিক্ষক জগদানন্দ রায় (১৮৬৯-১৯৩৩)। তাঁর চিঠির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পুজোর ছুটির পর বিদ্যালয়ের পরিচালন-ব্যবস্থার সংস্কার করেন রবীন্দ্রনাথ। প্রভাতকুমার লিখছেন—"বিদ্যালয় পরিচালনার নানা প্রকার নিয়ম নিষেধ, অপিসপত্তন, নানাপ্রকার রিপোর্ট বা প্রতিবেদন পেশ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিতেছেন। লাইব্রেরির পাশে একটি ঘর ছিল সেইখানে হইল অপিস। তথায় কবি নিয়মিত বসেন, স্কুলের সমস্ত খুঁটিনাটি কাজকর্ম দেখেন *** এই সময়ে বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য 'সর্বাধ্যক্ষ' পদের সৃষ্টি হইল। প্রথম 'সর্বাধ্যক্ষ' হন জগদানন্দ রায়। *** এছাড়া ছাত্রপরিচালনার জন্য তিনটি বিভাগ আদ্য মধ্য ও শিশু—পৃথক করা হয়।"

(গ) **জানিপুর-কুমারখালি** : শিলাইদহ নিকটবর্তী জমিদারীর বিভিন্ন মহাল। কুমারখালি একটি প্রাচীন শহর। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে গোরাই নদী।

(ঘ) **তোমার শরীর** : অজিত চক্রবর্তীকে রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গেই লিখছেন—"কালীমোহনের স্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে চোখ রেখো। ওর ওষুধ এবং পথ্য যা কিছুর দরকার তার যেন ত্রুটি না হয়। Vibrona-তে যদি এখন উপকার না হয় তবে আগে আর একটা যে ওষুধ খেয়েছিল (তার নামটা ভুলেছি) আনিয়ে নিয়ো। এই বর্ষার সময় ওর শরীরের জন্য সাবধান হওয়া বিশেষ দরকার—এখন একবার শরীরটা বেঁকে বসলে সুদীর্ঘকাল ভোগাবে। "—কালীমোহন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগ লক্ষণীয়।

পত্র : ১৫

(ক) **পাতিসরের ঘাটে** : ৩১ শ্রাবণ ১৩১৮ 'গীতাঞ্জলি' মুদ্রিত হওয়ার পর পুত্র রথীন্দ্রনাথ-সহ রবীন্দ্রনাথ জমিদারী পরিদর্শনে রওনা হন। প্রথমেই পৌঁছন পতিসর—জমিদারীর কালীগ্রাম পরগনার সদর। বিরাহিমপুর পরগনার সদর শিলাইদহ।

(খ) **সারদাবাবুর চিঠি** : চাঁদপুরের বিখ্যাত বাবুরহাট উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সারদাচরণ দত্ত। ক্ষিতিমোহন কালীমোহন-স্মৃতিতে লিখছেন—"বাবুরহাটের বৃদ্ধ শিক্ষাগুরু সারদা দত্ত মহাশয়ও তরুণ কালীমোহনের অনেক নির্দেশ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেন।"

(গ) **প্যারী** : ৭ সংখ্যক পত্রের পরিচিতি দ্রষ্টব্য।

(ঘ) **পালাইয়া আসিয়াছি** : পুত্রবধূ প্রতিমাকে পতিসর থেকে ৭ ভাদ্র লিখেছেন—"আমি যে ঠিক কাজের তাগিদে এসেছি সেকথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। লোকজনের মধ্যে যখন জড়িয়ে থাকি তখন ছোট বড় নানা বন্ধন চারদিকে ফাঁস লাগায়—নানা আবর্জনা জমে ওঠে—দৃষ্টি আবৃত এবং বোধশক্তি অসাড় হয়ে পড়ে—তখন কোথাও পালিয়ে যাবার জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।"

(ঙ) **বোলপুরে** : সাত-আটদিন রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে জমিদারী-পরিদর্শনের পর কলকাতা ঘুরে ১৩ ভাদ্র বোলপুরে ফেরেন। রথীন্দ্রনাথ পিতার সঙ্গে তাঁর এই জমিদারী-পরিদর্শনের স্মৃতিচারণ করেছেন তাঁর 'পিতৃস্মৃতি'-গ্রন্থে।

(চ) **বামনদাস** : কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদারের ভ্রাতা বামনদাস গিরিডির শিশুবিদ্যালয়ের শিক্ষক। রবীন্দ্রজীবনীকারের পিতা নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ গিরিডির সুধাংশুবিকাশ রায়কে যে-চিঠি লেখেন তাতে বামনদাসবাবুর উল্লেখ আছে।

(ছ) **নগেনকে** : নগেন্দ্রনাথ আইচ (১৮৭৮-১৯৫৬) রবীন্দ্রনাথের মাতুলবাড়ি ও শ্বশুরবাড়ি—খুলনা জেলার দক্ষিণডিহি গ্রামে নগেন্দ্রনাথের জন্ম (১২৮৫), ১৯০১-এ তিনি কলকাতা ট্রেনিং স্কুল থেকে ফ্রী-হ্যাণ্ড ও মডেল-ড্রয়িঙের প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করে গবর্মেন্ট আর্টস্কুলের প্রিন্সিপ্যাল হ্যাভেলের সার্টিফিকেট লাভ করে ভার্নাকুলার মাস্টারশিপ পরীক্ষার ক্লাস পর্যন্ত ড্রয়িং শিক্ষাদানের অধিকার লাভ করেছিলেন। (ভারতশিল্পী নন্দলাল—১ম খণ্ড পৃ ৫২৯-৩০) তিনি শান্তিনিকেতনে যোগ দেন ১৩১০ সালের ফাল্গুন মাসে—তার আগে দক্ষিণডিহি ফুলতলায় শিক্ষকতা করতেন। পূর্ব থেকেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ ছিল।

পত্র : ১৬

(ক) **নাটকটা** : 'অচলায়তন' (প্রকাশ ২ আগস্ট ১৯১২) ২৫ বৈশাখ, ১৩১৮ কবির পঞ্চাশৎ জন্মোৎসবের পর কলকাতা ঘুরে শিলাইদহে যান। সেখানে তখন পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ কৃষির নানা পরীক্ষায় নিযুক্ত। রবীন্দ্রনাথ প্রায় দেড়মাস তাঁদের সান্নিধ্যে কাটালেন। আষাঢ়ে বর্ষা নামলে তাঁর অন্তরে জাগল গানের সুর—তখন-ই 'অচলায়তন' নাটক রচনার সূত্রপাত (১৫ আষাঢ় ১৩১৮)।

(খ) **সন্তোষকে** : কবির প্রিয়বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র, রথীন্দ্রনাথের সহপাঠী সন্তোষচন্দ্র (১৮৮৬-১৯২৬) আমেরিকা থেকে কৃষিবিদ্যায় শিক্ষিত হয়ে শান্তিনিকেতন ফিরে যোগ দেন বিদ্যালয়ের কাজে, স্থাপন করেন গোপালন কেন্দ্র।

পত্র : ১৭

(ক) **বিলাত যাওয়াই** : এই সময় পুত্র রথীন্দ্রনাথ সস্ত্রীক জাহাজে সিঙাপুর ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গী করতে চান। তা শুনে কবি মীরাদেবীকে জানালেন "তোর দাদা আর বৌমা আমাকে সুদ্ধ সিঙাপুরে সমুদ্রপথে ঘুরিয়ে আনবার প্রস্তাব করে এক চিঠি লিখেছে। *** তাকে আজ লিখেছি যদি তিন মাসের ছুটি নিয়ে জাপানে বেড়িয়ে আসতে সে রাজি থাকে তাহলে আমি এই সুযোগে একটু ভালরকম করে হাওয়া খেয়ে নিতে পারি।" পরদিন প্রতিমাদেবীকে লিখলেন—"রথীকে কাল লিখেছি যে যদি জাহাজেই চড়তে হয় তাহলে ২২ দিনের জন্য সমুদ্রের ধাক্কা খেয়ে এসে লাভ কি? একেবারে জাপানে গিয়ে কিছু দেখেশুনে এলে তবু কষ্ট ও খরচপত্র সার্থক হয়?" নির্ঝরিণী সরকারকে লিখছেন—"আমি দূর দেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আমার সেখানে কোনো প্রয়োজন নেই কেবল কিছুদিন থেকে আমার মন বলছে যে পৃথিবীতে জন্মেছি সেই পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে নিয়ে তবে তার কাছ থেকে বিদায় নেব।" পরদিন ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে জানাচ্ছেন—"দীর্ঘকালের জন্য দূরদেশে যাইবার সংকল্প করিয়াছি।" সেই একই দিনে হেমলতা দেবীকে লিখছেন—"আমার টাকা নেই, কাজ রয়েছে আমার অনেক অসুবিধা তবু আমাকে আর বদ্ধ হয়ে বসে থাকতে দিচ্ছে না। *** বেরো, বেরো, বেরোঁ, রাস্তায় বেরিয়ে পড়*** মন একবারো পিছন ফিরে তাকাতে চাইছে না।" প্রিয়ম্বদা দেবীকে লিখেছেন— "মনের ভিতর কেবলি এই ধাক্কা আসছে—বেরও, বেরও, বেরও—প্রকাশ হোক, তোমার সম্পূর্ণ প্রকাশ হোক। সমস্ত বন্ধন নিঃশেষে ছিন্ন হলে বাঁচি।"

এত ব্যাকুলতা সত্ত্বেও নানা সাংসারিক ও আর্থিক কারণে সিঙাপুর-জাপান-ইউরোপ কোথাও যাওয়া হয়নি। ভ্রমণ-পরিকল্পনা সাময়িকভাবে বাতিল হলে কবি শিলাইদহবাসী হন।

(খ) **বইওয়ালা** : বিদেশ যাত্রার পাথেয় সংগ্রহের জন্য ঢাকার অতুল লাইব্রেরিকে (প্রকাশক) গল্প 'রাসমণির ছেলে' এবং নাটক 'অচলায়তন' বিক্রি করার কথা লিখেছেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে—এমনকি 'জীবনস্মৃতি'-ও তাদের হাতে দেবেন স্থির করেছেন—"নইলে যথেষ্ট টাকা পাব না।" আরো পরে মণিলালকে জানাচ্ছেন—"আমি ২৫০০ টাকা চাইব। আর যদি ওর সঙ্গে 'ছিন্নপত্র' (আমার চিঠি) জুড়ে দিই তাহলে ৩০০০ টাকা। এর কমে আমার ভ্রমণ হবেই না।" —এত উদ্যোগের পর-ও তাঁর বই বিক্রি হয়নি।

(গ) **যুবকটিকে** : রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে একজন সহকারী নিয়ে যেতে ইচ্ছুক। মণিলালকে লিখেছেন—"আমার খরচ কিছু বেশি লাগবে, কেননা আমি সঙ্গে একজন ভদ্রলোক সেবক নিয়ে যেতে চাই—নইলে এ বয়সে আমার নিজের সমস্ত ভার আমি নিজে বহন করতে পারব না।" সে-কারণেই রমণীরঞ্জনের প্রসঙ্গ উঠেছে।

(ঘ) **দ্বিপু** : দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আশ্রম-পরিচালক।

পত্র : ১৮

(ক) **আমি কবে যাত্রা** : অক্টোবর মাসে দিন স্থির হলেও বিলাত যাত্রা ঘটেনি।

(খ) **রমণী** : পরের বছর মে-মাসে যখন বিলাতযাত্রী হন তখন 'রমণী' নামে কোনো সঙ্গীর উল্লেখ দেখা যায় না।

(গ) **আমেরিকা** : ইউরোপ-আমেরিকার শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যই কালীমোহনকে সেখানে পাঠানোর উদ্যোগ হয়—কিন্তু আমেরিকা তো দূরের কথা ইংলণ্ডেই তাঁর পাঠ শেষ হয়নি—অর্থাভাবে তাঁকে ফিরে আসতে হয়।

(ঘ) **নেপালবাবু** : নেপালচন্দ্র রায় (১৮৬৭-১৯৪৪) শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ইংরেজি ও ইতিহাসের শিক্ষক। ইংরেজি শিক্ষাদানে তাঁর খ্যাতি ছিল।

(ঙ) **শচীন্দ্র** : শচীন্দ্রমোহন বসু ইংরেজির অধ্যাপক।

পত্র : ১৯

(ক) **রাখীবন্ধন** : বঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষে ১৯০৫ সালে রাখীবন্ধন উৎসব প্রবর্তিত হয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রচনা করেন বিখ্যাত রাখী সংগীত—'বাংলার মাটি, বাংলার জল।' ১৩১২ (১৯০৫) বঙ্গাব্দের ৩০ আশ্বি বঙ্গভঙ্গের দিনে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া'-য় রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে উৎসব পালনের বৃত্তান্ত আছে। আলোচ্য অসম্পূর্ণ পত্রটি থেকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ সে-সময় রাখীবন্ধনকে রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে পরিণত করা পছন্দ করেননি।

(খ) **সুরেন্দ্রবাবুরা** : সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ১৫ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ 'দেশনায়ক নামে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাতে তিনি সুরেন্দ্রনাথকেই 'দেশনায়ক' পদে বরণ করার আহ্বান জানান। [পরে 'সমূহ' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা কালে তিনি সুরেন্দ্রনাথ-সংক্রান্ত প্রসঙ্গগুলি প্রবন্ধ থেকে বর্জন করেন।]

(গ) **সেদিনকার সভায়** : বঙ্গচ্ছেদের দিনে রাখীবন্ধন-উৎসবে এবং 'ফেডারেশন হল'-এর শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যোগ দিলেও বীডন স্কোয়ারে যে বিশাল সভা হয় তাতে রবীন্দ্রনাথ অনুপস্থিত ছিলেন। [রবিজীবনী-৫ম খণ্ড-পৃ ২৬৯ : প্রশান্তকুমার পাল]

পত্র : ২০

(ক) **১৪ই জ্যৈষ্ঠ** : ১৯১১ সালে অক্টোবর মাসে প্রধানত আর্থিক-অসুবিধার এবং ১৯১২ সালের মার্চ মাসে অসুস্থতার জন্য যে-বিলাতযাত্রা স্থগিত হয়েছিল তা বাস্তবায়িত হল ২৪মে, ১৯১২ (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯)। রথীন্দ্রনাথ-প্রতিমা সহ রবীন্দ্রনাথ বম্বাই পৌঁছন ২৬ মে, জাহাজ ছাড়ে ২৭ মে। এই বিলাতযাত্রার কারণ ১) বন্ধন থেকে মুক্তির ব্যাকুলতা (২) বৃহৎ বিশ্বকে দেখা ও জানার বাসনা (৩) য়ুরোপের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা-অর্জন (৪) আশ্রম বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করা (৫) ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও ব্রাহ্ম নেতা ভাই প্রথমলাল সেনের আমন্ত্রণ এবং (৬) তাঁর অর্শ-পীড়ার চিকিৎসা।

(খ) **দেবল** : ব্রহ্মচর্যাশ্রমের দ্বিতীয় অ-বাঙালি ছাত্র— [প্রথম হোরিসান—জাপানী] নারায়ণ কাশীনাথ দেবল-বাবা মারাঠী, মা ব্রহ্মদেশীয়। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালেই বিলাত যান। পরবর্তীকালে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন।

(গ) **পাঠসঞ্চয়** : সঞ্চয়ন গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ-রচিত প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯৯ [২০ মে, ১৯১২ প্রকাশ তারিখ] কবি বিলাতে, অবস্থানকালে যখন ম্যাকমিলান কোম্পানির উদ্যোগে 'গীতাঞ্জলি' এবং অন্যান্য রচনা প্রকাশের আয়োজন চলছিল তখনই খবর পৌঁছয় 'পাঠসঞ্চয়' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকার অন্যতম পাঠ্যরূপে নামঞ্জুর হয়েছে। জগদানন্দ রায়কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"আমার বই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুর হল না এতে তোমরা রাগ করচ কেন? যার-ই বই না-মঞ্জুর হত সেই তো বেজার হত এবং মনে করত অবিচার করা হয়েছে। যাঁরা বিচারক তাঁরা ঠিকই বিচার করেছে বলে ধরে নিলে ফল সমান-ই থেকে যায় অথচ মনের আক্ষেপটা বেঁচে যায়, সেটা তো কম লাভ নয়। হয়তো আমার বইয়ের ভাষা প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের প্রবেশগম্য নয়...।" এই বই ছাপানোর জন্য ব্যয় হয়েছিল ১৬৫ টাকা।

আশুবাবু : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

পত্র : ২১

(ক) **তোমার সম্বন্ধে** : কালীমোহনের আর্থিক সংকটের প্রসঙ্গে সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, হেমলতাদেবী প্রমুখের সঙ্গে কবির পত্রালাপ চলেছে। ১৭-সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন দ্বিপেন্দ্রনাথ, (যিনি তখন' বিদ্যালয়ের পরিচালক ও কোষাধ্যক্ষ) কালীমোহনকে বিদ্যালয় থেকে ছুটি নেওয়ার জন্য কোনো অর্থ সাহায্য করবেন না। রবীন্দ্রনাথকে সে দায়িত্ব নিতে হয়েছে। শান্তিদেব ঘোষের কাছে রাখা কাগজপত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত একটি চিঠি পাওয়া গেছে—কার উদ্দেশ্যে সঠিক বোঝা যায় না—তারিখ দেওয়া আছে ৬ বৈশাখ ১৩১৯—(অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বিলাতযাত্রার মাসখানেক আগে লেখা) শান্তিনিকেতন থেকে কবি লিখছেন—"শ্রদ্ধাস্পদেষু : শ্রীমান কালীমোহন ঘোষকে বিলাতযাত্রার পাথেয় দিবার প্রস্তাব আপনাদের সভায় গ্রাহ্য হইয়াছে। এক্ষণে সেখানকার ব্যয় নির্বাহার্থ ইঁহার কি রূপ সম্বল আছে তাহা নিশ্চয়ই আপনারা জানিতে ইচ্ছা করিবেন। অন্যত্র হইতে ইনি যে অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন বা সাহায্যের আশা পাইয়াছেন সে সম্বন্ধে আমার কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি কেবল আপনাকে ইহাই জানিইতেছি যে আমাদের পরিবার ও বিদ্যালয় হইতে এককালীন চারশত টাকা ও তাঁহার দুই বৎসর অধ্যয়নকালের জন্য মাসিক ষাট টাকা সাহায্য করা হইবে তাহার কোনো অন্যথা হইতে পারিবে না। অতএব ইনি নিঃসম্বল বিদেশে যাইতেছেন না এ সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন। ইতি ৬ই বৈশাখ ১৩১৯ ভবদীয় শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

(খ) **আর্নল্ড** : টমাস আর্নল্ড। ইসলাম ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্পের খ্যাতনামা পণ্ডিত। রবীন্দ্রানুরাগী। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। ২১ জুন, ১৯১২ লণ্ডনে

পিয়ার্সনের বাড়িতে সুকুমার রায় বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সেখানে আর্নল্ড-দম্পতি উপস্থিত ছিলেন—একথা সুকুমার তাঁর ভগ্নী পুণ্যলতাকে জানিয়েছেন।

(গ) **Rothenstein** : স্যার উইলিয়ম রোটেনস্টাইন (১৮৭২-১৯৪৫) বিখ্যাত ব্রিটিশ চিত্রকর। ১৯১০ সালে ভারত ভ্রমণে আসেন—পরিচিত হন ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে। শেফিল্ড বিশ্বদ্যিালয়ের আর্টের অধ্যাপক, ১৯২০-৩৫ ইংলণ্ডের রয়াল কলেজ অব আর্টের অধ্যক্ষ। তাঁর রচিত 'মেন অ্যাণ্ড মেমোরিজ' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

(ঘ) **আগামী শনিবারে** : ইংলণ্ডের পল্লীজীবন দেখার জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রথমে স্ট্যাফোর্ডশায়ারে বাটর্টিন গ্রামে যান। তার অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে—'ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রী' রচনায়। (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পৌষ ১৩১৯, পৃ-২২১ দ্রষ্টব্য) এরপর চলে আসেন গ্লাস্টারশায়ারে চ্যালফোর্ড গ্রামে। Oakridge Lynch চ্যালফোর্ডেই। এখান থেকে ২৪ আগস্ট লন্ডনে ফিরে যান।

পত্র : ২২

(ক) **বিদেশে এসে** : রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ অক্টোবরের ২১-২২ নাগাদ ইংলণ্ড ছেড়ে আমেরিকা যাত্রা করেন এবং ২৭-২৮ অক্টোবর নাগাদ নিউইয়র্ক পৌঁছন।

(খ) **আটলান্টিক** : ১২ কার্তিক ১৩১৯ অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখেছেন—"সমুদ্র প্রথম কয়দিন যেমন অশান্ত ছিল এমন আর কখনো আমি দেখিনি। এই দেহপাত্রের মধ্যে যেটুকু জীবন ছিল তাকে ঝাঁকানি দিয়ে দিয়ে তার অর্দ্ধেকটা প্রায় বের করে ফেলল—যেটুকু বাকি ছিল তাতে কেবলমাত্র বেঁচে থাকা চলে তার অতিরিক্ত আর কোনো কাজেই চলে না। *** এবার আমাদের আটলান্টিকের এই ঝুলনযাত্রা আমরা ইহজীবনের কখনো ভুলতে পারব না।"

(গ) **নিউইয়র্ক** : নিউইয়র্ক জাহাজঘাটায় শুল্ক কর্মচারী এবং সাংবাদিকদের ব্যবহারে উত্যক্ত হন রবীন্দ্রনাথ। প্রথম দর্শনে আমেরিকাকেও তাঁর ভালো লাগেনি। বলেছেন—"আমেরিকা যেন কাঁচা ফলের মতো, এখনও তাতে ঠিকমতো স্বাদ আসনি। কাঁচাফলের মতোই তার স্বাদ এখনও ঝাঁঝালো, কটু।" (রবীন্দ্রনাথ ও আমেরিকা, দেশ, রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৩৬৯ পৃ-৬৭)

(ঘ) **এখানে** : আর্বানা-ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন রথীন্দ্রনাথ—সেই সুবাদে সেখানে তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি ছিল।

(ঙ) **ব্রুক্‌সের** : অধ্যাপক মরগ্যান ব্রুকসের বাড়িতে অতিথি হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা উঠেছেন অধ্যাপক সীমুরের বাসায়। দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র-কে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"আজ পর্যন্ত আমি এখানকার অধ্যাপক ব্রুকসের বাড়িতে অতিথিভাবে দিনযাপন করছি। এঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চমৎকার লোক—আলাপ আলোচনা, যত্ন, আদর, কিছুরই ত্রুটি হচ্ছে না, স্নানাহারের ব্যবস্থাও বেশ পর্যাপ্ত।"

(চ) **সোমেন্দ্র এবং বঙ্কিম** : সোমেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্মন, ত্রিপুরার রাজপবিারের সন্তান। শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের ছাত্র। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই ইংলণ্ড যান। বঙ্কিমচন্দ্র রায় (১৮৮০-১৯৫৬) শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

(ছ) **রথী কলেজে** : রথীন্দ্রনাথ পিতার ইচ্ছা অনুসারে ইলিনয়ে জীবতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন রথীন্দ্রনাথ ইলিনয় ও কেম্ব্রিজে গবেষণা করে শান্তিনিকেতনে বিজ্ঞানাগার ও গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তুলবেন। কিন্তু তা হয়নি—পিতার অনুগামী হয়ে তাঁকে আবার ইংলণ্ড ঘুরে ভারতে ফিরতে হয়।

(জ) **আরামবোধ হচ্ছে** : "কোথাও কোনো গোলমাল নেই—আকাশ খোলা, আলোক অপর্যাপ্ত, অবকাশ অব্যাহত। মাঝে মাঝে একেবারে ভুলে যাই যে আমেরিকায় এসেছি—ঠিক মনে হয় যেন দেশে আছি।" (পরিশিষ্ট। পথের সঞ্চয়।)

(ঝ) **ব্রজেন শীল** : আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (১৮৬৪-১৯৩৮) প্রখ্যাত দার্শনিক। তুলনামূলক সাহিত্যে, ধর্মদর্শন বিচারে এবং আলোচনায় গাণিতিক সূত্র প্রয়োগে ভারতে তিনিই পথিকৃৎ। ইউরোপের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অতিথি-অধ্যাপক' রূপে আমন্ত্রিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ইংলণ্ড-ভ্রমণের মূলে ব্রজেন্দ্রনাথের প্রেরণা কাজ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন ব্রজেন্দ্রবাবুকে আমেরিকায় বক্তৃতা-সফরে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করছেন।

(ঞ) **ধাক্কা সামলাতে** : লণ্ডনের প্রবল শীত কালীমোহনের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল হবে কিনা এটাই কবির কাছে উদ্বেগের বিষয়।

(ট) **চণ্ডী** : শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র চণ্ডীচরণ সিংহ তখন গ্লাসগোতে এঞ্জিনিয়ারিং পাঠরত। পরবর্তীকালে ইনি জামসেদপুরে টাটা কোম্পানিতে নিযুক্ত হন। ১৯২৩ সালে টাটা কোম্পানীর অর্থানুকূল্যে শান্তিনিকেতনে 'রতনকুটির' বা টাটা বিল্ডিং অতিথি-নিবাস নির্মাণের দায়িত্ব ছিল তাঁরই উপরে।

(ঠ) **দেবল** : রবীন্দ্রনাথ এই সময় দেবল সম্বন্ধে নানা চিন্তা করেছেন—সন্তোষচন্দ্রকে লেখা চিঠিতে তার পরিচয় মেলে। কখনও চেয়েছেন দেবল ইংরেজি ও সংস্কৃতে পণ্ডিত হোক, কখনও বা তার জন্য সংগীত ও চিত্রবিদ্যার চর্চার কথা ভেবেছেন। দেবল কিন্তু দর্শনের চর্চা করেছেন, কখনও বা মূর্তিগড়া অভ্যাস করেছেন।

(ড) **আমার বই** : ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'।

পত্র : ২৩

(ক) **প্রশান্ত** : বিখ্যাত সংখ্যাতত্ত্ববিদ ও রবীন্দ্র-সহচর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ (১৮৯৩-১৯৭২)। প্রশান্তচন্দ্রের টাকা পাঠানোর খবরে হেমলতা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'কালীমোহনকে প্রশান্ত ৫০০ টাকা পাঠিয়েছেন শুনে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হলুম। তাঁর যে অভাব ছিল এতে সেটা সম্পূর্ণ কেটে যাবে বলে আশা করচি। তাহলে তুমি যে নিয়মে টাকা পাঠাতে চাচ্চ তা পাঠালে তার কোনো অসুবিধা হবে না। কালীমোহন এই যে সকলের কাছ থেকে সাহায্য পেলেন এ তিনি সম্পূর্ণ সার্থক করে যেতে পারবেন। কেবল আমি একান্ত আশা করি লণ্ডনের শীতটা যেন তিনি সুস্থ শরীরে কাটাতে পারেন। এ-পর্যন্ত তাঁর শরীর তো বেশ ভালো-ই ছিল—একটা সুবিধা এই যে সেখানে তিনি অনেক হিতৈষী বন্ধু পেয়েছেন—তাঁর পক্ষে এরকম বন্ধু পাওয়া সহজ।

(খ) **Nation** : Nation বিলাতের উদারপন্থীদের প্রধান সাপ্তাহিক পত্র। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"ইংলণ্ডে যে-সকল মহাত্মা স্বদেশ ও বিদেশ স্বজাতি ও পরজাতিকে স্বার্থপরতার ঝুঁটা বাটখারায় মাপিয়া বিচার করেন না, অন্যায়কে যাঁহারা কোনো ছুতায় কোথাও আশ্রয় দিতে চান না, যাঁহারা মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু, Nation তাঁহাদেরই বাণী বহন করিবার জন্য নিযুক্ত।" (পথের সঞ্চয়)

(গ) **রথীর ইচ্ছা** : পূর্বপত্রের পরিচিতি দ্রষ্টব্য

পত্র : ২৪

(ক) **Seymour** : আর্বানা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর্থার আর সীমুর এবং তাঁর পত্নী উভয়েই রবীন্দ্রনাথের শুভানুধ্যায়ী। প্রতিমা দেবী শ্রীমতী সীমুরের কাছে ইংরেজি-চর্চা করেছেন। এই দম্পতির প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে 'টেগোর-সার্কেল'। শ্রীমতী সীমুর সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ইলিনয়ে থাকাকালে তাঁর কাছে বাংলা শিখেছেন।

(খ) **পাঁচশো টাকা লাভের** : হেমলতাদেবীকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন : "এর আগে কালীমোহন আমাকে দুখানা চিঠি লিখেছে কিন্তু কি কারণে পাইনি। কাল তার চিঠি পেয়ে জানলুম পুনর্বার সে প্রবঞ্চিত হয়েছে। পাঁচশো টাকা তাকে পাঠানো হয়েছে গুজব উঠেছে—কিন্তু এরকম গুজব পূর্বেও উঠেছিল এবং সে গুজব আজ পর্যন্ত সফল হয়নি। কেন যে তার সম্বন্ধে এরকম নিষ্ঠুরতা করা হচ্ছে আমি তা বুঝতে পারছি নে। যদি স্পষ্ট করে বলে ভুল হয়েছিল, মনে করেছিলুম টাকা দিতে পারব কিন্তু এখন দেখছি সেটা সম্ভব হবে না তাহলে বিশেষ ক্ষতি ছিল না। কালীমোহন লিখেছেন ডিসেম্বরের কোনো খরচ না পেয়ে তিনি ভারি মুস্কিলে পড়ে গেছেন। আশা করছি দেবলের কাছে যে টাকা আছে তাতে কালীমোহনের উপস্থিত খরচ চলে যাবে তারপরে টাকা এলে শুধে দিলেই হবে। রথী দেবলকে সেইরকম ভাবে লিখে দেবেন বলেছেন। *** কালীমোহনের জন্যে আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আছে—যদি সম্ভবপর হত তাহলে আমি লণ্ডনে চলে যেতাম কিন্তু এখানকার ব্যবস্থা উলটপালট করে দিয়ে যাবার মত সামর্থ্য ও সম্বল আমার নেই।"

(গ) **বৌমা** : দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী হেমলতা দেবী কালীমোহনকে পুত্রপ্রতিম স্নেহ করতেন। তাঁর কালীমোহনকে লেখা সমকালীন একটি চিঠিতেই তার নিদর্শন মেলে। 'কালীমোহন, তুমি ত বিলাত গিয়ে বসে রইলে। এদিকে আমরা যে তোমার টাকা নেই খবর পেয়ে তোমার জন্যে কি ভয়ানক ভেবেছি তা তুমি বুঝতেই পারবে না। আমি বুঝতে পেরেছিলুম, তোমার যে পরিমাণ অভাব সেটা মেটানো আমাদের সহজসাধ্য নয় অথচ তুমি কষ্ট পাবে সেটাও আমরা সহ্য করতে পারতাম না। এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়ে আমি কিছুদিন অত্যন্ত দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তায় কাটিয়েছি ও প্রশান্তদের প্রতিশ্রুত টাকাটা যাতে তোমার জন্য যায় সে জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। ক্ষিতিমোহনবাবু নেপালবাবু, তেজেশ রামানন্দবাবু সকলকে আদায় করবার জন্যে লাগিয়েছিলুম—তারাও সমস্ত অন্তরের সঙ্গে চেষ্টা করেছেন। যাই হোক এতদিনে বিপদ থেকে উদ্ধার হওয়া গেছে, তোমার নামে ৫০০ টাকা কুকের ওখানে জমা দেওয়া হয়েছে

এবং টেলিগ্রামে সে টাকা পৌঁছবার কথা বলে দেওয়া হয়েছে। আর ভয় নাই। ঈশ্বরের দয়া সন্দেহ মাত্র নাই। এখন তোমাকে কি খুচুর খুচর করে আমি টাকা পাঠাব, অথবা জানুয়ারির ১৫ই দেড়শ ও এপ্রিলের ১৫ই ১৫০ পাঠাব? আগামী বৎসরের ৩০০ টাকা দুই দফায় ১৫০ করিয়া পাঠাইতে পারি—তুমি যেমন বল? ঈশ্বরের অনুগ্রহ সর্বদা স্মরণ কোরো ও কাকা-মহাশয়ের [রবীন্দ্রনাথ] পরামর্শ নিয়ে যা করবার সেটা ঠিক করো। তুমি পড়াশুনা শিখে ফিরে এলে আমি বাঁচি। ভোরে চিঠি লিখতে হচ্ছে—নতুবা আর ডাকের সময় নাই। দুখানি টিকিট না কাছে থাকায় এ মেলে কাকা মহাশয়ের চিঠির মধ্যেই তোমাকে চিঠি দিলাম। মা।" মনে হয় কালীমোহন শান্তিনিকেতনে হেমলতাকে 'মা' বলে সম্বোধন করতেন। এই চিঠির উপরেই পৃথক পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ ২৩ সংখ্যক চিঠি লিখেছেন। মূল চিঠি দু'খানি শান্তিদেব ঘোষের সংগ্রহে রয়েছে।

(ঘ) **শিশুশিক্ষা** : শান্তিনিকেতনের শিশুবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক কালীমোহন ইউরোপের শিশুশিক্ষা বিষয়ে পড়াশুনো করবেন সেটাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথও তাই চান—এর জন্য বইপত্র যা প্রয়োজন তা কিনে নেবার নির্দেশ দিয়েছেন।

(ঙ) **চার সপ্তাহে** : ইলিনয়ের ইউনিটেরিয়ান বা একেশ্বরবাদী-দের মিস্টার ভেল নামে এক পাদ্রী রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের ইউনিট ক্লাবে উপনিষদ সম্বন্ধে কিছু বলার অনুরোধ জানান। সেখানে প্রতি রবিবার ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় ও ধর্মগুরুদের সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্ববোধ' 'আত্মবোধ' 'ব্রাহ্মসাধন' ও 'কর্মযোগ' বক্তৃতাগুলি যথাক্রমে ১০, ১৭, ২৪ নভেম্বর ও ১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়।

(চ) **'বন্ধু'** : রোটেনস্টাইন-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনা। 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

(ছ) **রীতিমত আড্ডা** : ইলিনয়ে রথীন্দ্রনাথ গবেষণা করবেন বলে একবছরের জন্য বাড়ি ভাড়াও নেওয়া হয়েছে।

(জ) **ইংরেজি গীতাঞ্জলি** : বাংলা 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'নৈবেদ্য', 'খেয়া', 'শিশু', 'চৈতালি', 'স্মরণ', 'কল্পনা', 'উৎসর্গ' ও 'অচলায়তন' থেকে সবশুদ্ধ ১০৩টি কবিতার কবিকৃত অনুবাদ-ই ইংরেজি গীতাঞ্জলি। ১৯১২ সালে গীতাঞ্জলি বা 'সঙ অফারিঙস' লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ভূমিকা লেখক য়েট্স।

পত্র : ২৫

(ক) **চিকাগো** : জানুয়ারির (১৯১৩) শেষদিকে রবীন্দ্রনাথ আর্বানা ছেড়ে চিকাগো যান। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে Ideals of the ancient civilisation of India সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

(খ) **রচেস্টার** : ২৯ জানুয়ারি কবি রচেস্টারে পৌঁছন। সেখানে উদার ধর্মমতিদের সম্মিলনে যোগ দেন। ৩০ জানুয়ারি ভাষণ দেন—বিষয় Race conflict.

(গ) **Prof. Eucken** : জার্মান দার্শনিক পণ্ডিত রুডলাফ অয়েকনে (১৮৪৬-১৯২৬)। জার্মানির জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক—বহু গ্রন্থের লেখক, আদর্শবাদী বলে দেশ বিদেশে খ্যাত। ১৯০৮-১৩ সালে হার্ভার্ডের পরিদর্শক-অধ্যাপক পদে নিযুক্ত। এক

ভোজসভায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অয়কেনের সাক্ষাৎ ঘটলে বৃদ্ধ "দুইহাতে আমার হাত ধরে আমাকে খুব সমাদর করে গ্রহণ করলেন—বললেন ইণ্ডিয়া ও জার্মানী আমরা এক রাস্তায় চলেছি। এই বৃদ্ধ কতকটা বড়দাদার ধরনের মানুষটি খুব সরল এবং যেন জীবনোৎসাহে পূর্ণ।"

(ঘ) **নানা লোকের সঙ্গে** : ইংলণ্ডে বাসকালেই রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন কালীমোহনের বিলাত-প্রবাস সার্থক হবে। আমেরিকা রওনা হওয়ার আগেই হেমলতা দেবীকে এক চিঠিতে লিখছেন—"কালীমোহন পড়াশুনার যেরকম ব্যবস্থা করেছে এবং ভাল লোকেদের সঙ্গে যে-রকম মেলামেশার উদ্যোগ করতে পেরেছে তাতে বেশ বুঝতে পারছি কোনোমতে এখানে দু'বছর কাটিয়ে যেতে পারলে ওর খুবই উপকার হবে—ও রীতিমতো মানুষ হয়ে যেতে পারবে। ওর চেয়ে শিক্ষিত অনেক ছেলে এখানে আসে কিন্তু তারা এখানকার সমস্ত শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতেই পারে না। কালীমোহনের মধ্যে ভাল জিনিসকে পাবার একটা অপরিসীম ক্ষুধা আছে—এজন্যে ওর সমস্ত মনের উদ্যম সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত হয়ে আছে। তোমরা দেখতে পাবে ও যখন ফিরবে তখন দেবল প্রভৃতির চেয়ে ঢের বেশি উন্নতি লাভ করে যেতে পারবে। তাই দেখতে পাচ্ছি ওকে এখানে পাঠানোর সমস্ত চেষ্টা ও ব্যয় ষোলো আনা সার্থক হবে—অন্য কোনো ছেলে ওর ধারেকাছেও লাগতে পারে না। দেবল প্রভৃতি ছেলের চিত্তের সেই অদম্য উদ্যম নেই এবং তাদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা কালীমোহনের মত বিশিষ্ট এবং জাগ্রত নয়। এই জন্য বলছি কালীমোহনকে তোমরা যে পরিমাণে সাহায্য করচ ও তাকে বহুতর পরিমাণে সফল করে তবে ফিরবে। ওর সম্বন্ধে কাউকে কিছুমাত্র নিরাশ হতে হবে না, কারণ ওর নিজের শুভবুদ্ধি ওর সকলের চেয়ে বড়ো সহায়—ও ভালো বলেই ওর ভালো হবে—সুবিধা পেয়েছে বলে নয়—আনুকূল্য ও প্রতিকূল্য সমস্তকেই ও আপনার সুহৃদ করে নিতে পারবে।"

(ঙ) **৭ই পৌষ নিকটবর্তী** : সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকেও ৩ পৌষ কবি লিখছেন—"সন্তোষ, ৭ই পৌষ নিকটে আসছে। মনটা তোমাদের কাছে ছুটছে, উৎসবের নির্ঝরধারায় স্নান করে তোমরা নূতন প্রাণ লাভ করো—জগৎকে জীবনকে আবার একবার নতুন করে গ্রহণ করো—তোমাদের সাধনক্ষেত্রে সঙ্কল্পকে আবার একবার নবীন করে উপনীত করো, দূরে থেকে এই আমি আশীর্বাদ করি। এখানেও ৭ই পৌষ আসবে কিন্তু তোমাদের সেই আমলকি বনের সেই শিউলিতলার ৭ই পৌষ কোথায় পাবো এখানকার আকাশে সেই বাণী নেই।***'

পত্র : ২৬

(ক) **৭ই পৌষের উৎসব** : অজিতকুমার চক্রবর্তীকে চিঠি লিখেছেন সাতই পৌষ তারিখেই। —"আজ ৭ই পৌষ। কাল সন্ধ্যার সময় যখন একলা আমার শোবার ঘরে আলো জ্বালিয়ে বসলুম আমার বুকের মধ্যে এমন একটা বেদনা বোধ হতে লাগল যে আমি বলতে পারিনে। বেদনা শরীরের কী মনের তা জানিনে কিন্তু আমাকে ব্যাকুল করে তুললে। তখন আমার মনে পড়ল ঠিক সেই সময়ে তোমাদের ভোরের বেলার

উৎসব আরম্ভ হয়েছে। কেন না এখানকার সঙ্গে তোমাদের সময়ের প্রাণ বারো ঘণ্টা তফাত। তোমাদের সমস্ত উৎসব আমার হৃদয়কে আকর্ষণ করেছিল। কাল রাত্রে ঘুম থেকে প্রায় মাঝে মাঝে জেগে উঠে ব্যথা বোধ করেছিলুম। স্বপ্ন দেখলুম, তোমাদের সকাল বেলাকার উৎসব আরম্ভ হয়েছে—আমি যেন এখান থেকে সেখানে গিয়ে পৌঁছেছি— কিন্তু কেউ জানে না। তুমি যখন গান গাচ্ছ, 'জাগো সকল অমৃতের অধিকারী' আমি মন্দিরের উত্তরের বারান্দা দিয়ে আস্তে আস্তে ছায়ার মতো যাচ্চি তোমাদের পিছনে গিয়ে বসব—তোমরা কেউ কেউ টের পেয়ে আশ্চর্য হয়ে উঠেছ। এমনতর সুস্পষ্ট স্বপ্ন আমি অনেকদিন দেখিনি। জেগে উঠে ওই গানটা আমার মনে বাজতে লাগল। পাঁচটা বাজল, এখানে আমাদের উৎসবের সময় হল। আমার শোবার ঘরের একপ্রান্তে একখানা কম্বল পেতে আমরা পাঁচজনে [কবি, রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমাদেবী, বঙ্কিমচন্দ্র রায় ও সোমেন্দ্র দেববর্মণ] বসলুম। তোমাদের ওখানে তখন সন্ধ্যার উৎসব আরম্ভ হয়েছে। ৭ই পৌষের শুভদিন কি আমাকে একেবারে ঠেলে যেতে পারবে? আমার জীবনের মাঝখানে যে তার আসন পাতা হয়ে গিয়েছে। এই দিনটিকে যে আমি স্পর্শমণির মত আমাদের আশ্রম থেকে কুড়িয়ে পেছি।"

(খ) **বন্ধুমণ্ডলী** : 'গীতাঞ্জলি'-কে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে যে-ভাবুক সমাজের সংস্পর্শে এসেছিলেন তাদের অধিকাংশের সঙ্গেই কবিপুত্র ও কালীমোহনের সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রথীন্দ্রনাথ 'পিতৃস্মৃতি'-তে লিখছেন—"বাবার কাছে নিত্যনূতন লোকের আনাগোনা চলছে। আমি ও কালীমোহনবাবুর এদিকে আমাদের উদ্‌বৃত্ত সময়টুকু কাটাচ্ছি য়েটস ও এজরা পাউণ্ডের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে।" "পিতৃস্মৃতি-তে এই আলাপ-জমানোর বিস্তৃত বিবরণ আছে। কালীমোহনবাবুর সঙ্গে রোটেনস্টাইন, মিস সিনক্লেয়ার, এডুইন বেভিনস, এজরা পাউণ্ড, ইভলিন হিউজেস, ডবল্যু কে. স্পেনসারের পত্রালাপের পরিচয় পাওয়া যায়।

(গ) **Ezra Pound : Ezra Loomis Pound** (১৮৮৫-১৯৭২) প্রখ্যাত মার্কিন কবি ও সাহিত্য সমালোচক। ১৯০৯-এ প্রকাশিত তাঁর 'পারসোনা'এ এবং 'একজালটেশন্‌জ' কাব্য দু'খানি তাঁকে সুপরিচিত করে তোলে। 'রিপোস্ট্‌স্' কাব্য ইংরেজি সাহিত্যে তাঁকে ইমেজিস্ট কাব্যধারার পথিকৃৎ করে তোলে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে (১৯১২) তিনি 'পোয়েট্রি' পত্রিকার বিদেশী কবিতা বিভাগের সম্পাদক। ১৯১৩ সালে য়েটসের ব্যক্তিগত সচিবের কাজ করেন। এলিয়টের 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' প্রকাশের পিছনে তাঁর উদ্যোগ স্মরণীয়— তেমনি জেমস জয়েসের 'এ পোর্ট্রেট অফ দি আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়ং ম্যান' এবং 'ইউলিসিস' প্রথম পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় পাউণ্ডের চেষ্টায়। তাঁর মহত্তম-কীর্তি 'ক্যানটোজ' নামে কবিতাগুচ্ছ-এর মধ্যে মানবসভ্যতার ইতিহাস পরিক্রমা এবং তাঁর আত্মজীবনী স্থান পেয়েছে।

পাউণ্ডের সান্নিধ্য প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথ লিখছেন—"পাউণ্ড একেবারে আলাদা জাতের লোক— যাকে বলা যায় অনন্য। তাঁর কাছে কাব্যরচনা ছিল এক মহৎ ব্যাপার। তিনি যে কাব্যরচনায় চিরাচরিত পথ ছেড়ে নিজের স্বতন্ত্র পথ তৈরি করে নিতে পেরেছেন— এ নিয়ে তাঁর মনে একটা অহমিকাবোধ সদা জাগ্রত ছিল। পাউণ্ডের প্রকৃতিতে ও

আচরণে বেশ একটা নাটকীয়তা ছিল। তৎসত্ত্বেও তাঁকে আমাদের ভালো লাগত। তিনি যে মার্কিনমুলুকের লোক, এ-কথা চেপে যেতে পারলেই তিনি যেন খুশি হতেন। কিন্তু তাহলে কী হয়, তাঁর সরলতা ও সহৃদয়তা দেখে বেশ বোঝা যেত তিনি বিলিতি সাহেব নন। পাউণ্ড এ-সময়ে বাবার বিশেষ অনুরাগী ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন।"

পত্র : ২৭

(ক) **রচেষ্টার কংগ্রেসের** : ২৫-সংখ্যক পত্র ও তার পরিচিত দ্রষ্টব্য।

(খ) **Rattrey** : ১৯১০ সালে ইংলণ্ড বাসকালে অজিতকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে র‍্যাট্রের বন্ধুত্ব হয়। ১৯১২ সালে হার্ভাডে ছাত্র থাকাকালে এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে।

(গ) **Quest কাগজ** : ইংলণ্ডের তত্ত্বজ্ঞানের সুবিখ্যাত পত্রিকা। তখন সম্পাদক ছিলেন রেভারেণ্ড জি. আর. এস. মীড। প্রভাতকুমার রবীন্দ্রজীবনীতে (২য় খণ্ড) জানাচ্ছেন— "সম্পাদক *** তাঁহাদের সমিতির তত্ত্বাবধানে কবির বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করিলেন। ছয় সপ্তাহে ছয়টি প্রবন্ধ ক্যাকস্টন হলে পঠিত হইল ; পরে সেগুলি 'সাধনা' (Sadhana–The Realisation of Life নামে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়।

(ঘ) **Mrs Moody** : মিসেস মুডি'র স্বামী উইলিয়ম ভন মুডি (১৮৬৯-১৯১০) চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন। কবি ও নাট্যকার হিসেবে অল্পবয়সেই খ্যাত হন। মাত্র ৪১ বছর বয়সে তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটে। স্বামীর মৃত্যুর বছর দুয়েক পরই মিসেস মুডির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়— রথীন্দ্রনাথ 'পিতৃস্মৃতি'-তে তার উল্লেখ করেছেন। প্রথম পরিচয়ের পর থেকেই মিসেস মুডি চিকাগো ও নিউইয়র্কে রবীন্দ্রনাথকে প্রয়োজন মতো আতিথ্যদান ও সেবাদ্বারা আপ্যায়িত করেন। সমসাময়িক বহু চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতী মুডির সেবাযত্নের কথা লিখেছেন। তাঁকেই উৎসর্গ করেছেন 'চিত্রাঙ্গদা'র অনুবাদ। রথীন্দ্রনাথ লিখছেন— "ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে জেনেছিলাম কেবল বাবা নন, খ্যাত-অখ্যাত বহু লেখক ও শিল্পীর তিনি ছিলেন অকৃত্রিম সুহৃদ। বিদেশী অভ্যাগতদের কাছে তাঁর বাড়ি ছিল আকর্ষণের বস্তু।"

পত্র : ২৮

(ক) **১৭ এপ্রিল** : ১৭ নয় ১২ এপ্রিল, পুত্র—পুত্রবধূ সহ রবীন্দ্রনাথ নিউইয়র্ক থেকে রওনা হন। ২৯ সংখ্যক চিঠি দ্রষ্টব্য।

(খ) **আমার ছ'টা প্রবন্ধ** : ছ'টি প্রবন্ধের কথা বলা হলেও প্রভাতকুমার যে তালিকা দিয়েছেন তাতে দেখা যায় প্রবন্ধের সংখ্যা আট—

১. The Relation of the Individual to the Universe. ২. Soul Consciousness. ৩. The Problem of Evil. ৪. The Problem of Self ৫. Realisation of Love ৬. Realisation of Action. ৭. Realisation of Beauty. ৮. Realisation of the Infinite.

(গ) **শিক্ষা ব্যবস্থার সম্বন্ধে** : সুদূর আমেরিকায় বসেও স্বদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার ভাবনা রবীন্দ্রনাথকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বিশেষ করে তাঁর বিদ্যালয়ের মঙ্গল চিন্তা। সেখানকার শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, নাম-করা বিদ্যালয় পরিদর্শন

করেছেন, টেকনিক্যাল স্কুল ল্যাবরেটরি ইত্যাদি স্থাপনের কথা ভেবেছেন, সাহিত্যপাঠের উপর গুরুত্ব দিতে বলেছেন। বিলিতি বই-ও পাঠিয়েছেন। এই সময়ে জগদানন্দ রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার প্রমুখকে লেখা চিঠিগুলিতে তাঁর শিক্ষাভাবনার অভিব্যক্তি দেখতে পাই।

(ঘ) **খানিকটা drawing** : দেবল শিখেছেন মূর্তিগড়া, কালীমোহন (সম্ভবত অর্থ উপার্জনের জন্যই) দপ্তরির কাজ এ খবর সন্তোষচন্দ্রকে জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ-ই। তার আগেই লিখেছেন— "দেবল যদি খানিকটা পরিমাণে সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার চর্চা করে যেতে পারে তাহলে দেশে গিয়ে ছোট ছেলেদের শিক্ষকতায় সেটা ওর কাজে লাগতে পারবে। ওই দুটো বিদ্যা সম্বন্ধে তোমার কাছে আমি কোনোদিন বেশি আশা করতে পারিনি— কালীমোহনের উপরেও ভরসা নেই।" এমনকি ওই একই চিঠিতে সরোজরঞ্জন চৌধুরীকে শারীর শিক্ষা শিক্ষণের জন্য বিলাত পাঠানোর কথাও বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ। সব মিলিয়ে তিনি বিদ্যালয়ের জন্য সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার কথাই চিন্তা করেছেন।

(ঙ) **ভাল সাহিত্যিকদের** : ১ মে, ১৯১৩ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন— "আমাদের কালীমোহন ইংরেজি শিক্ষায় যথেষ্ট কাঁচা হওয়া সত্ত্বেও এখানকার অনেক ভাল লোকের দলে মিশিতে পারিয়াছে এবং তাহাদের কাছ হইতে সকল বিষয়েই উপকৃত হইয়াছে।" (চিঠিপত্র-দ্বাদশ খণ্ড)

পত্র : ২৯

(ক) **Modern Review** : ১ মে, ১৯১৩ মডার্ন রিভিউ সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন— "Race Conflict প্রবন্ধটি আপনাদের ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। আমি যে ছয়টি প্রবন্ধ লিখিয়া প্রস্তুত করিয়াছি তাহার মধ্যে একটি Hibbert Journal ও একটি Quest পত্রিকায় দিয়াছি। এই দুই পত্রই Quarterly সুতরাং জুলাই মাসে বাহির হবেই। *** প্রথম প্রবন্ধটি Modern Review'র জন্য পাঠাইতেছি।

(খ) **Seriesটা** : ছয়টি বক্তৃতা— যা ইংলণ্ডে ক্যাক্সটন হলে পঠিত হয়েছে এবং- 'Sadhana' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

পত্র : ৩১

(ক) **সম্প্রতি পল্লীর কাজ** : ১৯০৭-৮ সালের পর দ্বিতীয় বার আবার পল্লী উন্নয়নের কাজে রবীন্দ্রনাথ ব্রতী হয়েছেন। এই দ্বিতীয় উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত পটভূমিকা হল আলোচ্য পত্রটি। এবারের পল্লীসংগঠন পরিকল্পনার বিশদ বিবরণ আছে সজনীকান্ত দাসের রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য গ্রন্থে। পল্লীসেবায় কবির তৎকালীন সহকর্মী অতুল সেনের প্রদত্ত তথ্য অবলম্বনে ওই বিবরণ রচিত। বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'পল্লী প্রকৃতি' গ্রন্থের ২৫০-২৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। সেখানে অতুল সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক চিঠিও উদ্‌ধৃত হয়েছে।

(খ) **অতুল** : পতিসর পল্লী সংস্কারের কাজের প্রধান উদ্যোক্তা।

(গ) **বিশু** : ডাঃ বিশ্বেশ্বর বসু। রবীন্দ্রনাথ সন্তোষচন্দ্রকে লিখেছেন—"আমি আবার একবার পল্লীর কাজে লেগেছি। এবার পতিসর প্রধান ভাবে কাজের ক্ষেত্র করা গেছে। বিশুর দল বল আমার সাহায্যে লেগেছে—বোধ হচ্ছে এবার চেষ্টা ব্যর্থ হবে না। কালীমোহনকে এই খবরটা দিয়ো সে খুশি হবে। আমি দীর্ঘকাল ভদ্রসন্তানদের শিক্ষা দিয়ে হাবুডুবু খেয়েছি। এবার চাষাদের সেবায় মন দিতে হবে। বোধহয় এখানে অনেক সহজে অনেক বেশী ফল পাব।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই স্বপ্নও ব্যর্থ হয়েছে। প্রভাতকুমার লিখছেন— "বৎসরকালের মধ্যে অতুল সেন সহ কর্মীরা ইংরেজ সরকারের রোষে পতিত হইয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য অন্তরায়িত ও নজরবন্দী হইলেন।" ফলে পল্লীসেবার কাজও অসম্পূর্ণ থেকে গেছে।

পত্র : ৩২

গোরা : ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রথম যুগের ছাত্র চন্দননগর থেকে আগত গৌরগোপাল ঘোষ (১৮৯৩-১৯৪০) ১৯১৭ সালে গণিত শিক্ষকরূপে শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ে যোগ দেন। খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় রূপে পরিচিত ছিলেন। শ্রীনিকেতন-প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে কৃষি বিভাগে বিজ্ঞান-শিক্ষক রূপে নিযুক্ত হন। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে আশ্রমসচিব-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসঙ্গী হয়ে কখনও গুজরাট, কখনও ইটালি গেছেন। "শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল ঘোষ সমবায় পদ্ধতিতে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য রোম নগরে অবস্থান করিতেছেন।" —এই খবর দেওয়া হয়েছে "শান্তিনিকেতন' পত্রিকার আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৩৩ সংখ্যায়। পরবর্তীকালে তিনি শ্রীনিকেতন-সচিব-এর পদে কাজ করেন।'

পত্র : ৩৩

ছবিওয়ালা কার্ডে বিজয়ার আশীর্বাদ পাঠিয়েছেন। বৃহত্তর ভারত ভ্রমণে জাভা ঘুরে সিয়ামে চলেছেন— পিনাঙ থেকে কার্ডটি লেখা।

পত্র : ৩৪

(ক) **নানাদেশ** : ২ মার্চ ১৯৩০ রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে ইউরোপ-ভ্রমণে যান। উদ্দেশ্য— চিকিৎসা— ভ্রমণ ও বিশ্রাম। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে ভ্রমণের ফলে সমবায়-সহ বিভিন্ন বিষয়ে বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। কোথাও বা তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

(খ) **কতকাল থেকে বলে আসচি** : ১৯০৪ সালে এদেশে সমবায়-আইন বিধিবদ্ধ হয়, আর সে-বছরই রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে দেশ গঠনের জন্য তাঁর পরিকল্পনা পেশ করেন। ওই প্রবন্ধে যে 'সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা'র কথা বলেছেন— তাই প্রকৃতপক্ষে সমবায় প্রথারই নামান্তর। সেই থেকে শুরু। তারপরে নানাভাবে নানাজনকে বিশেষ করে জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে সমবায় প্রথা অবলম্বনের জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। তাছাড়া প্রবন্ধ লিখেছেন, বক্তৃতা করেছেন। দ্রষ্টব্য— বিশ্বভারতী

প্রকাশিত পুস্তিকা— 'সমবায়নীতি'। শুধু বক্তৃতা বা প্রবন্ধ রচনা নয়— মনে রাখা দরকার ইউরোপে সমবায়ের কাজ দেখে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য ১৯২৬ সালে গৌরগোপাল ঘোষকে সেখানে পাঠিয়েছেন। (৩২ সংখ্যক পত্রের পরিচিতি দ্রষ্টব্য)

(গ) **জাগাতে পারলুম না** : এই আক্ষেপের সুর বর্লিন থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর নির্মলকুমারী মহালানবিশকে লেখা চিঠিতেও ধ্বনিত হয়েছে—(রাশিয়ার চিঠির পত্রসংখ্যা ৪)

যখন বোলপুরের কো-অপারেটিভ ব্যবস্থা বিশ্বভারতীর হাতে এল তখন আবার একদিন আশা হয়েছিল এইবার বুঝি সুযোগ হতে পারবে। যাদের হাতে আপিসের ভার তাদের বয়স অল্প, আমার চেয়ে তাদের হিসাবী বুদ্ধি এবং শিক্ষা অনেক বেশি। কিন্তু আমাদের যুবকেরা ইস্কুলে পড়া ছেলে, তাদের বই মুখস্থ করার মন। যে শিক্ষা আমাদের দেশে প্রচলিত তাতে করে আমাদের চিন্তা করার সাহস, কর্ম করবার দক্ষতা থাকে না, পুঁথির বুলি পুনরাবৃত্তি করার পরেই ছাত্রদের পরিত্রাণ নির্ভর করে। ***ইস্কুলে-পড়া মনের আত্মীয়তাবোধ পুঁথি-পোড়োদের পাড়ার বাইরে পৌঁছতে পারে না। যাদের আমরা বলি চাষাভূষো*** আমাদের সকল প্রচেষ্টা থেকে স্বভাবতই বাদ পড়ে যায়। তাই কো-অপারেটিভের যোগে অন্য দেশে যখন সমাজের নীচের তলায় একটা সৃষ্টির কাজ চলছে, আমাদের দেশে টিপে টিপে টাকা ধার দেওয়ার বেশি কিছু এগোয় না।

পত্র : ৩৫

'রাশিয়ার চিঠি'-তে ১৩ সংখ্যক পত্র-রূপে প্রকাশিত।

(ক) **সুরেনের চিঠিতে** : 'রাশিয়া চিঠি'র ৭, ১০, ১১ ও ১২-সংখ্যক পত্র চারখানি সুরেন্দ্রনাথ কর-কে (১৮৯২-১৯৩৫) লিখিত—এর মধ্যে ৭ এবং ১০ সংখ্যক পত্র-দুটিতে রাশিয়ার শিক্ষাবিধি প্রসঙ্গে আলোচনা আছে। "সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা" এই শিরোনামায় পত্র-দুখানি 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

(খ) **পরিত্রাণের রাস্তা রয়ে গেল** : রাশিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য যথেষ্ট অর্থবহ মনে হয়।

(গ) **লোভ-ই শেষ কালে জয়ী হোলো** : বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহ-ই আমেরিকা সফরের প্রধান কারণ। এমনকি বিলট্‌মোর হোটেল যে কবি-সংবর্ধনার আয়োজন হয়েছিল সেখানে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন শুধু কারবারী-ধনী লোকেরা, কোনো কবি-শিল্পী নয়। নিউইয়র্কের 'স্যাটারডে রিভিউ' (৬ ডিসেম্বর) ওই ভোজসভার উদ্যোক্তাদের সমালোচনা করে। কবির আক্ষেপ হায়রে এর মাঝে আমি কেন? কি পাপ করেছিলুম? বিশ্বভারতী? প্রায়শ্চিত্ত করে বিদায় নিতে পারলে বাঁচি। প্রতিপদে মনে হচ্ছে সত্যকে মিথ্যা করে তুলছি— সেই মিথ্যার বোঝা কি ভয়ঙ্কর!" (চিঠিপত্র ৩, পত্র ৩৭)

পত্র : ৩৬

কালীমোহন ঘোষের পদত্যাগ-পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি।

পত্র : ৩৮

পত্রটি তারিখহীন এবং আংশিক ছেঁড়া। তাছাড়া অসম্পূর্ণ।

(ক) **বর্তমান উৎপাত** : তৎকালীন বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদ বা উগ্রপন্থা-প্রসঙ্গে এই মন্তব্য বলে অনুমান হয়। এ-বিষয়ে ১, ৪, ৫ সংখ্যক পত্র এবং তাদের পরিচিতি দ্রষ্টব্য।

(খ) **ব্যাকুলতা জানাইয়া** : আগের বাক্যটি ছেঁড়া—তাই সঠিক পরিচিত দেওয়া সম্ভব হল না।

পত্র : ৩৯

৩১, সংখ্যক পত্রে যে 'পল্লীর কাজের'— উল্লেখ আছে তার সঙ্গে কালীমোহনবাবুও যুক্ত হয়েছেন।

(ক) **বিদ্যালয়** : শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কাজে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন।

(খ) **সবুজপত্র** : প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র'-এ তখন রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত এবং প্রধান লেখক।

(গ) **সুধাকান্ত** : সুধাকান্ত রায়চৌধুরী (১৮৯৫-১৯৩৫)। আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, শিক্ষক এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব। জীবনের শেষপর্বে শ্রীনিকেতনের জনসংযোগ আধিকারিক।

পত্র : ৪০

কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর (৭ অগ্রহায়ণ, ১৩১৪) রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ-বাসী হন— সেবার পৌষ উৎসবে অনুপস্থিত থাকেন। আর এই দ্বিতীয়বার (১৩১৮) রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে আছেন অথচ ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে অনুপস্থিত।

পত্র : ৪১

(ক) **Young সাহেব** : C. B. Young [?]-এর লিখিত চিঠির একটি পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ কালীমোহনকে লিখেছেন। ইয়ং সাহেবের সঙ্গে এণ্ডরুজ, পিয়ার্সন ও নিশিকান্ত সেনের পরিচয় ছিল— তা চিঠি পড়লেই বোঝা যায়। Young সাহেব তাঁর চিঠিতে শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয় পরিদর্শনের কথা লিখেছেন—আশ্রমিকদের বিশেষ করে কালীমোহনের প্রশংসা করেছেন।

(খ) **প্রমথ** : প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬ শান্তিনিকেতনের পাকশালার সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর যোগাযোগের আর একটি নিদর্শন ১৫ শ্রাবণ ১৩২১ রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখছেন— "নগেনের [জামাতা] কাছে জানা গেল এখানকার পাকশালা ও ভাণ্ডার

থেকে বিশৃঙ্খলতা দৈত্যকে খেদিয়ে দেবার জন্যে তুমি মহেন্দ্রকে [প্রমথ চৌধুরীর দেশস্থ কর্মী] পাঠাতে রাজি হয়েছ। তাহলে বড় ভাল হয়।"

পত্র : ৪২

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকদের কর্তব্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতামত এই চিঠিখানিতে ব্যক্ত হয়েছে।

কালীমোহনের জীবনে রবীন্দ্র-অনুষঙ্গ

১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে কালীমোহন ঘোষ সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হন তাঁর 'স্বদেশী সমাজ'-গঠন প্রস্তাবের কথা শুনে। ১৯০৬ সালে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন ও সাহিত্য-অধিবেশনে উভয়ে উপস্থিত থাকলেও তেমন যোগাযোগ হয়েছিল বলে মনে হয় না। কেন না অধিবেশন আয়োজনের আগেই নানাধরনের বাধা-বিঘ্ন ঘটায় রবীন্দ্রনাথ বিকেলে বরিশালে পৌঁছে রাত্রিটুকু সেখানে কাটিয়ে ফিরে আসেন শান্তিনিকেতনে—সাক্ষাতের সুযোগ না হওয়াই স্বাভাবিক। কালীমোহন ইতিমধ্যে পূর্ববঙ্গের বিশিষ্ট রাজনৈতিক যুবকর্মী-রূপে খ্যাত। ১৯০৮ সালের ১১-১২ ফেব্রুয়ারি পাবনায় আয়োজিত পূর্বোক্ত সম্মিলনে উভয়ের মধ্যে প্রকৃত সাক্ষাৎ ঘটে। মাত্র মাস তিনেক আগে ১৯০৭ নভেম্বরে রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রের অকাল মৃত্যু হয়েছে। শোকাহত কবি তখন গ্রাম কর্মী ভূপেশ রায়কে দায়িত্ব দিয়ে শিলাইদহ অঞ্চলে পল্লীপুনর্গঠন কাজের সূচনা করেছেন। পাবনায় ওই সাক্ষাতের পরই রবীন্দ্রনাথ কালীমোহনকে কাছে টেনে নিলেন—যুক্ত করলেন ওই কাজে। দায়িত্ব দিলেন কালীগ্রাম পরগণার। সমকালে ২৪ মার্চ (১১ চৈত্র) শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক অজিত কুমার চক্রবর্তীকে কালীমোহন প্রসঙ্গে সোৎসাহে লিখলেন "লোকপ্রেম বলে একটি জিনিস আছে সে এক একজনের স্বভাব সিদ্ধ—তার পক্ষে সেটা intellectual নয়, সেটা তার হৃদয়বৃত্তির অন্তর্গত। এরাই সম্পূর্ণ প্রাণ দিয়ে জনহিতের কাজ করতে পারে।*** এই রকম একটি পূর্ববঙ্গের ছেলে আমার কাছে এসেছে—এর পড়াশুনা অল্পই—কিন্তু এর মধ্যে প্রাণের শক্তি ভাবের শক্তি খুব বেশী। এ ছেলেটি এফ. এ পর্যন্ত পড়ে, পরীক্ষায় পাশ না দিয়ে পূর্ববঙ্গের সমস্ত গোলমালের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছে—এর শরীর নিতান্ত দুর্বল ও রুগ্ন। সাংসারিক অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়—কিন্তু এর মধ্যে ভাবের উদ্দীপনা অত্যন্ত সত্য—সেইজন্যে একে কিছুতেই প্রতিহত করতে পারেনি এবং সেইজন্যে এর মুখের কথায় চাষাভুষোরা পর্যন্ত উৎসাহিত হয়। নিজের শক্তির প্রতি এর একটা বিনম্র বিশ্বাস আছে—'পারব' কথাটা কখনোই ত্যাগ করে না। ঠিক এই type-এর লোক আমি সন্ধান করছিলুম—একে দেখে আমি খুবই আশান্বিত হয়েছি। এখন সেই ছেলেটিকে পূর্ববঙ্গের কোনো একটি পল্লীকে গড়ে তোলবার জন্যে পাঠাচ্ছি—এখানে তারই একটি অনুবর্তী লোক কাজ করচে।" উল্লেখ্য, সারাজীবন ধরে কালীমোহনবাবুও রবীন্দ্রনাথের 'অনুবর্তী' হয়ে থেকেছেন—পল্লীসংগঠনের কাজে ব্রতী হয়েছেন—নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেছেন।

কিছুকালের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের 'দেশহিত' প্রবন্ধ প্রকাশের পর তাঁর বক্তব্যেও বিরুদ্ধে সুরু হয় গুঞ্জন—সমালোচনা—কালীমোহনের মধ্যেও সংশয় দেখা দেয়—তিনি রবীন্দ্র-সমীপে প্রশ্নও তোলেন—রবীন্দ্রনাথ তাঁর উত্তরও দেন—(চার সংখ্যক রবীন্দ্র-পত্র দ্রষ্টব্য।)

১৯০৮-৯ খ্রিস্টাব্দে কালীমোহন-ক্ষিতিমোহন দুই বন্ধু ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রেণীভুক্ত হন।

১৯১০-এর গ্রীষ্মের ছুটিতে জগদানন্দ রায়—অজিতকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে কালীমোহনও শান্তিনিকেতনবাসী হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ৫০-তম জন্মোৎসবে ২৫ বৈশাখ সন্ধ্যায় অভিনীত 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে তিনি 'রামমোহনে'র ভূমিকায় নেমেছেন। ক্রমশ তিনি কবির ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছেন—শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে তাঁর দৌত্যগিরি করেছেন। কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদারের ভ্রাতা বামনদাসকে বিদ্যালয়ে নিয়োগ করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—যোগাযোগের ভার দিয়েছেন কালীমোহনকে। এ-ব্যাপারে ৮ ভাদ্র ১৩১৭ ক্ষিতিমোহনকে তিনি লিখছেন—"বামনদাস বাবুকে কালীমোহন যে পত্র লিখেছিল তার যে কি উত্তর পেলে আজ পর্যন্ত জানতে পারা গেল না।*** এমন লোকের দরকার যিনি বাংলা ভাষাটা কিছু কিছু জানেন। সেরকম লোক বাংলাদেশে খুব দুর্লভ।" অবশ্য কবির সে সাধ অপূর্ণ থেকে গেছে সেসময়।

সমকালে ১৯১০ ডিসেম্বর কালীমোহন স্ত্রী মনোরমা এবং ছমাসের শিশুপুত্র শান্তিদেবকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। কন্যা মীরাকে সে খবর দিচ্ছেন কবি—"এবার এখানে মেয়ে-বিদ্যালয় নেই। মেয়েদের মধ্যে কালীমোহনের স্ত্রী হচ্ছে নতুন আমদানী।" অন্য চিঠিতে জানাচ্ছেন—"কালীমোহনের স্ত্রী বেশ ভালো মানুষ—রোগীদের তথ্য প্রভৃতি তৈরির ভার সে এবং ডাক্তারের স্ত্রী নিয়েছে।"

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বস্ত হলেও একদা-বিপ্লবী কালীমোহনের ব্যাপারে পুলিশী-খবরদারী তখনও বজায় রয়েছে—শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে পুলিশের গুপ্তচরের আনাগোনা লেগেই আছে। সমকালে বিদ্যালয়ের মধ্যবিভাগের ছাত্রাবাস থেকে 'বাগান' পত্রিকা প্রকাশের প্রেরণাদাতা ছিলেন কালীমোহন। পত্রিকার ৪র্থ বর্ষের বার্ষিক সভায় জানানো হয় : "শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয় তখন 'বাগান' বাড়ির ঘরের ছেলেদের ভার লইয়া তাহাদিগকে সর্ববিষয়ে উৎসাহিত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত ছিলেন। উক্ত গৃহের সম্মুখে তিনি ছেলেদের নিজের হাতে বাগান করিতে শিক্ষা দেন। এই বাগানের গাছগুলি যখন বেশ বাড়িয়া উঠিল তখন তাহাদের মনের ক্ষেত্রে সাহিত্যের আর এক বাগানের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টায় ছিলেন।"—তার থেকে জন্ম হল 'বাগান' পত্রিকা। এইভাবে পুরোপুরি বিদ্যালয়ের কাজে নিযুক্ত হয়েছেন কালীমোহন।

এবার আসে ১৯১২-সালে তাঁর ইংলন্ড যাত্রার কথা। বিদ্যালয়ের শিশুবিভাগের দায়িত্বে ছিলেন কালীমোহন। তাঁর নিষ্ঠা, নৈপুণ্য, কর্মদক্ষতার পরিচয় পেয়ে শিশু ও বয়স্ক শিক্ষা সম্বন্ধে উচ্চতর জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিলাত পাঠাতে উদ্যোগী হন। শিশুশিক্ষা বিষয়ে অধ্যয়ন ও বিদেশের বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভই ছিল তাঁর বিলাত-যাত্রার উদ্দেশ্য। ১৯১২ জুলাই নাগাদ তিনি রওনা

হন এবং ফিরে আসেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৯১৩ সেপ্টেম্বরে। মূলত অর্থাভাবই এই স্বল্পকালীন বিলাত-বাসের কারণ। ইংরেজি সাহিত্যের একটি কোর্স নিয়ে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন তিনি। এ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে অনেক খবর পাওয়া যায়। কালীমোহন ছাড়াও হেমলতা দেবী এবং সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে লেখা চিঠিতে লক্ষ করা গেছে তাঁর উদ্বেগ। স্মর্তব্য, বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু-কিছু অর্থ সাহায্য পেয়ে ত আরো পাবার প্রতিশ্রুতি লাভ করে কালীমোহনবাবু ইংলন্ড যাত্রা করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র এবং বিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ দ্বিপেন্দ্রনাথকে কবি লিখেছেন : "কালীমোহনকে মাসে কুড়িটাকা সাহায্য করব বলে রেখেছিলুম।*** এখন সেই টাকাটা জোগানো আমার পক্ষে সহজ হবে না। তাই আমার প্রস্তাব এই যে, আমার বই থেকে যে-টাকাটা পাও তারই থেকে মাসিক ২০ টাকা ওকে সাহায্য করলে ওর কোনো কষ্ট হবে না। কালীমোহন বিদ্যালয়েই শিক্ষকতা করবে—অতএব ওকে যে সামান্য সাহায্য দেওয়া হবে বিদ্যালয় তার প্রচুর প্রতিদান পাবে। আমি ত আমার সামর্থ্যের চরমসীমায় এসেছি।" কথা ছিল যোগেশচন্দ্র ঘোষ পরিচালিত Association for the Advancement of Scientific and Industrial Education থেকে যাতায়াতের খরচ দেওয়া হবে সেটি সম্ভব না হওয়ায় কবির ওই প্রস্তাব।

এখানে কালীমোহনের ইংলন্ড-প্রবাস সম্বন্ধে রবিজীবনী লেখকের মন্তব্য উল্লেখ্য : কালীমোহন ঘোষ উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে ইংলন্ড রওনা হয়ে ৯ জুলাই কলম্বো এবং ৪ অগস্ট লন্ডনে পৌঁছিল। তিনি কোনো এক সূত্র থেকে আর্থিক সাহায্য পাবার আশ্বাস পেয়েছিলেন। তারই উপর নির্ভর করে তিনি তৃতীয় শ্রেণীর ডেক-প্যাসেঞ্জার হয়ে লন্ডনে গিয়ে মাসিক ৪৫ টাকার বিনিময়ে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। মিশুক প্রকৃতির কালীমোহন অল্পদিনেই অনেকের সঙ্গে সৌহার্দ্য গড়ে তোলেন। রোটেনস্টাইন তাঁকে মডেল করে ছবি আঁকতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ ১৬ অক্টোবর ১৯১২ হেমলতা দেবীকে লেখেন 'সে এখানে খুব সস্তা বন্দোবস্ত করতে পেরেছে। অবশ্য রোটেনস্টাইন দু'বছর ধরে ক্রমাগতই তার ছবি আঁকবে সেটা আমরা আশা করতে পারি নে। অতএব কোনো না কোনো সময়ে তাকে কিছু টানাটানিতে পড়তেই হবে। কিন্তু যদি সত্যই প্রশান্ত (মহলানবিশ) তাকে প্রতিশ্রুত টাকাটা পাঠিয়ে দেয় তাহলে ওর ওতেই চলবে।*** কালীমোহনের মধ্যে ভাল জিনিসকে পাবার একট অসীম ক্ষুধা আছে—এজন্য ওর মনের সমস্ত উদ্যম সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত হয়ে আছে।*** এই জন্যে বলচি কালীমোহনকে তোমরা যে পরিমাণে সাহায্য করছ ও তাকে বহুতর পরিমাণে সফল করে ফিরবে।" বিদ্যালয় থেকে তাঁকে মাসিক কুড়ি টাকা সাহায্য করা হচ্ছিল, কিন্তু প্রতিশ্রুত টাকা তাঁকে পাঠানো হয়নি জেনে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ দোসরা ডিসেম্বর হেমলতাকে লেখেন, 'কাল তার চিঠি পেয়ে জানলুম পুনর্বার সে প্রবঞ্চিত হয়েছে। পাঁচশো টাকা তাকে পাঠানো হয়েছে গুজব উঠেছে—কিন্তু এরকম গুজব পূর্বেও উঠেছিল এবং সে গুজব আজ পর্যন্ত সফল হয়নি। কেন যে তাঁর সম্বন্ধে এরকম নিষ্ঠুরতা করা হচ্চে আমি তা বুঝতে পারচিনে।' এই কারণেই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের যে কোর্স তিনি নিয়েছিলেন তা অসমাপ্ত রেখেই তাঁকে দেশে ফিরতে হয়। কিন্তু তাঁর 'মনের উদ্যম'

তাঁকে কী ধরনের কাজে প্রবৃত্ত রেখেছিল তার কিছু উদাহরণ পাওয়া যায় 40. West Moreland Road. Baywater. London W. থেকে ২৩ অক্টোবর লেখা কালীমোহনের পত্রে! "এখানকার শিশু শিক্ষাপ্রণালী দেখিবার জন্য আমি প্রতি সপ্তাহে দুই দিন শিশু বিদ্যালয়ে যাই। একটি বৃদ্ধা জার্মেন মহিলা কীণ্ডার গার্ডেন প্রণালীতে শিক্ষা দেন—সেখানে আমি তাদের শিক্ষাপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করি।"

১৯১২ এর ২৯ সেপ্টেম্বর ব্রিস্টলে রামমোহন রায়ের সমাধিক্ষেত্র দেখার জন্য কালীমোহন ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, সতীশচন্দ্র রায়, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার রায়, রথীন্দ্রনাথ এবং তারাপ্রসাদ চালিহার সঙ্গী হন। ২ অক্টোবর ১২, বিদ্যালয়ের শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন—কালীমোহন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে যে ইংরেজি ও সাহিত্যের কোর্স নিয়েছেন তা শেষ করতে পারলেই তাঁর বিদ্যালয়ে যেটুকু প্রয়োজন তা সাধন করতে পারবেন,—ডিগ্রি নেবার বৃথা চেষ্টা না করাই ভালো। ১৯১৩ জানুয়ারিতে কালীমোহনের সহযোগিতায় মধ্যযুগীয় ভারতীয় সন্ত কবীরের দোঁহা ইংরেজিতে অনুবাদ শুরু করেন কবি এজরা পাউন্ড। কবীর ও হিন্দি ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ পাউন্ড ক্ষিতিমোহন সেন—কৃত বাংলা অনুবাদের কালীমোহন-কৃত Crib (ছাত্রদের জন্য অনুবাদ) অবলম্বনে দশটি দোঁহার ইংরেজি অনুবাদ করেন। জুন ১৯১৩ Modern Review-তে 'Certain Poems of Kabir/Translated by Kalimohan Ghosh and Ezre Pound : From the edition of Mr. Kshitimohan sen শিরোনামায় তা মুদ্রিত হয়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে অজিত কুমার চক্রবর্তী—কৃত অনুবাদ ব্যাপক সংস্কারের পর ইভলিন আণ্ডারহিলের সহায়তায় ও ভূমিকাসহ One Hundred Poems of Kabir (১৯১৪) প্রকাশিত হয়।

সমকালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিখ্যাত ত্রৈমাসিক The Quest· পত্রিকার সম্পাদক রবীন্দ্রানুরাগী G.R.S Mead-এর পরিচয় ঘটিয়েছেন কালীমোহন। ১১ মার্চ ১৯১৩ রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন তিনি—"I was very pleased to learn from that nice boy K.M.Ghose, that you will lecture for us, on June 19, on 'The Realisation of Brahma. I am looking forward eagerly to make your personal acquintance on your return to England.*** May I say that the pages of the Quest are always open to you to say what you like? One of my dearest wishes is to make East and West better acquainted with each other." কেবল কোয়েস্ট-সম্পাদক মীড্ নন, সমকালীন ইংলন্ডের শিল্পী, সাহিত্যিক, ভাবুক সমাজের সঙ্গে কালীমোহনের গড়ে উঠেছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বিশেষ করে কবি ইয়েটস, এজরা পাউন্ড আর রোটেনস্টাইনের প্রীতিতে অভিষিক্ত হয়েছেন তার বিবরণ ভূমিকা ও চিঠিপত্র মিলবে। আর, বিদেশে বসেই রবীন্দ্র-প্রবাস বর্ণনা লিখতেন কালীমোহন—তাঁর 'বাগান' বাড়ির হাতে লেখা পত্রিকায়। রবিজীবনীকার লিখছেন ইংলন্ডে রবীন্দ্রনাথের গতিবিধি জানার জন্য ওই লেখাগুলির মূল্য অপরিসীম। যেমন একটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন প্রশান্তকুমার :

"৪ঠা মে রবিবার [২১ বৈশাখ] ৫টার সময় গুরুদেব Golden green এ Ernest Rhys এর বাড়ি গিয়াছিলেন। সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথ ও বৌদি [প্রতিমা দেবী] ছিলেন। আমারও নিমন্ত্রণ ছিল। রীজদের বৈঠকখানা ঘরের পিছন দিয়া ঘন স্নিগ্ধ সবুজ

ঘাসের একটি ছোট ক্ষেত। মিসেস রীজের অনুরোধে কবি স্বয়ং গীতাঞ্জলির কয়েকটি কবিতা পাঠ করেন। 'সে যে আসে, আসে, আসে' এইটির ইংরেজি (No 45) পাঠ করিয়া পরে বাংলার গানও করিয়াছিলেন। Ernest Rhys কে আমি একটি কবিতা পাঠ করিতে শুনিয়াছি। কিন্তু তার চেয়ে ঢের ভাল হয়েছিল কবির পড়া। তিনি পড়তেই ভাবে ডুবে যেতে পারেন এবং তাঁর উজ্জ্বল চোখ মুখের ভিতর দিয়া কবিতার সব রসটি ফুটে ওঠে। বাংলায় যখন গান করছিলেন ইংরেজ শ্রোতারা কিছুই বুঝতে পারছিল না। অথচ কবির চেহারার মধ্যে যে তন্ময়তা এবং সুরের মধ্যে এমন গভীর ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইতেছিল তাহাতেই শ্রোতারা মুগ্ধ হইতেছিল। দুঃখের বিষয় ৭টায় ডিনার মজলিস ভাঙ্গিতে হইল। Dr. Waldo নামে একজন শ্রেষ্ঠ সংগীতবিদ উপস্থিত ছিলেন। আরও ৬/৭ ভাগ অতিথি ছিলেন।" —উল্লেখ্য, Earnest Rhys ছিলেন Every man's Library Services এর সম্পাদক। রবীন্দ্রনাথের 'Sadhans [1913] এঁকেই উৎসর্গীকৃত।

আর এক 'বিলাতের পত্রে' কালীমোহন জানাচ্ছেন Bernard shaw বিখ্যাত নাটক লেখক—এদেশের। কবি তাঁর সঙ্গে ১৬ মে Cambridge যাবেন। তথাকার ভারতীয় ছাত্রগণ তাহাদের Indian Mejlis-এ কবিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। "শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র অরবিন্দমোহন বসু কবি-অনুরাগী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ তখন কেমব্রিজের ছাত্র, সম্ভবত তাঁরাই এই মজলিসের উদ্যোক্তা। অন্য একপত্রে কালীমোহন লিখছেন ঃ

"Mr. Robert Bridges (রাজকবি) Tennyson দলের শেষ কবি। তিনি গুরুদেবের বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিলেন। [ম্যানচেস্টার কলেজের বিশাল হলে] বক্তৃতার পর আবেগপূর্ণ ভাষায় গুরুদেবকে বলিলেন 'তুমি আমাদের ইংলন্ডের কবি সমাজকে নূতন প্রাণ দিয়াছ। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তোমার সঙ্গে handshake করতে এসেছি'।' আমার পুত্রটিকেও তোমার সঙ্গে handshake করতে এনেছি।"

অনুরূপভাবে কালীমোহনের লেখা থেকে জানা যায়—"New Theology আন্দোলনের প্রবর্তক এবং বর্তমান ইংলন্ডের মধ্যে একজন প্রধান চিন্তাশীল ধর্মযাজক" Sir Richard Stapley 9-May Chitra পাঠের আসরে সভাপতিত্ব করেছিলেন।

আগেই বলেছি অর্থাভাবের কারণে লন্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ অসমাপ্ত রেখেই কালীমোহন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হয়ে ৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৩ লিভারপুল থেকে জাহাজে ওঠেন স্বদেশের উদ্দেশে। নেপ্‌ল্‌স থেকে তাঁদের সহযাত্রী হন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী ও সুকুমার রায়। পথে উল্লেখ্য ঘটনা জনৈক মিশনারী ভারতীয়দের সমালোচনা করে ভাষণ দেন রবিবার সকালের উপাসনায়। সেখানে উপস্থিত কালীমোহন তা সহ্য করতে পারেন নি—উপাসনা শেষে তিনি তাঁর যোগ্য উত্তর দেন কঠোর ভাষায়। অত্যন্ত খুশি ও অভিভূত হয়ে রবীন্দ্রনাথ সে কথা জানিয়েছেন আমেরিকাবাসিনী শ্রীমতী মুডিকে। ২৭ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ সদল বলে বোম্বাই বন্দরে নামেন—২৯ সেপ্টেম্বর হাওড়া স্টেশন পৌঁছন। তাঁকে সংবর্ধনার জন্য উপস্থিত ছিলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শিল, মহা মহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সুসং-এর মহারাজা, কৃষ্ণকুমার মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রাচ্যবিদ্যার মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু, কালিদাস নাগ প্রমুখ। ঘন ঘন বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উঠতে থাকে। কালীমোহন ঘোষ ওই স্টেশন থেকেই বোলপুরের উদ্দেশ্যে রওনা

দেন—কবির ক্যাশবহিতে 'স্টেশনে কালীমোহন ঘোষকে দেওয়া যায় ১০ টাকা' হিসেব দেখে মনে হয় ওই পাথেয়র ব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথ-ই করেছেন।

শান্তিনিকেতন ফিরে কালীমোহন শিশুবিভাগের পরিচালক হন। স্মর্তব্য, বিলেতে থাকা কালে রবীন্দ্রনাথ কালীমোহনকে দশ পাউন্ড অর্থ সাহায্য করেছেন। সে খবর দিয়েছেন অজিত চক্রবর্তীকে— "এখানে বক্তৃতা দিয়ে আমি ৯০ পাউন্ড পেয়েছি ম্যাকমিলানরা বইয়ের হিসাবে আগাম ৩০ পাউন্ড দিয়েছে—এদিক ওদিক থেকে ছোটখাট বক্তৃতায় আরো ১০ পাউন্ড পেয়েছি। দশ পাউন্ড কালীমোহনকে দিয়েছি কেন না বিদ্যালয়ে থেকে অনেক দিন সে কিছু পায়নি।"

শুধু শিশুবিভাগের নয়, সেবা বিভাগের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সাঁওতাল বিদ্যালয়ের পরিচালক হয়েছেন কালীমোহন বাবু। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশ্রম কথায় বলা হয়েছে : "সাঁওতাল বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণের জন্য আশ্রমের অতিথিগণের নিকট হইতে এবার বিশেষ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। একজন অতিথি একশত টাকা দাম করিয়াছেন। দুইজন সাঁওতাল বালক আশ্রমে থাকিয়া অধ্যয়ন করিবার সুযোগ পাইয়াছে। চাঁদার অর্থ হইতেই তাহাদের ব্যয় নির্বাহিত হইবে।*** শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ ইহার ভার গ্রহণ করিয়া ইহার উন্নতি সাধনে বিশেষ উৎসাহী হইয়াছেন।

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪ মহাত্মা গাঁধী সস্ত্রীক প্রথমবার শান্তিনিকেতনে আসেন। রবীন্দ্রনাথ সেদিন উপস্থিত না থাকলেও বিশিষ্ট অতিথিদের সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা জানানো হয়। অভ্যর্থনাকারীদের মধ্যে ছিলেন কালীমোহন বাবুও। কিন্তু গোল বাধল মহাত্মার স্বাবলম্বন-কর্মসূচী নিয়ে। তাঁর আত্মকথায় গাঁধীজি লিখছেন—"আমার স্বভাব অনুযায়ী আমি বিদ্যার্থী ও শিক্ষকদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলাম। এন্ডরুজ ছিলেন, পিয়ার্সন ছিলেন। জগদানন্দবাবু, নেপাল বাবু, সন্তোষ বাবু, ক্ষিতিমোহন বাবু, শরৎ বাবু ও কালী বাবুর (কালীমোহন ঘোষ) সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঘনিষ্ট হইয়াছিল। আমি তাঁহাদের সঙ্গে আত্মনির্ভরতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলাম। বেতন ভোগী পাচকের পরিবর্তে যদি বিদ্যার্থী ও শিক্ষকেরা নিজেই রান্না করে তবে ভাল হয়। উহাতে পাকশালার স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য বিষয় শিক্ষকদের হাতে আসে, বিদ্যার্থীরা স্বাবলম্বী হয় এবং নিজের হাতে রান্না করার ব্যবহারিক শিক্ষাও লাভ করে। এই সকল কথা আমি শিক্ষকদের জানাইলাম। দুই একজন শিক্ষক মাথা নাড়িলেন। কাহারও কাহারও এই পরীক্ষা ভালো মনে হইল।*** এই বিষয়টি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত জানিতে চাওয়া হইলে তিনি বলিলেন, শিক্ষকেরা যদি রাজী হন তবে পরীক্ষা তাঁহার নিজের খুব ভালো লাগিবে। তিনি বিদ্যার্থীদিগকে বলিলেন—ইহার মধ্যে স্বরাজের চাবি কাঠি রহিয়াছে।"

শিক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ প্রবল উৎসাহে তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে ১০ মার্চ (বুধবার ২৬ ফাল্গুন) বিদ্যালয়ে নূতন কর্মসূচী সফল করতে পূর্ণোদ্যমে প্রয়াসী হয়েছেন সন্তোষ মজুমদার, নগেন গঙ্গোপাধ্যায়, অসিত হালদার, প্রমদা রঞ্জন ঘোষ, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, নেপালচন্দ্র রায়, —পিয়ার্সন, এন্ডরুজ তো ছিলেনই। কিন্তু কালীমোহন ঘোষ, জগদানন্দ রায়, শরৎ কুমার রায়ের প্রকল্পটি বাস্তব করে তোলার ব্যাপারে সংশয় ছিল—সংশয় ছিল রবীন্দ্রনাথেরও।

বিদ্যাভ্যাস ও শিক্ষণের ক্ষতি করে আশ্রমের যাবতীয় কাজে ছাত্র-শিক্ষকেরা সারাদিন নিযুক্ত থাকবেন—এই ব্যবস্থা তাঁর বাঞ্ছনীয় ছিল বলে মনে হয় না। তিনি জানতেন নূতনের মোহে কিছুদিন উৎসাহের সঙ্গে কাজে চলতে পারে কিন্তু জোর করে নিয়মের চাপে চেষ্টা করলে তা স্থায়ী হয় না। অন্তরের প্রেরণা যদি না থাকে বাইরের চাপে তা ব্যর্থ হয়—তাঁর এই বিশ্বাসের কথা মহাত্মাজিকে আলোচনা কালে তিনি বলেও ছিলেন। শান্তিনিকেতনের অনুরাগীরা সকলেই জানেন, গাঁধিজির ওই কর্মসূচী মাস দুয়েক চালু ছিল। তবে ১০ মার্চ দিনটি এখনও 'গাঁধি-পুণ্যাহ' অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে স্মরণ করা হয়।

১ সেপ্টেম্বর ১৯১৪ কালীমোহনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'বীথিকা' হাতে-লেখা পত্রিকার চতুর্থ জন্মোৎসব। কয়েকদিন আগে ৫ আগস্ট ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রে রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে 'বাগান' পত্রিকার পঞ্চম বার্ষিক জন্মোৎসব। "সভার বেদি প্রভৃতি আয়োজন বৈদিক প্রথানুসারে প্রস্তুত হইয়াছিল। শঙ্খধ্বনি, চন্দন, তিলক ধূপধুনা প্রভৃতির দ্বারা সমস্ত সভাগৃহ একটি গভীর ও পূত ভাব ধারণ করিয়াছিল।" 'বীথিকার' জন্মোৎসবেও বিজাতীয় অনুকরণ টেবিল চেয়ারকে বিসর্জন দিয়া আমাদের দেশীয় প্রমানুসারে মৃত্তিকা বেদি, আলপনা, চন্দন, ধূপধুনা, পদ্ম, পদ্মপর্ণ প্রভৃতি আমাদিগের দেশের প্রাচীন সভার পরিচায়ক চিহ্নগুলিকে বরণ' করে নেওয়া হয়েছিল। কালীমোহন সভাপতিরূপে একটি দীর্ঘপ্রবন্ধ পাঠ করেন—বিষয় 'জনসাধারণ শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে আমাদিগের কি কর্তব্য ও পল্লীসমূহের কি অবস্থা। এই ধরনের সভা-সমতিতে তিনি সব সময়ই ছাত্রদের উদ্‌বুদ্ধ করতেন। তাঁরই উৎসাহে কালিদাস দত্ত, জ্যোতিষচন্দ্র রায়, সুশীলচন্দ্র সেন প্রমুখ ছাত্রগণ পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। কালীমোহন পঠিত প্রবন্ধটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

সমকালে প্রথম মহাযুদ্ধ ঘটেছে। পড়ে গেছে পাটের দর, ফলে পাট চাষ নির্ভর পূর্ববঙ্গে প্রায় দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছে। বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র তখন পূর্ববঙ্গবাসী হওয়ায় 'দেশবাসীর সেই ভীষণ অবস্থা আলোচনা ও সেই বিষয়ে আমাদের কি করণীয়—তাহা বিচার করিবার নিমিত্ত' নেপালচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে ১৯১৪, ৮ নভেম্বর একটি সভা হয়। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কালীমোহনবাবু, শরৎকুমার রায় এবং পিয়ার্সন। এই উপলক্ষে খোলা হয় সাহায্য-তহবিল, দান-সংগ্রহের জন্য আবেদন পত্র প্রচারিত হয় পিয়ার্সনের নামে। শান্তিনিকেতনের জনহিতৈষী চরিত্রের পরিচয় মেলে এখানে। চিনি ব্যবহার না করে প্রতি মাসে ৪০ টাকা এবং ঘি না খেয়ে তিন মাসে ৫০০ টাকা ওই তহবিলে দান করার সিদ্ধান্ত নেয় ছাত্ররা। তাদের প্রস্তাব সমর্থন পায়নি রবীন্দ্রনাথের। কায়িক পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে উপার্জন করে তবে দান করতে হবে—এরকমই নির্দেশ তাঁর। ছাত্ররা তাই করেছে এবং পৌষ উৎসবের সময় বোলপুর স্টেশনে কুলির কাজ করে তহবিলে টাকা জমা দিয়েছে তারা।

দ্বিতীয় পর্যায়ে গ্রাম-পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে। ২৩ কার্তিক সন্তোষচন্দ্রকে লিখেছেন—"আমি আবার একবার পল্লীর কাজে লেগেছি।

এবার পতিসর প্রধানভাবে কাজের ক্ষেত্র করা গেছে।*** কালীমোহনকে এই খবরটা দিয়ো সে খুশি হবে।"

সাতদিন পরে ৩০ কার্তিক কালীমোহনকে তিনি নিজেই সে খবর দিলেন। (পত্রাবলীর ৩১-সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য।)

১৯১৫-এর ২৪ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতন আশ্রমের পঞ্চবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বার্ষিক সভা হয়। বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন সর্বাধ্যক্ষ জগদানন্দ রায়। তাতে জানান তিনি নিজে, নেপালচন্দ্র রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষিতিমোহন সেন, কালীমোহন ঘোষ ও সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ব্যবস্থাপক সভার [একালের কর্মসমিতি] সদস্য। এই চলতি বছরে তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। চারবছর সর্বাধ্যক্ষের পদে থাকার পর জগদানন্দ রায় অবসর নিলে নেপালচন্দ্র রায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। আদ্য বিভাগের অধ্যক্ষতায় ক্ষিতিমোহনের স্থানে জগদানন্দ, মধ্যে বিভাগে নেপালচন্দ্রের স্থানে ক্ষিতিমোহন ও শিশুবিভাগে কালীমোহন পুনর্নির্বাচিত হন।

১৯১৫-তেই আইরিশ কবি এ. ই লিখিত নাটিকা The King অভিনীত হয় ১৬ বৈশাখ চন্দ্রালোকে খোলা আকাশের নীচে। অভিনেতাদের দলে ছিলেন এন্ডরুজ,, পিয়ার্সন, সন্দোষচন্দ্র ও কালীমোহন—জানিয়েছেন সীতা দেবী।

১৯১৯-এর ১৫ এপ্রিল শিক্ষক সভায় রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁর বক্তব্যের অনুলেখন 'শান্তিনিকেতন'-পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ সংখ্যায় 'পন্থা'—শিরোনামায় প্রকাশ করেন কালীমোহন। এ-বছরেই পৌষ-উৎসবে ৯ পৌষ সকালে পরলোকগত আশ্রম বন্ধুদের স্মৃতিবাসরে সভাপতিত্ব করেন তিনি। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র মুক্তিদা-প্রসাদ বা মুলুর অকাল মৃত্যু ঘটে ৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৯। তাঁর স্মরণে পুস্তিকা প্রকাশে উদ্যোগী হন রামানন্দবাবু। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন "মুলুর সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা ও কালীমোহনের লেখাটি পুস্তিকায় গ্রহণ করিবেন।" কালীমোহনবাবুর লেখার নাম 'প্রসাদ' রবীন্দ্রনাথের রচনা 'ছাত্রমুলু''র সঙ্গে সঙ্গে ওই পুস্তিকায় স্থান পায় মুলুর সহপাঠী বিজয় কৃষ্ণ বাসু, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আশামুকুল দাস আর প্রমথনাথ বিশির 'মুলু' —শিরোনামে স্মৃতিমূলক রচনা।

শান্তিনিকেতন-পত্রিকার মাঘ, ১৩২৬ সংখ্যায় কালীমোহন-লিখিত '৭ই পৌষের মেলা' শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। তিনি লেখেন, এবারের মেলায় আশ্রমিকদের সঙ্গে জনসাধারণের সংযোগ স্থাপনের চেষ্টায় এমন একটি স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি হয়েছিল যা সম্পূর্ণই অভিনব। কীর্তনের আখড়া বাউলের গান, মন্দিরের গায়ক শ্যাম ভট্টাচার্য ও ছাত্রদের গান ছাড়াও মেলার এক প্রান্তে কৃষিবিদ্ শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার মহাশয় একটি গো-প্রদর্শনী খুলিয়া ছিলেন। ইলামবাজারের উৎকৃষ্ট গালার কারিগরেরা মেলার এক ধারে গালার দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী প্রদর্শন করছিল। আশ্রমের ছাত্ররা সমবায় ভাণ্ডার ও খাদ্য ভাণ্ডার খুলে নিজেরাই দ্রব্যাদি বিক্রয় ও বিশুদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করছিল। অল্পবয়স্ক এই বালকেরা নিজেরাই মূলধন জোগাড়, দোকানের ঘর নির্মাণ, ক্রয় বিক্রয় ও হিসাব রক্ষা ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করে।

১৯২০ ডিসেম্বরে পৌষ উৎসবে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ২১-তম বার্ষিক উৎসবে আয়োজিত সভায় বিধুশেখর শাস্ত্রী বিশ্বভারতীর প্রতিবেদন পাঠন করেন। সেখানেই কালীমোহন ঘোষ ও নেপালচন্দ্র রায় বলেন, আশ্রমের আদর্শ বাইরেও প্রচার ও বিস্তার করার প্রয়োজন আছে। সভাপতি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারী তাঁর অধিভাষণে বিশ্বভারতীর মূলগত আদর্শ এবং গুরুদেবের প্রচারিত আদর্শ যে কি তা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দেন। অবশ্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনী তৃতীয় খণ্ডে (পৃ-৯৪) জানাচ্ছেন : "দেশের কাজ করিবার জন্য নেপালচন্দ্র রায় ও কালীমোহন ঘোষ কিছুকালের জন্য আশ্রম হইতে দূরে চলিয়া যান।" ঠিক কখন তাঁরা গেলেন এবং কখনই বা ফিরে যোগ দিলেন তার কোনো তথ্য, কোনো জীবনীকারই দিতে পারেননি।

৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২ রবীন্দ্র-অনুরাগী কৃষিবিদ লেনার্ড নাইট এল্‌ম্‌হাস্টের পরিচালনায় গড়ে ওঠে শ্রীনিকেতন পল্লী সংগঠন বিভাগ। জীবনের অবশিষ্ট ১৮ বছর কালীমোহন নিযুক্ত থেকেছেন এই প্রতিষ্ঠানের কাজে। তিনি এর অন্যতম রূপকারও। প্রথমে নাম ছিল সুরুল কৃষি বিদ্যালয়। এল্‌ম্‌হার্স্টের প্রধান সহায়ক হয়ে ওঠেন কালীমোহন—নির্ভরযোগ্যও। রবীন্দ্রনাথের আস্থা তো বরাবরই ছিল। নানা চিঠিতে ও বক্তৃতায় তা স্বীকার-ও করেছেন কবি। তাঁর সহায়তা ব্যতিরেকে রবীন্দ্রনাথের পল্লী পুনর্গঠন পরিকল্পনা যে সফল হতে পারত না—তা সর্বজন স্বীকৃত। বস্তুত সে সময় রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনে তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব। কখনও পৌষ উৎসবে পরলোকগত আশ্রম বন্ধুদের শ্রাদ্ধসভার পৌরোহিত্য করেছেন, কখনও বা কেঁদুলির মেলায় শিক্ষক ছাত্রদের দল নিয়ে সমাজসেবার, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি কাজে ব্রতী হয়েছেন। পরববর্তী বছরগুলিতে কেবল শ্রীনিকেতন নয় বাংলাদেশের যেখানেই বন্যা বা দুর্ভিক্ষ দেখা গেছে সর্বত্রই কালীমোহন বাবুকে সেবাব্রতী কর্মীরূপে দায়িত্ব নিতে হয়েছে। তিনিই তখন রবীন্দ্রনাথের প্রতিনিধিরূপে সহৃদয়-সনিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছেন। বিশ্বভারতী পরিচালনার ক্ষেত্রেও সংসদের সদস্যরূপে কালীমোহন যথার্থ রবীন্দ্র-পরিকর হয়ে উঠেছেন।

কেবল বিশ্বভারতীর প্রতিনিধিত্ব নয়—১৯২২-এর পয়লা অগস্ট বিধুশেখর শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাল গঙ্গাধর টিলক মৃত্যু বাষিকীতে এন্ডরুজের সঙ্গে কালীমোহন-ও তাঁর চরিত্র ও দেশসেবা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করে 'টিলক-তর্পণ'-এ যোগ দিয়েছেন। সমকালেই সপরিবারে বসবাস আরম্ভ করেছেন শ্রীনিকেতনে। সেবার পৌষ মেলায় কালীমোহন বাবুর উদ্যোগে সংগৃহীত স্থানীয় পল্লিশিল্পের প্রদর্শনী সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সেখানে চাষী মেয়েদের হাতে বোনা মাদুর, পাখা, শিকে, কাঁথা ও মাটির ঘর-সাজাবার বিবিধ দ্রব্যাদি ছিল। পিয়ার্সন এই সব দ্রব্যাদির নির্মাতাদের যোগ্যতা অনুসারে স্বর্গীয় দ্বিপেন্দ্রনাথের নামে কয়েকটি পুরস্কার দেন।

১৯২২-এর ৬ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত "সুরুল কৃষি বিদ্যালয় বোর্ড অব ডিরেক্টর্স"-এর প্রথম আনুষ্ঠানিক অধিবেশন বসে ২৩ জুলাই ১৯২২। তাতে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এল্‌ম্‌হার্স্ট, এন্ডরুজ, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, ক্ষিতিমোহন

সেন, কালীমোহন ঘোষ, গৌর গোপাল ঘোষ, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও সুরেন্দ্রনাথ কর। পরবর্তী অধিবেশন হয়েছে যথাক্রমে ৬ অগস্ট, ৩ সেপ্টেম্বর, ৭ ডিসেম্বর, ২৯ ডিসেম্বর ১৯২২ এবং ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩। এই সব সভায় কালীমোহনের উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য। প্রধানত প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ব্যাপার-ই থাকত আলোচ্য বিষয় যেমন কর্মী নিয়োগ, ছাত্র-শৃঙ্খলা, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের কর্মসূচী, অবশ্যই আর্থিক সংস্থান, বিধি-রচনা, উপবিধি সংশোধন ইত্যাদি ইত্যাদি। বিশ্বভারতী-সংসদের সভ্য হিসেবেও কালীমোহন এই সময় থেকেই অধিবেশনগুলিতে যোগ দিয়েছেন। কৃষি বিদ্যালয়, যা কিছুকালের মধ্যেই পল্লীসংগঠন কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয় তার প্রধান কাজই ছিল গ্রামে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদির চর্চার দ্বারা অর্জিত অভিজ্ঞতা প্রতিবেশী গ্রামগুলিতে প্রয়োগ ও প্রচার করা। এই প্রকল্পে অগ্রণী ভূমিকা ছিল কালীমোহনের—ভুবন ডাঙা গ্রামে তা শুরুও করেছেন। সাঁওতাল নৈশ বিদ্যালয়ে সাঁওতাল শিক্ষক-ই নিয়োগ করেছেন—ওই শিক্ষকই আবার ছাত্রদের শিখিয়েছেন শ্রীরামপুরী তাঁতের কাপড় বোনাও। এই বিভাগের প্রচেষ্টায় সুরুলে খোলা হয়েছে একটি হাট। 'পার্শ্ববর্তী গ্রামের জনসাধারণের সহিত কেনাবেচার ভিতর' দিয়ে সুরুল-শান্তিনিকেতনের অধিবাসীদের লেনা দেনা চললে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠবে—এই ছিল উদ্দেশ্য। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ সেই আশাই ব্যক্ত করেছেন। বক্তৃতা করেছেন এল্‌ম্‌হার্স্ট ও জেলাশাসক ব্ল্যাকউড। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন কালীমোহন।

প্রতিবেশী শহর বোলপুরের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টা হয়েছে শ্রীনিকেতনের পক্ষ থেকে। ২৭ ফেব্রুয়ারি-১৯১৪ ওই উদ্দেশ্যে সেখানে আহুত হয়েছে জনসভা। সভাপতি কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ। পল্লী-সংস্কারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বলেন নেপালচন্দ্র রায়। ক্ষিতিমোহন সেন প্রাচীন ভারতের সমবায় পদ্ধতির কাজ কিভাবে হত তা বেদ ও পুরাণ থেকে নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝান। এল্‌ম্‌হার্স্ট-ও বলেন পল্লী সমবায় গঠন সম্বন্ধে। কালীমোহন ঘোষ প্রথমেই বোলপুরবাসীদের উৎসাহ-উদ্দীপনার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। তাঁর আশা বোলপুর অঞ্চলে রবীন্দ্র আদর্শ রূপায়িত হবে—ছাত্ররা সেবা ও ত্যাগের আদর্শে ব্রতী হবে। সমকালে প্রবল গ্রীষ্মাধিক্যের ফলে আশপাশের গ্রামে কলেরা দেখা দেয়। কালীমোহন ঘোষ ও তাঁর সহকর্মী ধীরানন্দ রায়ের নেতৃত্বে শ্রীনিকেতনের কর্মীরা সেবাকার্যে যোগ দিয়েছেন। 'এই রকম প্রায় ৩/৪টি স্থানে কলেরা -ফৌজ নিযুক্ত হয়েছে।' প্রাক্তন ছাত্র সুধাকান্ত রায়চৌধুরি হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসা শুরু করেন ওই এলাকায়—জেলা বোর্ড তাঁকে কলেরা চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত করে।

১৬ জুন, ১৯২৫ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অকাল মৃত্যু ঘটে দার্জিলিঙে। বিশ্বভারতীতে তখন গ্রীষ্মাবকাশ চলছে। ছুটি শেষে বিদ্যালয় খুললে ২৩ জুন অনাধ্যায় থাকে এবং শোকসভা আয়োজিত হয়। সেখানে দেশবন্ধুর নানামুখী কর্মজীবন ও বিস্ময়কর ত্যাগ মাহাত্ম্যের পর্যালোচনা করেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, চৈনিক অধ্যাপক লিম্, নেপালচন্দ্র রায় ও কালীমোহন ঘোষ।

১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথের ঢাকা-কুমিল্লা সফরে শুরু থেকে শেষ অবধি সহচর ছিলেন কালীমোহন বাবু। উদ্যোক্তা রমেশচন্দ্র মজুমদার, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিদাস

ভট্টাচার্য-এ ব্যাপারে পরামর্শ করেন তাঁরই সঙ্গে। যোগাযোগকারীর ভূমিকা তাঁকেই নিতে হয়েছিল। চারুচন্দ্রকে ৬ পৌষ [২১ ডিসেম্বর ১৯২৫] কবি লিখলেন—"আমার জন্যে অভ্যর্থনার বিরাট পর্ব করলে সইবে না, তাহলে শান্তিপর্ব ডিঙিয়ে একেবারে স্বর্গারোহণ পর্ব এগিয়ে আসবে। আমার সঙ্গে কালীমোহন যাবেন—আর ভাবছি নন্দলালকেও নেব—হয়ত আমাদের মুসলমান অধ্যাপক জিয়াউদ্দীনও যেতে পারেন। রথীরও যাবার ইচ্ছা আছে। অতএব সেখানে গিয়ে আমরা শান্তিনিকেতন পঞ্চায়েত বসাতে পারব।" ২৭ ডিসেম্বর ১৯২৫ তিনি রমেশচন্দ্রকে লেখেন ঃ "তাহলে এই কথাই পাকা রইল তোমার ওখানেই আশ্রয় নেব।*** আমার অভ্যর্থনার জন্য বিরাট আয়োজন কোরো না। জনতার পরিমাণ দিয়ে আমি আমার সম্মানের ওজন যাচাই করিনে। বাহ্য কৌতূহলের চেয়ে আন্তরিক শ্রদ্ধা আমার কাছে বেশি মূল্যবান। পূর্ববঙ্গের চিত্ত সরল ও সহজেই শ্রদ্ধাবান, এই ভরসাতেই সেখানে যাবার প্রস্তাবে আনন্দবোধ করছি।"

২৫ মাঘ আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে জানা যাচ্ছে "ঢাকায় রবীন্দ্রনাথের আগমন উপলক্ষে বেশ একটু দলাদলি ও কোলাহলের সৃষ্টি হইয়াছিল। তিনদিন ক্রমাগত বাক্‌যুদ্ধের পরে, তাহাতে শান্তির যবনিকা পড়িয়াছে। আমরা এই বিষয় লইয়া আর কোনো আলোচনা করিব না।"

এখানে উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথের এই সফরের বিবরণ ছাপা নিয়ে যে একটি প্রতিযোগিতা দেখা দিয়েছিল তার প্রমাণ রয়েছে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা কালীমোহন ঘোষের ২৬ জানুয়ারির পত্রে—ওই প্রতিযোগিতা হয়েছিল আনন্দবাজার ও বসুমতী পত্রিকার মধ্যে। কালীমোহন লিখছেন ঃ "বসুমতীর প্রচার পূর্ববঙ্গে খুব বেশি।*** বসুমতী টাকা দিতে প্রস্তুত আছে যদি গুরুদেবের বক্তৃতা অন্য কোনো বাঙলা কাগজে প্রকাশিত না হয়। তার Substance অন্য কাগজে দেওয়া যাইবে।*** কারণ গুরুদেব পূর্ববঙ্গে যে idea প্রচার করিবেন বসুমতীর সাহায্যে তাহা পূর্ববঙ্গের প্রত্যেক গ্রামে পৌঁছিবে এবং আনন্দবাজারকেও বাধ্য হইয়া সেই সুরে লিখিতে হইবে।"

এই প্রসঙ্গে উদ্যোক্তা এবং নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে যে চিঠি-বিনিময় হয়েছে—তার বিবরণ প্রশান্তকুমার পালের রবিজীবনী ৯ম খণ্ডে পাওয়া যাবে। তাছাড়া বিস্তৃত খবর মিলবে গোপালচন্দ্র রায়ের রচিত 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ'—গ্রন্থে।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ রবীন্দ্রনাথ সদল বলে রাত্রে ঢাকা মেলে কলকাতা থেকে গোয়ালন্দের উদ্দেশ্যে রওনা হন—সঙ্গে ছিলেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, নাতনি নন্দিনী, দিনেন্দ্রনাথ, মরিস, চিনা-অধ্যাপক লিম্‌ নো ছিয়াঙ, ইতালিয়ান অধ্যাপক ফর্মিকি ও তুচ্চি। কালীমোহন ঘোষ ও নেপালচন্দ্র রায় সম্ভবত আগে থেকেই ঢাকায় ছিলেন। এই স্মরণীয় সফরে রবীন্দ্রনাথ ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা হয়ে ত্রিপুরার আগরতলায় যান। —এই সফর সম্পর্কে উৎসুক পাঠক রবিজীবনীর ৯ম খণ্ডের ২৭৫-২৯২ পৃষ্ঠা দেখতে পারেন। তাছাড়া চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ : আনন্দবাজার পত্রিকা' ১ম খণ্ডের ৪৪৫-৪৮৬ পৃষ্ঠা।

বিশ্বভারতী পল্লী সেবা বিভাগের উদ্যোগে ১২ এপ্রিল ১৯২৫ যে ব্রতী সম্মিলনী হয় তাতে বীরভূম জেলার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে যোগ দিয়েছেন ২৪০ জন কর্মী—।

বীরভূমের জেলা বোর্ড সভাপতি অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মীদল সংগঠনের জন্য পল্লী সংগঠন বিভাগকে ধন্যবাদ দেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন কত ধনী কত বিদ্বান শান্তিনিকেতনে আসেন কিন্তু আজ তাঁর সর্বাপেক্ষা আনন্দ বীরভূমের সুদুর প্রান্ত থেকে পল্লী কর্মীরা সমবেত হয়েছেন। তাঁরা বিদ্বান নন, ধনীও নন কিন্তু তাঁরা সেবক। ওই অধিবেশনে জেলার বিভিন্ন সমিতিগুলির পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপনের জন্য এবং যাতে জেলার সর্বত্র আরো পল্লী সংস্কার সমিতি গঠিত হয়—এই উদ্দেশ্যে একটি জেলা সমিতি গঠিত হয়। তার সভাপতি, সহ সভাপতি, সম্পাদক, সহ সম্পাদক হন যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীমোহন ঘোষ এবং বিজয়চন্দ্র সরকার (কীর্ণাহার)।

৬ এপ্রিল শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী ব্রতীবালক সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আম্রকুঞ্জে অনুষ্ঠিত এই সম্মিলনে জেলার ১২টি কেন্দ্রের ৩০০ ব্রতীবালক উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হেতমপুরের মহারাজা বাহাদুর সত্য নিরঞ্জন চক্রবর্তী। পল্লীসেবা বিভাগের সম্পাদক কালীমোহন ঘোষ সকলের জ্ঞাতার্থে বলেন ব্রতীবালক-আন্দোলনের উদ্দেশ্যে। তাঁর আশা সর্বতোমুখী পরিপূর্ণতার আদর্শের মধ্যে ব্রতীবালকদের মনুষ্যত্ব জাগত হবে, কল্যাণের মন্ত্রে তাদের আত্মা প্রবুদ্ধ হবে।

৭ মে ১৯২৬ পল্লীসেবা কেন্দ্রের সম্পাদকরূপে আনন্দবাজার পত্রিকায় এক বিজ্ঞপ্তিতে কালীমোহন ঘোষ জানাচ্ছেন শ্রীনিকেতনে পল্লীর কর্মীদের পল্লী শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে। শিক্ষণের বিষয় কুটির শিল্প, প্রাথমিক চিকিৎসা, পল্লী সংগঠন ও ব্রতী সংগঠন। তেসরা জুনের মধ্যে আবেদনপত্র জামা দিতে হবে।

১২ অগস্ট ১৯২৭ কালীমোহন ঘোষের বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ১৫ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বর শ্রীনিকেতনে পল্লীসেবকদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হবে—শিক্ষণীয় বিষয়: কুটির শিল্প, পল্লী স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক চিকিৎসা, পল্লী-সমস্যা ও সমবায়-প্রণালী শিক্ষা, প্রাথমিক কৃষিশিক্ষা ও ব্রতী-সংগঠন। ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।

৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮ শ্রীনিকেতনের ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হয়েছে। প্রাতে আচার্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উৎসবের উদ্বোধন করেন। দ্বিপ্রহরে তাঁর সভাপতিত্বে ব্রতী-বালক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। নলহাটি, সিউড়ি, বোলপুর, রাইপুর থেকে ২১৫ জন ব্রতী উপস্থিত ছিলেন। বিকেল ৫টায় দীনবন্ধু এন্ডরুজের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ সভা। আশ্রম সচিব নেপালচন্দ্র রায় ও পল্লীসেবা বিভাগের সম্পাদক কালীমোহন ঘোষ 'পল্লীসমস্যা ও পল্লীর উন্নতির উপায়' সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

১২ এপ্রিল ১৯২৮ আনন্দবাজার পত্রিকায় 'বোলপুরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ' এই শিরোনামায় কালীমোহন ঘোষ প্রেরিত এক দীর্ঘ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। পল্লীসেবা বিভাগের সম্পাদক দুর্ভিক্ষের দুর্দশার বর্ণনা দিয়ে 'বীরভূমের সহস্র সহস্র হিন্দু মুসলমান ও সাঁওতাল শ্রমজীবীর জীবন রক্ষার জন্য সহৃদয় দেশবাসীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা' করেছেন। অধ্যক্ষ, শ্রীনিকেতন, বিশ্বভারতী—এই ঠিকানায় সাহায্য পাঠালে তার হিসাব প্রতি সপ্তাহে

আনন্দবাজারে প্রকাশ করার কথাও বলা হয়েছে। দুর্ভিক্ষ নিবারণী সমিতির সম্পাদক কালীমোহন এবং জগদানন্দ রায় হয়েছেন কোষাধ্যক্ষ।

৮ মে ২৫ বৈশাখ কালীমোহন প্রেরিত আনন্দবাজারের সংবাদ থেকে জানা যায় দুর্ভিক্ষ-নিবারণী সমিতির চেষ্টায় 'এ পর্যন্ত ন্যূনাধিক ৪০০০ টাকা সংগৃহীত হয়েছে'। এর মধ্যে শ্রীনিকেতন কর্তৃপক্ষ ১০০০, আচার্য রবীন্দ্রনাথ ১০০০, মাড়োয়ারি রিলিফ সোসাইটি ১০০০, নাম-প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক ইংরেজ [এন্ডরুজ?] ৫০০ এবং সমিতি ধান ভানবার ব্যবস্থার জন্য ৫০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন। কূপ-পুষ্করিণী খনন করা হচ্ছে পানীয় জলের জন্য, সেই সঙ্গে সেচ পুকুর-ও। বস্ত্রহীনদের জামা কাপড় বিতরণ করা হচ্ছে। কালীমোহনবাবু কোষাধ্যক্ষ জগদানন্দ রায়ের ঠিকানায় টাকা পাঠিয়ে 'বাধিত করবেন'—এই আবেদন জানিয়েছেন ওই সংবাদের শেষে।

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯ পল্লীসেবা বিভাগের উদ্যোগে শ্রীনিকেতনে বীরবংশী ও অন্যান্য অবনত সম্প্রদায়ের সম্মিলন হয়। সভাপতিত্ব করেন ক্ষিতিমোহন সেন। বীরভূম, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলা থেকে এসেছিলেন প্রতিনিধিরা। আশুতোষ মণ্ডল ও স্থানীয় নেতা নিশাপতি মাঝি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে স্বজাতীয়দের বক্তব্য প্রকাশ করেন। এরপর কালীমোহন ঘোষ প্রাণস্পর্শী বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে সকল পতিত জাতিকে কেমন করে পতনের মুখ থেকে উদ্ধার করতে হবে তা বিশদভাবে বুঝিয়ে বলেন। "৫ কোটি অবনত মানুষকে যদি আমরা কোলে তুলে না নিই তবে স্বরাজ আসবে না।" কালীমোহন বাবুর বক্তৃতার শেষে অবনত জাতির উদ্ধারের উপায় হিসেবে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১২ এপ্রিল ১৯২৯ শ্রীনিকেতন সচিব রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে বিনুরিয়া গ্রামে এক জনসভা হয়। বিনুরিয়া শ্রীনিকেতনের অদূরবর্তী গ্রাম। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির অধিবাসীরা উপস্থিত ছিলেন। কালীমোহন ঘোষ গ্রামের সমস্ত অভাব দূর করার ব্যাপারে সকলকে সমবেত ভাবে সচেষ্ট হবার অনুরোধ জানান। দশ-বারো জন সভ্যের একটি অনুসন্ধান কমিটি গড়া হয়—তাঁরা শ্রীনিকেতন কর্তৃপক্ষের কাছে অভাব-অভিযোগগুলি পেশ করবেন।

১৩ জুন ১৯২৫ জগদানন্দ রায়ের সভাপতিত্বে বীরভূমের সদর মহকুমার আনুমানিক দু'শো সাঁওতাল মোড়লের এক সম্মিলন হয় শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে। তাঁদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য কালীমোহনকে সভাপতি করে একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। শারীরিক অসুস্থতার জন্য কালীমোহন বাবু সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন নি। কিন্তু সম্মিলন শেষে আগত সাঁওতালরা সকলে তাঁর বাড়িতে যান এবং তাঁর কাছে অভাব-অভিযোগের কথা বলেন। কালীমোহন তাঁদের আশ্বাস দেন এবং জানান অসুখ থেকে সেরে ওঠার পর তিনি তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করবেন।

যিনি সাঁওতাল আদিবাসীদের দুঃখের কথা শুনছেন অসুস্থতার মধ্যে, প্রতিকারের জন্য অঙ্গীকার বদ্ধ তিনিই আবার রবীন্দ্র নাটক অভিনয়ে ভূমিকা নিয়েছেন। ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ জোড়াসাঁকো বাড়িতে অভিনীত হয়েছে। তপতী—নাটক।

আনন্দবাজারে প্রতিবেদনে তাঁর সেই অভিনয়ের উল্লেখও আছে। ২৭ সেপ্টেম্বর সেই প্রতিবেদন লেখা হয়েছে "পুরোহিত ভার্গবের ভূমিকায় শ্রীনিকেতনের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ বিশেষ অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন।"

৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ শ্রীনিকেতনের বাষিক উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত হয়েছে কলা-শিল্প-কারু প্রদর্শনী। উদ্বোধক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। বিশ্বভারতীর উদ্যোগে সেখানে পল্লী সংস্কারের যে প্রচেষ্টা চলছে, পল্লী সংস্কার বিভাগের অধ্যক্ষ কালীমোহন ঘোষ তার বিস্তৃত পরিচয় দেন ওই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। ডাঃ রায় তাঁর ভাষণে বলেন শ্রীনিকেতনের অধীনে যে-সব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কাজ করছে তাদের কর্মপ্রচেষ্টায় পল্লীসংগঠনের সর্বাঙ্গ সুন্দর কর্মপন্থা এবং আন্তরিক প্রয়াস সুপরিস্ফুট।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে এই প্রতিষ্ঠানের অতীত-ইতিহাস বিবৃতি কালে রবীন্দ্রনাথ বলেন—"যেদিন প্রথম ক্ষীণশক্তি শূন্য ভরসা নিয়ে এই কাজে নামলেম, তখন স্বদেশবাসীরা আমাকে সাহায্য করতে এলেন না। তাঁদের কাছে শুধু নিন্দার তীব্র বাক্য পেয়েছিলাম। সমস্ত নিন্দাকে মাথা পেতে নিয়ে একলাই দিনের পব দিন আমার সবকিছু দিয়ে, এই অনুষ্ঠানটির মধ্য দিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রাণ-সঞ্চার করবার চেষ্টা করেছিলাম। তখন কাউকে আমার পাশে পাইনি, **কেবল কালীমোহন তার রুগ্ন শরীর নিয়ে অন্তরে গভীর প্রেরণা ও সেবার উদ্যোগ নিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল**। যা দীন নিঃসহায়ভাবে, দেশের নিন্দা অপবাদ বিরুদ্ধতার মধ্যে দিয়ে ক্ষীণ দুর্বল হাতে আরম্ভ করেছিলাম তা বাইরের দিক দিয়ে না হলেও অন্তরের দিক প্রাণ সঞ্চার করছে—এই আমার আনন্দ। এখানে যাঁরা কর্মীরূপে আছেন তাঁরা তপস্বী, পল্লীসেবা করা তাঁদের জীবনের সাধনা।***"

এই উৎসব উপলক্ষেই আমন্ত্রিত আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদক লিখছেন : "সুরুল শ্রীনিকেতনের অধ্যক্ষ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব এবং বীরভূম অনুন্নত জাতি সম্মেলন উপলক্ষে আমাদিগকে আমন্ত্রণ করিলেন। 'অনুরোধ তাঁর এড়ানো কঠিন বড়ো'।*** রাত্রি ৮টার সময় বোলপুর স্টেশনে অবতরণ করিয়া দেখি, কালীমোহন বাবু সহাস্য বদনে দাঁড়াইয়া।*** কালীমোহন বাবুর কয়েকদিন অবসর নাই, সুরুল ও বোলপুর দিনের মধ্যে দশবার দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন। অতিথি অভ্যাগত প্রতিনিয়তই আসিতেছেন, তাঁহাদের সমস্ত ব্যবস্থা করার ভার লইয়াছেন, শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায় চৌধুরী। কালীমোহন বাবু আবার স্টেশনে গেলেন—রাত্রি ১০টার সময় কলিকাতার মেয়র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আসিবেন।*** [পরদিন] অপরাহ্নে কবিগুরুর দর্শনলাভের আশায় আমরা যাত্রা করিলাম।*** ছোট বারান্দায় আমরা বসিবার কিছুক্ষণ পরেই কবি আসিলেন। তাঁহার শরীর খুব ভালো নহে।*** তিনি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকার কথা হইতে মহাত্মাজী ও অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলনের কথা উঠিল। দীন-দরিদ্র, পতিত, অবজ্ঞাত জনমণ্ডলীর কথা বলিতে বলিতে কবির মুখমণ্ডল বেদনা ও করুণায় অপূর্ব হইয়া উঠিল। কি যে অনির্বচনীয় আন্তরিকতা ভাষায় বর্ণনা অসম্ভব। এই দুর্গতির প্রতিকার কল্পেই তাঁহার শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা—কত

বাধা, কত বিরুদ্ধ মনোভাবের মধ্য দিয়া তিনি সুদীর্ঘকালের চেষ্টায় কালীমোহন বাবু ও অপরাপরের একনিষ্ঠ সেবায় এই কর্ম প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়াছেন, সে কথা বলিলেন।***"

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ বোলপুরের বাঁধগড়ায় পল্লী সংগঠন সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সার্বজননী ভোজ ও জনসভা হয়। দরিদ্র গ্রামবাসীদের চেষ্টায় গ্রামের জঙ্গল নির্মূল হয়েছে, পাকারাস্তা তৈরি হয়েছে, নর্দমা কাটা হয়েছে পল্লীসেবা বিভাগের অক্লান্ত কর্মী ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে তাড়ানো হয়েছে ম্যালেরিয়া। অস্বাস্থ্যকর ডোবা বুজিয়ে শাক সবজির বাগান করা হয়েছে। স্থাপিত হয়েছেন ধর্মগোলা। কাটা হয়েছে সেচ পুকুর। গড়ে উঠেছে মহিলা সমিতি—পল্লীসেবা বিভাগের ননীবালা রায় সেখানে শেখাচ্ছেন কুটির শিল্প। কালীমোহন ঘোষ উন্নয়নের প্রতিবেদন শোনানোর পর বলেন সরকার বা জেলাবোর্ডের মুখাপেক্ষী না হয়ে গ্রামবাসীরা সংগঠন কার্যে যে-সফলতা লাভ করেছেন তা সমগ্র দেশের অনুকরণীয়।

শ্রীনিকেতন পল্লী সংগঠন বিভাগ ম্যালেরিয়া নিবারণ, শিক্ষা বিস্তার, উন্নত প্রণালীতে কৃষিশিক্ষা দান এবং গ্রামাঞ্চলে কুটির শিল্প প্রবর্তন কল্পে যে সব উদ্যোগ নিয়েছেন তা বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। ১৩ আগস্ট ১৯৩৪ বিভাগের বিভিন্ন সমিতির সদস্যদের এক সভায় ভারপ্রাপ্ত কালীমোহন ঘোষ পূর্বোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সংখ্যা-প্রমাণ সহ্যযোগে বক্তৃতা করেন। সূচনায় তিনি শ্রীনিকেতনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী, রথীন্দ্রনাথ, মিঃ ওয়ার্ডসওয়ার্থ (দ্য স্টেটসম্যানের সম্পাদক), সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (আনন্দবাজার পত্রিকা), ক্ষিতিমোহন সেন, প্রফুল্লকুমার সরকার (আনন্দবাজার পত্রিকা), প্রমোদকুমার সেন, এস. কে. লাহিড়ী, রবি রায়, এইচ ডি মজুমদার এবং বিধুভূষণ সেনগুপ্ত (ইউ.পি.আই)।

৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫ পল্লীসংগঠন বিভাগের বার্ষিক অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে সংগঠিত পল্লী সমিতিগুলির সদস্যদের সম্মিলন হয়। তাতে কালীমোহন ঘোষ বিশ্বভারতীর কার্যাবলী, পল্লীর অভাব অভিযোগ ও তা দূরীকরণের উপায় বর্ণনা করে ভাষণ দেন।

বোলপুর থেকে ২৩ অগস্ট ১৯৩৫ প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ ক্রমাগত বৃষ্টির ফলে অজয় নদীতে ভীষণ ভাবে জল বাড়তে থাকে। বোলপুর থানার পাঁচশোয়া অঞ্চলে বাঁধ ভেঙে প্রবল ভাবে বন্যার জল ঢোকে। নিকটবর্তী করিমপুর, হরিপুর, ইতণ্ডা, রসুলপুর সুলতানপুর এবং আরও বহুগ্রাম প্লাবিত হয়—গ্রামবাসী-রা বিপদগ্রস্ত হয়। বন্যার খবর পাওয়া মাত্র শ্রীনিকেতনের পল্লীসেবা বিভাগের অধ্যক্ষ কালীমোহন বাবু বন্যার্ত অঞ্চলে যান। বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ উৎসাহ সহকারে বন্যাপ্রপীড়িতদের অর্থ, খাদ্য ও বস্ত্র সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে। ইতণ্ডা গ্রামে বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে ত্রাণকেন্দ্র খোলা হয়। কালীমোহন বাবু পল্লীসেবা বিভাগের কর্মীগণ ও বিশ্বভারতীর কতিপয় ছাত্র সেই কেন্দ্র পরিচালনা করেছেন। বোলপুরের ব্যবসায়ী এবং দোকানদাররা অনেকেই অর্থ ও খাদ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। অর্থসংগ্রহে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন বোলপুরের উকিল ধূর্জটিদাস চক্রবর্তী। বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীরা দুশো টাকার বেশি সাহায্য জোগাড় করেছেন, চ্যারিটি ফুটবল ম্যাচের আয়োজনও করেছেন। রবীন্দ্রনাথ-ও

ব্যক্তিগতভাবে বন্যাত্রাণ তহবিলে একশো টাকা দান করেছেন। মাড়োয়ারি সমাজের নেতা শ্রীনিবাস পুরোহিত দশমণ চাল নিয়ে বন্যাপীড়িত অঞ্চলে উপস্থিত হয়েছেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় বিশ্বভারতীর উদ্যোগে ত্রাণের কাজ চলছে। ২০ আগস্ট বন্যার্তদের সাহায্যে বর্ষামঙ্গলের আয়োজন হয়েছে শান্তিনিকেতনে। তাতে যোগ দিয়েছেন নন্দলাল বসু, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ধীরেন্দ্রমোহন প্রমুখ।

৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬ পল্লীসংগঠন বিভাগের বার্ষিক অধিবেশন হয়। উদ্বোধন কালে রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আমি তোমাদের ভালোবাসি বলেই দেখতে এসেছি। তোমাদের দুঃখের লাঘবের জন্য কিছু করেছি এবং যথাসম্ভব আরও করব।" কালীমোহন ঘোষ শ্রীনিকেতনের উদ্দেশ্যে ও সেখানে যে কাজ চলছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ বক্তৃতা করেন।

২৯ এপ্রিল ১৯৩৬ শ্রীনিকেতন থেকে কিছুদূরে দেবগ্রামে জনসভা হয়। স্থানীয় গ্রামবাসীগণ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে পল্লী সংগঠন বিভাগের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন সেখানে। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী ৬টি গ্রামের অধিবাসীরাও। তাঁরা স্থির করেন বিশ্বভারতীর সহযোগিতায় দেবগ্রামকে কেন্দ্র করে তাঁরা নিজ নিজ গ্রামে গ্রামীণ সমিতি স্থাপন করবেন এবং একযোগে ম্যালেরিয়া দূরীকরণের আর কুটিরশিল্প পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করবেন। সেই সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনেরও। কালীমোহন ঘোষ আবেগপূর্ণ আবেদন জানিয়ে বলেন পল্লীবাসীরা যেন তাঁদের স্বার্থেই একযোগে কাজ করেন। তাঁদের উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা রচিত হয়েছে তার কোনো মূল্যই নেই—যদি না তাঁরা একযোগে এক প্রাণে কাজে যোগ দেন। বিশ্বভারতী যতদূর সাধ্য সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। তাঁর মতে মনের দারিদ্র্যই আমাদের জাতীয় জীবন নষ্ট করেছে। কালীমোহনবাবু তাঁদের এ-কথা স্মরণ রাখতে বলেন।

রবিবাসরের অধিনায়ক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে ১৪ মার্চ ১৯৩৭ রবিবার শান্তিনিকেতনে রবি-বাসরের অধিবেশন সমারোহে সুসম্পন্ন হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে সর্বাধ্যক্ষ জলধর সেনের নেতৃত্বে কলকাতা হতে চল্লিশজন সদস্য শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হয়েছিলেন। উত্তরায়ণে রবিবাসরের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাভঙ্গের পর সদস্যগণ মোটর যোগে সুরুল যাত্রা করেন। সেখানে শ্রীনিকেতনের কার্য কিভাবে অগ্রসর হচ্ছে তার বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী কর্মসচিব কালীমোহন ঘোষ এবং তাঁর সহকারীগণ সযত্নে বুঝিয়ে দেন। শ্রীনিকেতন পরিদর্শন করে ও সেখানকার সুনিয়ন্ত্রিত কাজকর্মের পরিচয়ে পেয়ে সদস্যগণ খুবই খুশি হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের উদ্দেশ্যে যে দীর্ঘভাষণ দেন তার পরিশেষে বলেন "*** আজ আপনারা কবি রবীন্দ্রনাথকে নয়, তাঁর কর্মের অনুষ্ঠানকে প্রত্যক্ষ করুন, দেখে লিখুন, সকলকে জানিয়ে দিন—কত দুঃসাধ্য কাজের ভিতর আমাকে জড়িয়ে ফেলতে হয়েছে।*** আমাকে এখানে আপনারা বিচার করবেন কবিরূপে নয়, কর্মীরূপে এবং যে কর্মের পরিচয় আপনারা এখনি [শ্রীনিকেতন পরিদর্শন] দেখতে পাবেন।***"

কবি রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে ২০ জানুয়ারি ১৯৩৯ ছাতিমতলায় এক স্মরণসভা হয়। কালীমোহন ঘোষ তাঁর সঙ্গে

দ্বিজেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা, দ্বিজেন্দ্রনাথের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, গভীর পাণ্ডিত্য ও শিশুবৎ সরলতার কথা বর্ণনা করেন। মহাত্মা গাঁধীর প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধার কথাও তিনি বলেন। স্বাধীন ও অখণ্ড ভারতের আদর্শ তাঁর জীবনের স্বপ্ন ছিল এবং তাঁর ধারণা ছিল যে মহাত্মা গাঁধী ওই স্বপ্ন সফল করবেন।

১০ মে, ১৯৪০ কালীমোহন ঘোষের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। সেই ঘটনায় মর্মাহত আনন্দবাজার পত্রিকা শোকপ্রকাশ করে যা লেখেন তা উদ্‌ধৃত হল—"শান্তিনিকেতনের প্রসিদ্ধ কর্মী এবং পুরাতন কংগ্রেস সেবক কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে আমরা আত্মীয়-বিয়োগ-বেদনা অনুভব করিতেছি। কালীমোহনবাবুর সঙ্গে আমাদের দীর্ঘকালের পরিচয়। তাঁহার ন্যায় নিরলস অক্লান্ত কর্মী আমরা কমই দেখিয়াছি। শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করিয়া সুরুলে যে পল্লীসংগঠন কার্যের প্রসার হইয়াছিল, কালীমোহন ছিলেন তাহার প্রাণস্বরূপ। কুটির শিল্প ও সমবায় প্রণালী সম্বন্ধে তিনি বাংলাদেশের মুষ্টিমেয় বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এবং ওই বিষয়ে অভিজ্ঞতালাভের জন্য হল্যান্ড, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনের উদ্যোগে বয়স্কদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের আন্দোলনের মূলেও তাঁহার কৃতিত্ব 'সামান্য' ছিল না। বীরভূম জেলায় কংগ্রেসের কাজে তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিতেন। তাঁহার ন্যায় সদানন্দ, সরলপ্রাণ, অতিথিবৎসল, অমায়িক প্রকৃতির লোক বর্তমান কালে দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথের তিনি পরম স্নেহের পাত্র ও আস্থাভাজন ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। [১৪ মে ১৯৪০ *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় প্রকাশিত।]

শান্তিনিকেতন-পত্রে কালীমোহন-প্রসঙ্গ

'শান্তিনিকেতন' আশ্রমের নিজস্বপত্রিকা। প্রকাশ কাল এপ্রিল, ১৯১৯। প্রথম সম্পাদক জগদানন্দ রায়। শেষ সম্পাদক প্রমথনাথ বিশী। সাতবছর বৈশাখ ১৩২৬ থেকে মাঘ ১৩৩৩ সংবাদবহুল পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। এতে রবীন্দ্রনাথের রচনা অজস্র থাকলেও আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত এমন লোকের রচনা পত্রিকার পাতা জুড়ে আছে। লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, কালীমোহন ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, প্রমথনাথ বিশী, তপনমোহন শর্মা, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, কালিদাস নাগ, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এই হল 'শান্তিনিকেতন' পত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।]

এখন-পত্রটিতে প্রকাশিত কালীমোহন অনুষঙ্গ বিবৃত হচ্ছে।

মাঘ, ১৩২৬। প্রথম বর্ষ দশম সংখ্যা : পৃষ্ঠা ১৩-১৪

কালীমোহন-লিখিত ৭ই পৌষের মেলা।

পৌষ, ১৩২৭। দ্বিতীয় বর্ষ নবম সংখ্যা : পৃষ্ঠা ৩৮

"ব্রহ্মচর্যাশ্রমের একোনবিংশ সাংবাৎসরিক উৎসব।... ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় যুক্তি প্রদর্শন করিয়া নিবেদন করেন যে আশ্রমের আদর্শ বাহিরেও প্রচার ও বিস্তার করার বিশেষ আবশ্যক রহিয়াছে।" [সম্ভবত, এই সময়ে উভয়েই কর্মসূত্রে শান্তিনিকেতনে অনুপস্থিত ছিলেন।]

মাঘ, ১৩২৮। তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা : পৃষ্ঠা ৫০

"৯ই পৌষ সকালে প্রচলিত প্রথামত আম্রকুঞ্জে পরলোকগত আশ্রমবাসীদের স্মরণ করিবার জন্য শ্রাদ্ধসভার অধিবেশন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ উপাসনার কার্য সম্পন্ন করেন।"

ফাল্গুন, ১৩২৮। তৃতীয়বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা। পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫

"কবিবর জয়দেবের জন্মভূমি কেঁন্দুলি তীর্থে প্রতিবৎসর পৌষ সংক্রান্তির সময় ৪/৫ দিন ধরিয়া মেলা হয়। মেলাতে ২৫/৩০ হাজার লোক হয়। আমাদের আশ্রম হইতে কয়েকজন অধ্যাপক ও ছাত্র গমন করিয়া চারদিন মেলাস্থানে তাঁবুতে বাস করিয়াছিলেন। যাহাতে অজয় নদীর উপরের দিক জল দূষিত না হয় তাহার জন্য আমাদের দল বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।... দোকানে জলখাবার খাইয়া লোকেরা যে সকল পাতা রাস্তা ও দোকানের আশে পাশে ফেলিয়া দেয় তাহা অচিরে পচিয়া স্বাস্থ্য হানিকর হইয়া ওঠে। সেগুলি আমাদের কলাবিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় ছাত্রদের লইয়া

ঝুড়ি করিয়া সরাইয়া ফেলিতেন। মেলার জল বিতরণের চেষ্টা সফল হয় নাই। রোজ সন্ধ্যায় ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা ও স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে ছায়াচিত্র দেখাইয়া শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুহৃদ কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিনায়ক মাসোজি প্রভৃতি বুঝাইয়া দিতেন, লোকে খুব উৎসাহের সঙ্গে শুনিত।...

৬ই মাঘ মহর্ষিদেবের সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধদিনে সকালে মন্দিরে আচার্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনা করিয়াছিলেন।... দ্বিপ্রহরে মাধবীকুঞ্জে মহর্ষিদেবের স্মরণসভা হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।... শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহর্ষিদেবের জীবনের মূলগত তত্ত্বটি ব্যক্ত করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিযাছিলেন।”

চৈত্র ১৩২৮। তৃতীয় বর্ষ। পৃষ্ঠা ৬১

“...শ্রীযুক্ত এল. কে. এলম্‌হার্স্ট মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সুরুলে কৃষি বিদ্যালয়ের কাজ নিয়মিত ভাবে আরম্ভ হইয়াছে।... শিক্ষাবিস্তার কার্যে সহায়তা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ সুরুলের কার্যে যোগ দিয়াছেন।

তিনি সুরুল গ্রামের অনাদৃত বিদ্যালয়ের পুনর্গঠনের চেষ্টা করিতেছেন এবং ইতিমধ্যে আশাতিরিক্ত ফল লাভ করিয়াছেন।

আষাঢ় ১৩২৯। তৃতীয় বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা। পৃষ্ঠা ৭৪

“কলিকাতা আশ্রমিক সংঘের একাদশ বর্ষ চলিতেছে। প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য কলিকাতাস্থ প্রাক্তন আশ্রমবাসীদের মধ্যে যোগ রক্ষা করা ও আশ্রমের আদর্শটিকে সকলের মধ্যে জাগাইয়া রাখা...। এই বর্ষের কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্য কালীমোহন ঘোষ।

ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২৯। তৃতীয় বর্ষ। অষ্টম-নবম সংখ্যা। পৃষ্ঠা ৮৭

“গত ২ আগস্ট লোকমান্য টিলকের মৃত্যু বাসরে... শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয় লোকমান্যের দেশবাসীর উপরে আশ্চর্য প্রভাব এবং তাঁহার অসাধারণ বিচক্ষণতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।”

অগ্রহায়ণ ১৩২৯। তৃতীয় বর্ষ, একাদশ সংখ্যা। পৃষ্ঠা ১০৩

“বিশ্বভারতী কৃষিবিভাগের পল্লীসেবা শাখার পরিচালক শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ এখন সুরুলে [শ্রীনিকেতনে] সপরিবারে বাস করিতেছেন।”

পৌষ ১৩২৯। তৃতীয় বর্ষ। দ্বাদশ সংখ্যা। পৃষ্ঠা ১০৬

‘মেলা প্রদর্শনী’ শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদে জানানো হয়েছে সুরুল পল্লী সংস্কারের কর্মী শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় শিল্প-প্রদর্শনী মণ্ডপে অনেক সুন্দর জিনিষ সংগৃহীত হয়। তন্মধ্যে চাষী মেয়েদের হাতের বোনা মাদুর, পাখা, শিকে, কাঁথা ও মাটির ঘর সাজানোর বিবিধ জিনিস বিশেষ ভাবে শিল্পকলানুরাগীদের চিত্ত আকর্ষণ করে।

চৈত্র ১৩২৯। চতুর্থ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা। পৃষ্ঠা ১১৯

“গত ১৪ চৈত্র বুধবার শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ সুরুল কৃষি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত সুরুলের নিকটবর্তী মোদপুর [মহিদাপুর] ও অন্যান্য গ্রামের বয়স্কা

উটদের [ব্রতীবালক] দলটি লইয়া আশ্রমে আসিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনের দলটিও বিশ্বভারতীর ছাত্র শ্রীমান বিনায়ক মাসোজির নেতৃত্বে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত ছিল। উভয় দলই নানারূপ ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শন করে।... প্রায় সব খেলাতেই সুরুলের দল জয়লাভ করে। এই ছেলেরা আশ্রমে দুই দিন ছিল। একদিন তাহাদের গান গাহিয়া শুনানো হইয়াছিল। অন্যদিন তাহাদের গ্রামোফোন বাজাইয়া ও ম্যাজিক লণ্ঠন দেখাইয়া আনন্দ দান করা হইয়াছিল।"

শ্রাবণ, ১৩৩০। চতুর্থ বর্ষ সপ্তম সংখ্যা। পৃষ্ঠা ১৩২

"আশ্রমের একদল বালক শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ভুবনডাঙা গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। বর্তমানে তাঁহারা গ্রামে নালা কাটিয়া জল নিঃসরণের চেষ্টা করিতেছেন।"

অগ্রহায়ণ, ১৩৩০। চতুর্থ বর্ষ একাদশ সংখ্যা। পৃষ্ঠা ১৪১

"আশ্রম হইতে তিনমাইল দূরে মুলুক নামে একটি গ্রাম আছে।*** সেই গ্রামে কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন একটি খুব বড় মেলা হয়। সেই মেলাটি বৈষ্ণব প্রধান। অন্যবার মেলাদর্শনার্থিনী মহিলারা বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। সেইজন্য সুরুল বিভাগের শ্রীযুক্ত কালীমোহন বাবু ও শ্রীমান ধীরানন্দ [রায়] তাঁহাদের দলবল লইয়া সেই মেলার সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য যান। বোলপুর সহর হইতেও একদল ভলান্টিয়ার তাঁহারা পাইয়াছিলেন।

শ্রাবণ ১৩৩১। পঞ্চম বর্ষ সপ্তম সংখ্যা। পৃষ্ঠা ১৬৬

"গত ফেব্রুয়ারী মাসে স্কাউটিং শিক্ষা দিবার যে বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার জমিদারী হইতে দুটি ছাত্রকে এখানে প্রেরণ করেন। ছাত্র দুটি নিজ গ্রামে ফিরিয়া গিয়া সর্বসমেত ৬টি গ্রামে সহায়ক-দল গঠন করিয়াছেন। গত জুলাই মাসে সুরুল হইতে শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ ও শ্রী ধীরানন্দ রায় তাঁহাদের কার্যাবলী পরিদর্শন করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছেন।"

পৌষ ১৩৩১। পঞ্চম বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা পৃষ্ঠা ১৮৬

গত ৭ ডিসেম্বর সুরুল পল্লী সংস্কার বিভাগের চেষ্টায় শ্রীনিকেতনে পল্লী সংস্কারক বিষয়ক জেলা সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় 'দুইশত ভদ্রলোক' যোগ দেন। তাছাড়া ছিলেন জেলাশাসক গুরুসদয় দত্ত, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু, নেপালচন্দ্র রায়, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায়বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণের পর মূল অধিবেশনের সভাপতি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। পল্লীসংগঠন সম্বন্ধে ভাষণ দেন কালীমোহন ঘোষ।

মাঘ ১৩৩১। ষষ্ঠবর্ষ প্রথম সংখ্যা। পৃষ্ঠা ১৯২

"কেন্দুলি মেলা। প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি জয়দেবের কীর্তিপীঠ কেন্দুলি মেলাতে এবার আশ্রমের অনেকেই গিয়াছিলেন।... শ্রদ্ধেয় কালীমোহন বাবুর সঙ্গে কয়েকজন বালক স্বেচ্ছাসেবক হইয়া গিয়াছিল। তাহারা সেখানে সুচারু রূপে কার্য করিয়াছে।"

ফাল্গুন ১৩৩১। ষষ্ঠ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা। পৃ-১৯৪

"গত ৬ই মাঘ মহর্ষিদেবের মৃত্যুদিবস উপলক্ষ্যে ...বড়দের সভায় সভাপতি ছিলেন পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ...শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন বাবু ও কালীমোহন বাবু এবং সর্বশেষে সভাপতি মহাশয় নিজ নিজ বক্তব্য প্রকাশ করেন।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২। ষষ্ঠ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা। পৃষ্ঠা ২০২

"দেশবন্ধুর আকস্মিক মৃত্যুতে আশ্রমবাসীগণ সকলেই সন্তপ্ত।... তাঁহার জীবনী আলোচনার নিমিত্ত সভায় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, চৈনিক অধ্যাপক লিম্, শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় দেশবন্ধুর নানামুখী কর্মজীবন ও বিস্ময়কর ত্যাগ মাহাত্ম্যের পর্যালোচনা করেন।"

চৈত্র ১৩৩২। সপ্তম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা। পৃষ্ঠা ২৩৪

রাইপুরের জমিদার 'অনারেব্‌ল্ অরুণচন্দ্র সিংহ' ...শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ ও কৃষিবিভাগের পরিচালক শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসুর সঙ্গে আলোচনার পর স্থির করেন তাঁর পিতা লর্ড সিংহ মহোদয়—প্রতিষ্ঠিত 'রাইপুর সিতিকণ্ঠ মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ে' প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর সংস্কার-সাধন 'বিশেষ প্রয়োজন।'... রাইপুর গ্রামখানি ম্যালেরিয়া প্রধান গ্রামে পরিণত হয়েছে।... পল্লীসংস্কার বিভাগের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মধ্যে মধ্যে "এখানে আসিয়া গ্রাম বাসিগণকে স্বাস্থ্য-রক্ষণ বিষয়ে মৌখিক উপদেশ দেন ও আলোকচিত্রের সাহায্যে স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়েও উপদেশ দিয়াছেন।"

ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৩৩। সপ্তম বর্ষ অষ্টম-নবম সংখ্যা। পৃষ্ঠা ২৪৭

গত ২৪ সেপ্টেম্বর পিয়ার্সনের মৃত্যু তিথি উপলক্ষে নেপালচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় 'পরলোকগত মহাত্মা সম্বন্ধে' শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভাষণ দেন। "আশ্রমের ছাত্ররা নিজে খাটিয়া পিয়ার্সন সাহেবের স্মৃতি রক্ষার জন্য একটি পথ তৈরি করিয়া দিয়াছে। সেই পথটির এই সভাতে উদ্বোধন হয়।"

শান্তিনিকেতন-পত্রে কালীমোহন-লিখিত রচনার তালিকা

১. আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৬ : মুক্তিদাপ্রসাদ [রামানন্দ-পুত্র] স্মৃতিচারণ।

২. মাঘ : ১৩২৬ : ৭ই পৌষের মেলা।

৩. বৈশাখ : ১৩২৭ : প্রাচীন ভারতে শ্রমজীবী সমস্যা।

৪. ভাদ্র : ১৩২৭ : বীরভূমের সাঁওতাল প্রতিবেশী।

৫. শ্রাবণ ১৩৩১ : বাউল গান (সংকলন)

৬. বৈশাখ : ১৩৩৩ : শ্রীনিকেতনের পল্লীসংগঠন বিভাগের প্রতিবেদন।

[*শান্তিনিকেতন-পত্র* সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য (পৃষ্ঠা সংখ্যা-সহ) কলকাতার 'রবীন্দ্র-চর্চা ভবন' প্রকাশিত সুপ্তি মিত্রের সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ থেকে সংগৃহীত।]

রবীন্দ্রনাথ ও কালীমোহন :
বিশ্বভারতী নিউজ থেকে

বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিকট-পরিচয়ের সর্বপ্রথম সুযোগ ঘটেছিল বিলাত থেকে ফেরার পর, ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে, পৈতৃক জমিদারী তত্ত্বাবধানের সূত্রে—"আমার যৌবনের আরম্ভকাল থেকেই বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের সঙ্গে আমার নিকট পরিচয় হয়েছে।" যে স্বজাতিকে তিনি এতকাল অনেকটা তত্ত্বত জানতেন, বস্তুত এই সময় থেকে তাদের দুঃখ-দারিদ্রকে, পল্লীজীবনের মানবসম্বন্ধের বৈচিত্র্যকে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পেলেন। এই সময় থেকে তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনের একটি বড়ো অংশ নিরবচ্ছিন্নভাবে পল্লীসমাজের হিতকল্পে নানা কর্মানুষ্ঠানে নিয়োগ করেছেন।

পরবর্তীকালে শ্রীনিকেতনে পল্লীসংগঠন বিভাগের প্রতিষ্ঠা করে (৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২২ খ্রীস্টাব্দ) তাঁর সুদীর্ঘকালের একটি ইচ্ছাকে কর্মে রূপায়িত করেছেন। 'অল্প বয়সে জীবনের যা লক্ষ্য ছিল শ্রীনিকেতনে শান্তিনিকেতনে তা সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হোক, সাধনার পথ অনেকখানি প্রশাস্ত করেছি।"—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির যথার্থতা অনস্বীকার্য।

শ্রীনিকেতনের কর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "আমাদের সব চেয়ে বড়ো কাজ শ্রীনিকেতনে। সমস্ত দেশকে কী করে বাঁচাতে হবে ওইখানে ছোটো আকারে তারই নিষ্পত্তি করা আমাদের ব্রত।" রবীন্দ্রনাথ সেদিনের কথা মনে রেখে লিখেছেন, "...এই সংকল্পে আমার সহায়তা করবার জন্যে সেদিন একটি মাত্র লোক পেয়েছিলুম, সে হচ্ছে কালীমোহন।"—'রাশিয়ার চিঠি,' পত্র ৪। ২৮.১১.১৯৩০

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে কালীমোহনের পরিচয় ১৯০৬ সালে বরিশালে অনুষ্ঠিত সাহিত্যসভায়। ১৯০৭ সালে কালীমোহন শিলাইদহে পল্লীউন্নয়নকর্মে রবীন্দ্রনাথের সহযোগীরূপে আত্মনিয়োগ করেন। ওই বৎসরই কালীমোহনকে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে পাঠান। এরপর তাঁর বাকি জীবন রবীন্দ্রনাথের আদর্শে পল্লীজীবনের উন্নতিকল্পে তিনি সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের পূর্বেই রবীন্দ্ররচনা-পাঠের মধ্যে দিয়ে দেশব্রতী রবীন্দ্রনাথের সম্যক্ পরিচয় কালীমোহন উপলব্ধি করেছিলেন। "যৌবনের প্রথম হইতেই বঙ্গদর্শনের ভিতর দিয়া আপনার নিকট হইতে দেশসেবার যে আদর্শ লাভ করিয়াছি—তাহার প্রেরণায় গভীর আনন্দে শ্রীনিকেতনের সেবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম"—কালীমোহন তাঁর জীবনের এক দুঃখের দিনে গভীর বেদনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে এ-কথা লিখেছিলেন।

কালীমোহন প্রথমবার উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা করেন ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর এই শিক্ষার অভিজ্ঞতা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মূল্যবান হবে এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়ভাবে অন্তরে পোষণ করেছেন। বিদেশে কৃচ্ছ্রতার মধ্যে কালীমোহনের দিনযাপনের সংবাদে রবীন্দ্রনাথ গভীর উদ্বিগ্ন হয়েছেন। এইসময় রবীন্দ্রনাথও বিদেশে, আশ্রমবিদ্যালয়ের পরিচালন-দায়িত্ব দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর ন্যস্ত। দ্বিপেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী হেমলতা ঠাকুরকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পত্রে কালীমোহন প্রসঙ্গ এখানে সংকলিত হল—৩০ আশ্বিন ১৩১৯ তারিখে আমেরিকা যাত্রার প্রাক্‌কালে লণ্ডন থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"...কালীমোহন পড়াশুনার যে রকম ব্যবস্থা করেচে এবং ভাল লোকদের সঙ্গে যে রকম মেলামেশার উদ্যোগ করতে পেরেছে তাতে বেশ বুঝতে পারচি কোনোমতে এখানে দুবছর কাটিয়ে যেতে পারলে ওর খুবই উপকার হবে— ও রীতিমত মানুষ হয়ে যেতে পারবে। ওর চেয়ে শিক্ষিত অনেক ছেলে এখানে আসে কিন্তু তারা এখানকার সমস্ত শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতেই পারে না। কালীমোহনের মধ্যে ভাল জিনিসকে পাবার একটা অপরিসীম ক্ষুধা আছে— এ জন্যে ওর সমস্ত মনের উদ্যম সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত হয়ে আছে। তোমরা দেখতে পাবে ও যখন ফিরবে তখন দেবল প্রভৃতির চেয়ে ঢের বেশি উন্নতিলাভ করে যেতে পারবে। তাই দেখ্‌তে পাচ্চি ওকে এখানে পাঠানোর সমস্ত চেষ্টা ও ব্যয় ষোলো আনা সার্থক হবে—অন্য কোনো ছেলে ধারে কাছেও লাগতে পারে না। দেবল প্রভৃতি ছেলের চিত্তের সেই অদম্য উদ্যম নেই এবং তাদের উচ্চ-আকাঙ্ক্ষা কালীমোহনের মত বিশিষ্ট এবং জাগ্রত নয়। এই জন্য বলচি কালীমোহনকে তোমরা যে পরিমাণে সাহায্য করচ ও তাকে বহুতর পরিমাণে সফল করে তবে ফিরবে। ওর সম্বন্ধে কাউকে কিছুমাত্র নিরাশ হতে হবে না, কারণ ওর নিজের শুভবুদ্ধিই ওর সকলের চেয়ে বড় সহায়— ও ভাল বলেই ওর ভাল হবে—সুবিধা পেয়েছে বলে নয়— আনুকূল্য ও প্রতিকূল্য সমস্তকেই ও আপনার সুহৃদ করে নিতে পারবে।..."

১ অগ্রহায়ণ ১৩১৯ আমেরিকার আর্বানা থেকে লিখিত পত্রাংশ—

"...কালীমোহনকে প্রশান্ত ৫০০ টাকা পাঠিয়েছেন শুনে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হলুম। তাঁর যে অভাব ছিল এতে সেটা সম্পূর্ণ কেটে যাবে বলে আশা করচি। তাহলে তুমি যে নিয়মে টাকা পাঠাতে চাচ্চ তা পাঠালে তাঁর কোনো অসুবিধা হবে না। কালীমোহন এই যে সকলের কাছ থেকে সাহায্য পেলেন এ তিনি সম্পূর্ণ সার্থক করে যেতে পারবেন। কেবল আমি একান্ত আশা করি লণ্ডনের শীতটা যেন তিনি সুস্থ শরীরে কাটাতে পারেন। এ পর্যন্ত তাঁর শরীর তো বো ভালোই ছিল—একটা সুবিধা এই যে সেখানে তিনি অনেক হিতৈষী বন্ধু পেয়েছেন—তাঁর পক্ষে এ রকম বন্ধু পাওয়া সহজ।..."

১৭ অগ্রহায়ণ [১৩১৯] আমেরিকার আর্বানা থেকে লিখিত আরেকটি পত্রাংশ—

"...এর আগে কালীমোহন আমাকে দুখানা চিঠি লিখেছে কিন্তু কি কারণে পাই নি। কাল তার চিঠি পেয়ে জানলুম পুনর্বার সে প্রবঞ্চিত হয়েছে। পাঁচশো টাকা তাকে পাঠানো হয়েছে গুজব উঠেছে—কিন্তু এরকম গুজব পূর্বেও উঠেছিল এবং সে গুজব আজ পর্যন্ত সফল হয় নি। কেন যে তার সম্বন্ধে এ রকম নিষ্ঠুরতা করা হচ্চে আমি

ত বুঝতে পারচি নে। যদি স্পষ্ট করে বলে ভুল হয়েছিল, মনে করেছিলুম টাকা দিতে পারব কিন্তু এখন দেখছি সেটা সম্ভব হবে না তাহলে বিশেষ ক্ষতি ছিল না। কালীমোহন লিখেছেন ডিসেম্বরের কোনো খরচ না পেয়ে তিনি ভারি মুস্কিলে পড়ে গেছেন। আশা করচি দেবলের কাছে যে টাকা আছে তাতে কালীমোহনের উপস্থিত খরচ চলে যাবে তার পরে টাকা এলে শুধে দিলেই হবে। রথী দেবলকে সেই রকম ভাবে লিখে দেবেন বলেছেন। এখানে বঙ্কিমের অবস্থা যে খুব সচ্ছল তা নয়—কিন্তু তার গায়ে জোর আছে—খেটে খেতে পারে, সকল কাজেই হাত দিতে জানে—তারপরে আমাদের বাড়িতেই আছে, এক সঙ্গেই খায়, আপাতত কোনো চিন্তার কারণ নেই। কালীমোহনের জন্যে আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আছে—যদি সম্ভবপর হত তাহলে আমি লন্ডনে চলে যেতুম কিন্তু এখানকার ব্যবস্থা উলটপালট করে দিয়ে যাবার মত সামর্থ্য ও সম্বল আমার নেই।..."

কালীমোহন প্রথমবার যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে বিদেশে যান, নানা প্রতিকূলতার মধ্যে তা সুসম্পূর্ণ করে ফিতে পারেন নি। কিন্তু বিদেশে থাকাকালীন যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন এবং যে-সমস্ত গুণীজনের সংস্পর্শে এসেছিলেন পরবর্তীকালে তাঁর কর্মজীবনকে তা নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। বর্তমান সংখ্যার অন্যত্র বিদেশে থাকাকালীন যে-সমস্ত বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর যোগ স্থাপিত হয় তাঁদের কয়েকখানি পত্র সংকলিত হয়েছে। স্বদেশে ফিরে শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করে তিনি চারপাশের পল্লীগ্রামগুলিকে সংস্কারসাধনের ব্রতে পুনরায় আত্মনিয়োগ করেন। পল্লীবাসী দরিদ্র কৃষকদের ঋণদান, বিভিন্ন সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা, ব্রতীবালকদল গঠন, স্বাস্থ্য-উন্নয়ন সমিতি ইত্যাদি সংস্কারমূলক কাজ, বল্লভপুর এবং রায়পুরগ্রাম-সমীক্ষা (পুস্তিকাকারে প্রকাশিত) তাঁর কর্মজীবনের সাক্ষ্য বহন করে। ৩০ মে ১৯৩১ সালে রবীন্দ্রনাথকে "পল্লীসংস্কারের ভাবী কর্মপদ্ধতি" জানিয়ে কালীমোহন যে পত্র রচনা করেন সেটি এই বিষয়ে তাঁর নিবিড় আন্তরিকতার পরিচয়রূপে সংকলিত হল—

কলিকাতা
৩০।৫।৩১ ইং

"শ্রীচরণকমলেষু

কলিকাতায় গত দশদিন ধরে শয্যাগত আছি। তাই জোড়াসাঁকো গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে পারি নাই।...

পল্লীসংস্কারের ভাবী কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আমি আপনার সহিত আলাপ করিতে চাহিয়াছিলাম—আপনার অসুস্থতার জন্য বিরক্ত করি নাই। অসুখের সময়ও আমি সে বিষয়ে চিন্তা করার অবকাশ পাইয়াছি। তাহাই আপনাকে নিবেদন করিব। আমার মতামত আমি পূর্বে চালাইবার বিশেষ চেষ্টা করি নাই। অনেক সময় মনে হইয়াছে তাহা আমি অন্যায়ই করিয়াছি। তাহার ফল ভাল হয় নাই আমার মনের ভাব আপনাদের জানান দরকার। যদি তাহা গ্রাহ্য না হয়, আমি আপনাদের নির্দ্ধারিত পন্থা মানিয়া চলিব। কিন্তু আমার মনোভাব আপনাকে ও রথীবাবুকে না জানান আমার পক্ষে অপরাধজনক, কারণ আমাদের চিন্তার সহিত পরিচয় না থাকলে আপনারা আমাকে convince করার সুযোগ

পাইবেন না। তাই আমার মনের ভাব আপনার চরণে নিবেদন করিবার ধৃষ্টতার জন্য মার্জনা ভিক্ষা করি।

ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের ভদ্র পরিবারে দারিদ্র্যের মধ্যে জন্মলাভ করিয়া কঠোর সংগ্রামে বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়েছে। সেজন্য সমাজের অবিচার অত্যাচারের দাগ এখনও অন্তরে জাগ্রত রয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের ৪ বৎসর ক্রমাগত গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। তখনও দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি যে আমাদের দুর্গতির মূল কারণ কোথায়? জনসাধারণের অসাড়চিত্তে কোনো নবীন ভাবধারা সঞ্চারিত করা এত কঠিন কেন? বল্লভপুর ও রায়পুরের পল্লী-পরীক্ষণের কার্যে ব্যাপৃত থাকার সময়ও এদের সমস্যাগুলির সম্বন্ধে যখন ভাবিতে হইয়াছে তখনই দেখিয়াছি—পল্লীসমাজের ধ্বংসের প্রধান কারণ আমাদের শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায় এবং ধনী মহাজন ও জমিদার তালুকদারগণের উদাসীনতা ও স্বার্থপরতা। পল্লীজীবনের যেটা organize unit সেটা শতধা বিচ্ছিন্ন। উহার প্রাণকেন্দ্র কোথাও খুঁজিয়া পাই না। এই প্রাণকেন্দ্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীনিকেতন। আমি অন্তত আপনার অভিপ্রায় ইহাই বুঝিয়াছিলাম।

সে উদ্দেশ্যে আমরা কতদূর অগ্রসর হইয়াছি তাহাই বিবেচ্য। যদি আশানুরূপ আমাদের কার্য অগ্রসর না হইয়া থাকে তাহার কারণ কি? এইসময় তাহা ভাল করিয়া পর্যালোচনা করিয়া সমগ্র কর্মপদ্ধতি revise করা উচিত। তাহা কি ভাবে করিলে ভাল সে সম্বন্ধে আমার এই মত—

আমাদের মধ্যে productive ও non-productive দুইটি বিভাগ আছে। প্রত্যেক বিভাগের কর্মীদিগকে অনুরোধ করা হউক, তাহারা যেন তাহাদের নিজ নিজ বিভাগের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে এক-একটি scheme গঠন করিবার সময় একথা মনে রাখিতে হইবে যে তাহাদের প্রত্যেক বিভাগের সহিত গ্রামের economic development-এর যোগ রাখিতে হইবে। গ্রামের cultivatorsদের সঙ্গে তাহাদের যোগসস্থাপন করিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের farm-এর কথাই উল্লেখ করিতেছি।

আমাদের দেশের গো-পালন অথবা সাধারণ চাষের উন্নতি সম্বন্ধে যে সকল সত্য বহুদিন হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কৃষকদিগের নিকট তাহা পৌঁছিয়া দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা নাই, অথচ Imperial Agri Council-এ ৪ বৎসরে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় নূতন নূতন research-এর জন্য। তার প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তার বেশী প্রয়োজন যে সত্যগুলি দীর্ঘকাল হতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলিকে কৃষকদের মধ্যে প্রবর্তন করা। আমার মনে হয় শ্রীনিকেতনের লক্ষ্য তাহাই। Prof. Ghosh. Mukherji অথবা Harxy Hamilton যে research করিবেন তাহার ইংরাজী report চাষার দরজায় পৌঁছিবে না। এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে তবে আমি সুরুলে Research Scheme support করিলাম কেন? আমাদের পক্ষ হইতে কোনো আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে না বলিয়া সমর্থন করিয়াছি।

যাহা হউক farm-এর sub-committeeতে আমি বিশেষরূপে অনুরোধ করাইলাম যে পাশের তিনটি গ্রামের Agri development-এর চেষ্টা করতে হবে। সন্তোষবাবু খুশি হয়ে সেই ভার নিয়েছেন। বেনুরী বল্লভপুর ও ভুবনডাঙায় সে চেষ্টা চলছে। সন্তোষবাবু

একটা ভাল scheme ও করেছেন। আমার বিভাগের কর্মিগণ তাহাকে সাহায্য করেছেন। ঠিক এইভাবে Industry & immediate relation with villagers-মনে রেখে industry বিভাগের scheme করতে হবে।

Education Department ও Village Works-এর সেইরূপ এক একটি পদ্ধতির খসড়া করতে হবে। কারণ আমরা কোন্ শ্রেণী হইতে ছাত্র চাই। গ্রামের কৃষক-সম্প্রদায় হতে না শিক্ষিত middle class হতে। আমরা কৃষিসম্বন্ধে শুধু practical কাজ শিক্ষা দিব, না theoratical class ও নিব—এ বিষয়ে অধ্যাপক ছাত্রদের মধ্যে স্পষ্ট ধারণা নাই।

Village Works Department-এর ও এইরূপ অনেক ত্রুটি আছে। আমি যে কর্মপদ্ধতি প্রস্তুত করিয়াছি তাহাতে এই বিষয় আলোচনা থাকিবে বলিয়া আমি আর এখানে উল্লেখ রাখিলাম না। প্রত্যেক বিভাগ হইতে যে schemeগুলি দেওয়া হইবে সেগুলি আলোচনা করিবার জন্য committee বসিবে। আসনের members-গণ ত থাকিবেনই। Dr. Ali ও সেগুলি বিশেষ করে scrutinise করিবেন। সেইসঙ্গে বাহির হইতেও দুইজন expertকে নিমন্ত্রণ করা উচিত, যাঁহারা Village Reconstruction Works নিয়ে নিজেরা হাতে-কলমে কিছু গড়েছেন। যথা, অভয়াশ্রম ও প্রবর্তক সঙ্ঘের চট্টগ্রাম-শাখা। অভয়াশ্রমের বস্ত্রশিল্প, Medical Mission, পল্লীশিক্ষার চেষ্টার অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে লাগবে এবং চট্টগ্রামে আমি যখন দুই বৎসর পূর্বে গিয়াছিলাম তখন প্রবর্তক সঙ্ঘের যে কাজ দেখিয়া আসিয়াছি তাহা ভালই লাগিয়াছিল। কুতুবদিয়া দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে পল্লীশিক্ষা ও কুটীরশিল্প প্রবর্তন করেছেন। কর্মিগণ সুশিক্ষিত ত্যাগী ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

আমি এ সম্বন্ধে পরে আরও লিখিব। রথীবাবুকে এ বিষয়ে আলাদা লিখিলাম না। অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে এই পত্র দেখাইবেন।

শান্তির পত্র পাইয়াছি, সে কোচিনরাজ্যের অন্তর্গত ত্রিচুরের নিকট এক পল্লীগ্রামে গিয়াছে। সেই গ্রামে ওদের folk dance শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। চিকিৎসার জন্য আরও চার পাঁচ দিন কলিকাতা থাকিতে হইবে, তারপর বোলপুর যাইব।"

পল্লীসংস্কারের যে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘকালের ইচ্ছাকে ফলবতী করার আদর্শ অন্তরে গ্রহণ করে কালীমোহন কর্মের জগতে প্রবেশ করেছিলেন, সেখানে নানা প্রতিকূলতা তাঁর জীবনে বার বার এসেছে। এখানে রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর যে পত্রটি মুদ্রিত হল সেটির একস্থলে তিনি লিখেছেন—"গভীর বেদনার সহিত আমার প্রতি আমি এই নিষ্ঠুর আঘাত করিতে বাধ্য হইয়াছি।"

সেই পত্রের পর, এর প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথের লিখিত পত্রটিও এখানে সংকলিত হল—

শ্রীচরণকমলেষু গুরুদেব

নিত্যনারায়ণকে আমি তিরস্কার করিয়া পত্র দিয়াছিলাম আপনার কথোপকথন 'নবশক্তি'তে প্রকাশ করিবার জন্য। সে অনুতপ্ত হইয়া যে পত্র লিখিয়াছে তাহা আপনার নিকট পাঠাইলাম।

আপনাকে আরেক দুঃখের সংবাদ দিতেছি। অদ্য প্রাতে আমি শ্রীনিকেতনের কর্ম্মে পদত্যাগ করিয়াছি। গভীর বেদনার সহিত আমার প্রতি আমি এই নিষ্ঠুর আঘাত করিতে বাধ্য হইয়াছি। যৌবনের প্রথম হইতেই বঙ্গদর্শনের ভিতর দিয়া আপনার নিকট হইতে দেশসেবার যে আদর্শ লাভ করিয়াছি—তাহার প্রেরণায় গভীর আনন্দে শ্রীনিকেতনের সেবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি গতবার মান্দ্রাজ হইতে ফিরে আসার পর হইতে যে অবস্থা হইয়াছে তাহা বিদুরিত হয় নাই। এখানকার influencial সহকর্ম্মীগণ বার বার কথাপ্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে আমি যেন তাহাদের কর্ম্মের পথে অন্তরায়। এই অবস্থায় অনেক বিবেচনার পর এই পদত্যাগপত্র দিয়াছি। যে অবস্থায়ই থাকি এবং যেখানে কার্য করি—আপনার আদর্শপ্রচারই আমার বাকি জীবনের কার্য হইবে।৭/৮ দিন পর কলিকাতা গিয়া আপনার সহিত দেখা করিয়া আমার বক্তব্য জানাইব।

অনুগ্রহপূর্বক এ বিশ্বাস রাখিবেন যে কোনো স্বার্থের জন্য যাচ্ছি না। কোথাও চাকুরীর চেষ্টাও করি নাই। গুরুতর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইবে এবং শান্তিনিকেতনের সহিত বাহিরের বিচ্ছেদও আমার প্রাণে গভীর বেদনা সঞ্চার করিবে। এ সব জানিয়াই এই দুঃখ বরণ করিতেছি।

এই জীবনসংগ্রামেও আপনার আশীর্বাদ ভিক্ষা করি। আপনার প্রতি আমার একনিষ্ঠ ভক্তি ও শ্রদ্ধা সম্বন্ধে বিশ্বাস রাখিবেন ইহাই একান্ত অনুরোধ। অন্যথায় সেই অবিশ্বাসের আঘাত আমার পক্ষে সহ্য করা কষ্টকর হইবে। ইতি

ভক্তিপ্রণত
কালীমোহন

কল্যাণীয়েষু

তুমি কাজে ইস্তফা দিয়েচ এ হতেই পারে না। তোমাকে কোনোমতেই ছুটি দিতে পারব না। তুমি গেলে চলবেই না। কার সঙ্গে তোমার কী অনৈক্য হয়েচে তা নিয়ে তুমি মন খারাপ করে এত বড়ো কাজ মাটি কোরো না। যারা তোমার মূল্য বোঝে না তাদের উপর আমি শ্রদ্ধা করতে পারি নে। যাই হোক দশজনে একসঙ্গে কাজ করতে হলে এরকম মনান্তর মতান্তর হয়েই থাকে, তা নিয়ে তুমি ক্ষুব্ধ হোয়ো না— জেনো তোমার উপর আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর আছে। তোমার কর্মত্যাগপত্র আমরা কিছুতে স্বীকার করব না। ইতি ২ মে ১৯৩৩

শুভানুধ্যায়ী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কালীমোহন ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে অকস্মাৎ শান্তিনিকেতনে পরলোকগমন করেন। রবীন্দ্রনাথ তখন কালিম্পঙে। এই নীরব লোকহিতব্রতীর কর্মজীবনকে শ্রদ্ধাঙ্কিত করে রবীন্দ্রনাথ শ্রীশান্তিদেব ঘোষকে যে পত্র দেন পরিশেষে সেটি সংকলিত হল—

কল্যাণীয়েষু

তোমার পিতার মৃত্যুসংবাদে গুরুতর আঘাত পেয়েছি। শান্তিনিকেতনে আসবার পূর্ব থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার নিকট সম্বন্ধ ঘটেছিল। কর্মের সহযোগিতায় ও ভাবের ঐক্যে

তাঁর সঙ্গে আমার আত্মীয়তা গভীরভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। অকৃত্রিম নিষ্ঠার সঙ্গে আশ্রমের কাছে তিনি আপনার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর আন্তরিক জনহিতৈষা শ্রীনিকেতনের নানা শুভকর কার্যে নিজেকে সার্থক করেছে। তাঁর মূর্তি আমাদের আশ্রমে এবং আমার মনের মধ্যে চিরদিনের মত প্রতিষ্ঠিত হয়ে রইল।

লোকহিতব্রতে তাঁর যে জীবন ত্যাগের দ্বারা পুণ্যোজ্জ্বল ছিল মৃত্যু তার সত্যকে খর্ব করতে পারে না এই সান্ত্বনা তোমাদের শান্তি দান করুক। ইতি ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮

শুভৈষী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেবানিবেদিত জীবন

ক্ষিতিমোহন সেন

১৯০৬ সাল! গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে আমার পিতৃভূমি বিক্রমপুর সোনারাং গ্রামে আসিয়া শুনিলাম এক দল স্বদেশী প্রচারক গ্রামে আসিয়াছেন। বৈকালে গ্রামে সভামধ্যে তাঁহাদের দেখিলাম। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বক্তা, আর কেহ কেহ গান করেন। সকলের মধ্যে দেখিলাম কালীমোহন ঘোষই যেন প্রাণস্বরূপ। শরীরের কিছুই নাই, অথচ উৎসাহে পরিপূর্ণ চিত্ত, তাহারই সাক্ষ্য দিবার উপযুক্ত দুইটি উজ্জ্বল চক্ষু। গ্রামের পুরন্ধ্রীরা এই প্রিয়দর্শন যুবকটিকে স্নেহে ও বাৎসল্যে একেবারে ঘরের ছেলে করিয়া লইয়াছেন। কালীমোহনের সঙ্গে আলাপ হইল। বড় ভাল লাগিল। দেখিলাম এই উৎসাহ-মাত্র-সম্বল যুবকটির শরীর শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন। একটু সেবা-যত্ন ও বিশ্রামের প্রয়োজন। গ্রামের মায়েরা সেবা ও যত্ন দিতে পারেন কিন্তু অবসর ও বিশ্রাম লইবার মত ধৈর্য্য কালীমোহনের নাই।

কালীমোহন বিক্রমপুরে আরও কয়েকটি গ্রামে ঘুরিবেন। আমি তখন রবীন্দ্র-কাব্য ও কবিতা অধ্যয়নে রত ছিলাম। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে বাংলা দেশে বেড়াইতে আসিয়া রবীন্দ্র-কাব্য লইয়াই দিনগুলি কাটাইতেছিলাম। আমি কালীমোহনকেও সেই কাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত করিতে চাহিলাম। কালীমোহন তাহাতে আনন্দে ধরাও দিলেন। কিন্তু বিক্রমপুরময় যে তিনি স্বদেশী প্রচার করিবেন সে উৎসাহ তাঁর গেল না। অবশেষে কয়েক দিন সোনারং ও আউটসাহী গ্রামে বিশ্রাম করিয়া তিনি আবার আমাদের গ্রাম হইতে বাহির হইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন।

এই দুইটি গ্রামের মায়েরা কালীমোহনকে ইতিমধ্যে ঘরের ছেলের মত করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারাও বাধা দিতে চাহিলেন। কালীমোহন এক দিন দারুণ রৌদ্রের মধ্যে মালখানগরের দিকে যাত্রা করিলেন। আমাকেও তাঁহার সঙ্গে লইয়া গেলেন। রবীন্দ্র-কাব্যের চর্চ্চা আমাদের চলিল কিন্তু তাঁহার বিশ্রাম চলিল না।

মালখানগরেও কালীমোহন দুই দিনে ঘরের ছেলের মতই হইয়া গেলেন। সেখানে শ্রীযুত চন্দ্রকান্ত বসুর বাড়ী তাঁহার নিজের বাড়ীর মতই হইয়া গেল। এই গ্রামবাসী লোকের উদারতা ও আভিজাত্য দেখিয়া আমরা সকলেই মুগ্ধ হইলাম। বিনা শিক্ষাতেও তখন বাংলায় মেয়েদের মধ্যে যে সহজ বুদ্ধি ও আভিজাত্য দেখিয়াছি তাহা এখন বলিয়া বুঝাইতে পারিব না।

এই গ্রামটিকে কেন্দ্র করিয়া তালতলা, মধ্যপাড়া প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামে কালীমোহন যাতায়াত করিতে লাগিলেন। স্বদেশী-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যচর্চ্চাও চলিয়াছে। প্রচারের সকল শ্রম ও ক্লান্তি মিটিত রবীন্দ্রনাথের কাব্যের দেশ-প্রেমে ও মানব-প্রেমে ভরপুর কাব্যের আলোচনায়।

কয়েক দিন পরে কালীমোহনকে বাধ্য হইয়া চাঁদপুরে ও তাঁহার স্বীয় গ্রাম বাজাপ্তিতে ফিরিতে হইল। ভাবিলাম এইবার হয়তো তিনি বিশ্রাম করিবেন। কিন্তু সেঁখানে আসিয়াও তিনি চাঁদপুর, হানারচর, বাবুর হাট, হরিণা, ফরকাবাদ, গোবিন্দিয়া, বাখরপুর, বালিয়া প্রভৃতি গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাজ করিতে লাগিলেন।

নরসিংপুর ষ্টেশন হইতে তাঁহার গ্রাম বাজাপ্তি তখন মাইল চারেক দূরে ছিল। পথ ও গ্রাম সবই অতি সুন্দর। দেখিলাম নিজের দেশের মধ্যেও কালীমোহনের পসার আছে। বাবুরহাটের বৃদ্ধ শিক্ষাগুরু সারদা দত্ত মহাশয়ও তরুণ কালীমোহনের অনেক নির্দ্দেশ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেন। কালীমোহনের বাড়ী ও গ্রামের লোকের সঙ্গে আমারও খুব ঘনিষ্ঠতা হইল।

তারপর আসিল আমার উত্তর-পশ্চিমে ফিরিবার সময়। ছুটিটা কালীমোহনের সঙ্গে কাটাইয়া একটি উৎসাহযুক্ত সেবা-নিবেদিত জীবন দেখিলাম। গ্রামের সহজ ও স্নেহময় একটি জগতের সঙ্গে পরিচিত হইলাম, তাই এক দিন দুঃখের সহিত বিদায় লইয়া সোনারং গেলাম ও সেখান হইতে কাশী গেলাম। কাশী হইতে আমাকে সুদূর পঞ্চনদ প্রদেশে কাশ্মীরের নিকটে হিমালয় প্রদেশে যাইতে হইল।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সঙ্গে কালীমোহনের যে পরিচয় করাইয়াছিলাম তাহার প্রতিদানে কালীমোহন আমাকে কি দিয়াছিলেন সেই কথাই এখন বলিতে হইবে। হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে আমার দিন যাইতেছে এমন সময় হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের এক পত্র পাইলাম—আমাকে তিনি তাঁহার শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কাজে আহ্বান করিয়াছেন। কবিগুরুর সঙ্গে তো আমার পরিচয় নাই। তবে এমন হইল কেমন করিয়া? যেমন করিয়াই তিনি আমার খবর জানুন না কেন, মোট কথা আমাকে শান্তিনিকেতনে গিয়ে যোগ দিতে হইল। ইহা ঘটিল ১৯০৮ সালে।

পরে জানিলাম কালীমোহন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে কাছে গিয়া তাঁহার কাছে জনসেবার কোন সুযোগ চাহেন। তখন শ্রীনিকেতনের জনসেবা-বিভাগ খোলে নাই, তবে শিলাইদহে আপন জমিদারিতে রবীন্দ্রনাথের জনসেবার কাজ ছিল তাহাতেই কালীমোহনের কাজের ক্ষেত্র রচনা করা হইল।* কালীমোহনই রবীন্দ্রনাথকে আমার কথা বলেন, এবং আমার পুরাতন বন্ধু ও কাশীর সতীর্থ শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্যও তাহা সমর্থন করাতে আমাকে শান্তিনিকেতনে আসিতে হয়।

কালীমোহন শিলাইদহে কাজ করিতে লাগিলেন। কাজের জন্য যতটুকু করা উচিত ততটুকু করিয়া তাঁহার মন মানিত না। তাহার ফলে তাঁহার দুর্বল শরীর একেবারে ভাঙিয়া পড়িল।

"একদা আমি পদ্মার চরে বোট বেঁধে সাহিত্যচর্চা করেছিলুম। মনে ধারণা ছিল, লেখনী দিয়ে ভাবের খনি খনন করব এই আমার একমাত্র কাজ, আর কোনো কাজের

আমি যোগ্যই নই। কিন্তু যখন এ-কথা কাউকে বলে-কয়ে বোঝাতে পারলুম না যে, আমাদের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষিপল্লীতেই তার চর্চার আজ থেকেই শুরু করা চাই, তখন কিছুক্ষণের জন্য কলম কানে গুঁজে একথা আমাকে বলতে হ'ল—আচ্ছা আমিই এ কাজে লাগব।

"এই সংকল্পে সহায়তা করবার জন্য সেদিন একটি মাত্র লোক পেয়েছিলুম, সে হচ্ছে কালীমোহন। শরীর তারে রোগে জীর্ণ, দু-বেলা তার জ্বর আসে, তার উপরে পুলিসের খাতায় তার নাম উঠেছে।

"তার পর থেকে দুর্গম বন্ধুর পথে সামান্য পাথেয় নিয়ে চলেছে সেই ইতিহাস।"

—'রাশিয়ার চিঠি', পৃষ্ঠা-২৮

তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে শান্তিনিকেতনে লইয়া আসিলেন। কালীমোহন এখানে আসিয়া অনেক কষ্টে সারিয়া উঠিলেন এবং এখানেই শিশুদের শিক্ষাকার্যে ব্রতী হইলেন। সেই সময়ে শান্তিনিকেতনে না আসিলে তাঁহার আর রক্ষা ছিল না। তবু বহু দিন পর্যন্ত কালীমোহনের শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই।

শিক্ষাকার্যে শিশুদের হৃদয় তিনি অনায়াসে জয় করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রধান আকর্ষণ ছিল জনসেবায়। চারি দিকের গ্রামের লোকের দুঃখকষ্ট অন্যায় অবিচারের কথা শুনিলে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিতেন না। ছাত্র-অবস্থাতেও তিনি এই সব কারণে লেখাপড়া বেশী দূর করিতে পারেন নাই। কুচবিহারে কলেজে আই.এ পড়িতে পড়িতেই তাঁহাকে কলেজ ছাড়িতে হয়। তবে ছাত্রদের মধ্যে সর্ববিষয়ে কালীমোহনই ছিলেন নেতা।

অনেক সময়ে শরীরের জন্য কালীমোহন গিরিধি প্রভৃতি স্থানেও থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন, তখন ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি তাঁহার গভীর আকর্ষণ হয়। স্বর্গীয় গুরুদাস চক্রবর্তীর কাছে তিনি ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষাও গ্রহণ করেন। পরবর্তী জীবনে মানুষের সেবাই তাঁহার প্রধান কর্ম হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতের প্রাচীন অধ্যাত্ম আদর্শের প্রতি তাঁহার পরিচয় ও শ্রদ্ধা দিন দিন গভীর হইতে ছিল।

লোকশিক্ষাব্রতে কালীমোহন ব্রতী হওয়াতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষার আদর্শের সঙ্গে পরিচিত করিতে চাহিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির যুগ। বহু ইংরেজ কবি ও লেখক রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ। তাঁহাদের মধ্যে কবিগুরু কালীমোহনকে পাঠাইলেন। কলেজে কালীমোহন বেশী অধ্যয়ন করেন নাই, তবু তাঁহার গভীর জ্ঞান-তৃষ্ণা ছিল। তাহা ছাড়া তাঁহার মধ্যে যে একটি প্রগাঢ় মানব প্রীতি ও সহজ প্রতিভা ছিল তাহার বলে তিনি বিলাতের বড় বড় পণ্ডিত ও সাহিত্যিকের সহিত অতি সহজেই ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। এজরা পাউন্ড, রটেনস্টাইন প্রভৃতির সঙ্গে কালীমোহনের গভীর যোগ স্থাপিত হইল।

কালীমোহন দেশে ফিরিয়া আবার শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিলেন। তাহার পরে যখন শ্রীনিকেতনে জনসেবার রীতিমত ব্যবস্থা হইল তখন কালীমোহনকে শান্তিনিকেতনের কাজ হইতে সেখানে যাইতে হইল। এই গ্রামসেবার কাজেই কালীমোহন আপন প্রতিভার স্বাভাবিক ক্ষেত্র পাইলেন। এই কাজে তাঁহার খ্যাতি সারা ভারতে

প্রচারিত হইল। বহু স্থান হইতে তাঁহার কাছে গ্রামসেবকেরা কাজ শিখিতে আসিতেন। এই ক্ষেত্রে তিনি নানা ভাবে নানা জাতীয় অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজেও দাঁড়াইয়াছেন ও প্রজাদিগকে দাঁড়াইতে শিখাইয়াছেন।

এক সময় রাজপুরুষের সঙ্গে তাঁহার নানা ভাবে বিরোধই চলিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে এই বিরোধের অবসান হইয়াছিল। পরবর্তী জীবনে কালীমোহন নানা শ্রেণীর রাজপুরুষগণের সঙ্গে মিশিয়া কাজ করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের সেবায় দুঃখদুর্গতি ও অস্বাস্থ্যের প্রতিকারে প্রজাদের কল্যাণার্থ তিনি বার-বার রাজপুরুষের সঙ্গে একযোগে কাজ করিয়াছেন। গ্রামসেবার কাজে রাজপুরুষদের সহায়তা কালীমোহন কম পান নাই।

নিজের সেবা ছাড়া কালীমোহন আর সবারই সেবায় আনন্দ পাইতেন। নিজের শরীরের যত্ন কখনও তিনি করিতে জানিতেন না। তাই কিছু দিন হইতেই তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছিল। প্রায়ই তিনি পাথরী রোগে কষ্ট পাইতেন। ইদানীং রক্তের চাপের জন্যেও মাঝে মাঝে তাঁহাকে শয্যাগত হইতে হইত। তবু নিয়মিত স্নানাহার তাঁহার পক্ষে করা কঠিন ছিল। গত বৎসরখানেক তিনি বাধ্য হইয়া কাজ হইতে অনেকটা অবসর লইয়াছিলেন।

এবার মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তাঁহার সঙ্গে যখন দেখা করিয়া ছুটিতে পূর্ববঙ্গে আসিলাম তখন কি বুঝিয়াছিলাম এই তাঁহার সঙ্গে শেষ দেখা? তিনি নিজেও কিছুই বুঝেন নাই। গত ১২ই মে বৈকালে তিনি বাহিরও হইয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া শ্রীনিকেতনের কর্মীদের সঙ্গে গ্রাম-সেবা বিষয়ে অনেকটা তর্কও করিলেন। কর্মীরা বিদায় নিতে না নিতেই কালীমোহন অসুস্থ বোধ করিলেন। স্ত্রীকে ডাকিলেন। ভৃত্য সত্যকে ডাকিলেন। দশ মিনিটের মধ্যে সন্ন্যাস রোগে তিনি পরলোকে প্রয়াণ করিলেন। আশ্রমে অনেকে বুঝিতেই পারে নাই যে কালীমোহন চলিয়া গেলেন। বোলপুর ও নিকটস্থ গ্রাম হইতে অনেকে আসিয়া শোকার্ত হইয়া তাঁহার অন্তেষ্টিতে যোগদান করিলেন। তিনি ছয়টি পুত্র ও একটি কন্যা ও স্ত্রীকেই যে কেবল অনাথ করিয়া শোকসাগরে ভাসাইয়া গেলেন তাহা নহে, আপন সকল আত্মীয়জনকে শোকশল্য হানিয়া গেলেন। তাঁহার মৃত্যুতে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন এক জন অকৃত্রিম সেবক হারাইল। দেশ এক জন কর্মী হারাইল। আমরা এক জন যথার্থ বন্ধু হারাইলাম।

(*প্রবাসী*, আষাঢ় ১৩৪৭।)

আমাদের শিক্ষক

ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা

শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে আজ সর্বত্র সুবিদিত। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে এই শান্তিনিকেতন কিন্তু অনেকের নিকটে রবিঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামে পরিচিত ছিল। তখনও জনসাধারণের নিকটে শান্তিনিকেতন নামটি প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র এই আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রথম থেকেই লেখাপড়া করতে আসত। ১৯১১ সালে পূজার ছুটির শেষে সেই সব ছাত্রদের সঙ্গে আগরতলার থেকে আমার বড় ভাই ও আমি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ভর্ত্তি হবার জন্য এসেছিলাম। শালবীথির পাশে বীথিকাগৃহ ও দেহলীর সংলগ্ন পশ্চিমে 'নতুন বাড়ি'র গৃহগুলিকে নিয়ে তখন শিশুবিভাগের ছাত্রাবাস ছিল। বয়স অল্প থাকায় বীথিকাগৃহে আমি স্থান পেলাম। প্রত্যেক ছাত্রাবাসে দু'একজন করে বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ বাস করতেন। সপরিবারে বাস করবার তখনও কোন ব্যবস্থা ছিলনা। একমাত্র তার ব্যতিক্রম দেখেছিলাম অধ্যাপক জগদানন্দ রায়ের বেলাতে, তিনি আশ্রমের মধ্যে খড়োচালা দুইটি মাটির গৃহ ও তার চার দিকে মাটির পাঁচিল ঘেরা একটি বাড়িতে সপরিবারে বাস করতেন। শিশু বিভাগের বীথিকা গৃহের গৃহাধ্যক্ষ তখন শ্রদ্ধেয় কালীমোহনবাবু ছিলেন। আমরা যারা ছাত্র ছিলাম তাদের প্রত্যেকের সম্পত্তির মধ্যে ছিল বিছানা এবং জামা কাপড় রাখবার জন্য একটি করে বাক্স এবং পড়ার বই, খাতাপত্তর ইত্যাদি। অধ্যাপকদের সম্পত্তির তালিকায় ছাত্রদের চেয়ে খুব একটা বেশি কিছু ছিল না, তবে বই, পত্তর হয়ত কিছু বেশি থাকতো। ভেবে অবাক হই জিনিষ পত্রের বাহুল্যহীন জীবন তাঁরা তখন কি করে অতিবাহিত করতেন। যেমনি তাঁরা আদর্শবাদী ছিলেন তেমনি আশ্রমবাসের উপযুক্ত ছিলেন। আগরতলার বিদ্যালয়ে যখন পড়তাম তখন লক্ষ্য করেছিলাম শিক্ষক ছাত্রকে অনেক সময় পড়ার নাম করে বেত্রাঘাত করতেন। শান্তিনিকেতনে এসে জানতে পারলাম এখানে শিক্ষার জন্য কোনো প্রকার মারধোর করা হয় না। ছাত্রদের লেখাপড়া করার সঙ্গে ছবি আঁকা, গান গাওয়া শেখানো হয়। আশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সরল জীবন, ছাত্রদের প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসা তাঁদের সুন্দর আচরণে তখন মুগ্ধ হয়েছিলাম, মনে হয়েছিল যেন ভিন্ন জগতে এসে পড়েছি।

ছোট বয়স থেকেই আমার ছবি আঁকার প্রতি ঝোঁক ছিল। যখন বীথিকা গৃহে ছিলাম তখন উড়িষ্যার একটি পাথরের ত্রিভঙ্গ মূর্তি অবলম্বনে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর আঁকা একটি লাইন ড্রইং প্রবাসী পত্রিকায় ছাপান হয়। এই ড্রইংটি দেখে তুলি ও চীনে কালিতে কাগজের উপরে নকল করেছিলাম। দু'একদিন পর ড্রইংটিকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। গৃহের ছেলেরা সে কথা জানতে পেরে খুব তৎপর হয়ে খোঁজা খুঁজির কাজে লেগে যায়। শেষ পর্যন্ত আমাদের ঘরেরই বিজ্ঞান নামে একটি ছেলের হাফপ্যান্টের পকেট থেকে ড্রইংটি বের করে নিয়ে এল। অত্যুৎসাহে কালীমোহন বাবুর নিকটে নালিশ করবার জন্য আমাকে টেনে নিয়ে গেল। নতুন ছাত্র, তখনও আমি একটু লাজুক ছিলাম, কিন্তু আমাকে নিয়ে কালীমোহন বাবুর কাছে উপস্থিত করল এবং ড্রইংটি তাঁর সামনে রেখে বিজ্ঞানের নামে নালিশ করলো। ড্রইংটি তিনি হাতে নিয়ে যত্ন করে দেখলেন এবং আমাকে বললেন "তুমি তো বেশ ছবি আঁকতে পার"। তার পরে একটুকরো কাগজে কি লিখে ছাত্রদের হাতে দিয়ে বললেন ওকে নতুন বাড়িতে সন্তোষ মিত্রের নিকটে নিয়ে যাও। সন্তোষদা আমার এক বছর পূর্বে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। নতুন বাড়িতে থেকে তিনি শিশু বিভাগের ছাত্রদের দেখাশোনা করতেন ও বিদ্যালয়ে ড্রইং শেখাতেন। কালীমোহন বাবুর টুকরো কাগজে লেখাটাও আমার আঁকা ড্রইংটি ছাত্রদের কাছ হতে নিয়ে দেখলেন তার পরে দেহলীর একেবারে সংলগ্ন খড়ো চালা ছোট ঘরটিতে তখন শিল্পী অসিতকুমার হালদার থাকতেন, সেখানে আমাকে নিয়ে গেলেন। জানালার ধারে একটি ডেস্ক ও মেঝেতে আসন পাতা, আসনে বসে ডেস্কের উপরে ঝুঁকে বোধ হয় ছবি আঁকছিলেন। আমার ড্রইংটি দেখে খুশি হয়ে আমাকে বললেন "দেখছি, তুমি ছবি আঁকতে পার, বেশ, বসো"। এই বলে পাশে পাতা আরেকটি আসনে বসালেন ও ভিন্ন ডেস্কের উপরে একটি রামায়ণ বই খুলে নন্দলালের আঁকা অহল্যা উদ্ধারের ছবিটি বের করে আমাকে তার থেকে রামচন্দ্রের ছবিটি নকল করতে বললেন। তিনি কিছু ড্রইং কাগজ, পেনসিল, রবারও দিয়েছিলেন। ছবিটি নকল করে দিয়েছিলাম। আমার একটি ড্রইংকে উপলক্ষ করে সেই প্রথম কালীমোহন বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলাম। তারপর থেকেই তিনি আমার প্রতি সর্বদা খোঁজ খবর রাখতেন, কেমন ছবি আঁকছি জানতে চাইতেন।

এক সময়ে তাঁর কাছে আমরা রোমের প্রাচীন ইতিহাস পড়েছিলাম। ক্লাশের পড়ার বিষয়কে যে এত চিত্তাকর্ষক করে তোলা যায় তাঁর ক্লাশে আমরা বেশ উপলব্ধি করেছিলাম। তিনি গল্প বলার ছলে রোমান বীরদের যুদ্ধ, রাজ্য শাসন, স্বদেশ প্রীতি, খেলা, আরো বহু ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির বিষয়ে উল্লেখ করতেন। আবার তারই সঙ্গে ভারতের পরাধীনতার গ্লানি, স্বদেশ প্রেমিকদের স্বাধীনতার জন্য আত্মবিসর্জন ইত্যাদির কথা বলতেন। তিনি ছিলেন সুবক্তা ও স্বদেশ বৎসল মানুষ। আমরা মুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনতাম। তিনি যে স্বাধীনতাকামী ছিলেন তাঁর প্রতি কথায় সেটা বুঝা যেত। চোখে মুখে সেই ভাব ফুটে উঠত। দেশের সেবা বিশেষ করে গ্রামবাসীদের উন্নতির জন্য কাজ করবার ইঙ্গিত তাঁর প্রতিকথায় প্রকাশ পেত। ক্লাসে পড়াবার সময়ে তিনি একবার বলেছিলেন প্রথমবার যখন বিলেতে গিয়ে কিছুদিন থেকে দেশে ফিরছিলেন তখন

জাহাজটি বোম্বে বন্দরে এসে থামলে তিনি তাঁর মাথার টুপিটিকে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। এ কাজটা করেছিলেন স্বদেশী ভাবনার থেকে। সেই অল্প বয়সেও তাঁর এই ক্লাশে তাঁর মুখের কথা শুনতে এবং পড়তে আমাদের খুব ভাল লাগত। পরে কালীমোহনবাবুর ক্লাসে আমরা বাংলা পড়তাম। আমাদের বাংলা পাঠ্য পুস্তক ছিল গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের লেখা "কথা ও কাহিনী"। বইটির মধ্যে "দুই বিঘা জমি" কবিতাটি আমাদের মুখস্থ করতে বলতেন। কবিতার যে জায়গায় লেখা আছে

> নমো নমো নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি
> গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।
> অবারিত মাঠ গগন ললাট চুমে তব পদধূলি
> ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।
> পল্লব ঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ
> স্তব্ধ অতল দিঘি কালো জল—নিশীথ শীতল স্নেহ।
> বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে
> মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।

এ কয়েকটি লাইন তাঁর খুব ভালো লাগতো এবং বারবার আবৃত্তি করতে বলতেন এবং তিনি নিজে চুপটি করে চোখ বুজে থাকতেন। মনে হত ধ্যানে বাংলার সুন্দর রূপটি অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করছেন। সমস্ত কবিতাটি ব্যাখ্যা করার সময়ে বলতেন কয়েকটি লাইনে বাংলা মায়ের এমন সুন্দর ছবি আর কোথাও লেখা হয়েছে বলে মনে হয় না। কবিতাটিতে জমিদারের দ্বারা নিপীড়িত প্রজা উপেনের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল গরীবের প্রতি ধনীর অত্যাচার তিনি মনে প্রাণে নিন্দা করতেন। গরীবের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম দরদই পরবর্তীকালে তাঁকে গ্রাম সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে প্রেরণা দিয়েছিল।

কয়েক বছর পরে শিশুবিভাগ থেকে প্রমোশন পেয়ে মধ্যবিভাগে এসেছিলাম। আমাদের কর্মক্ষমতাও কিছুটা তখন বৃদ্ধি পেয়েছে। পৌষ সংক্রান্তিতে কেন্দুলী গ্রামের ধারে অজয় নদীতে স্নান করতে বহু পুণ্যার্থীদের সমাগম হয়ে থাকে তখন এবং সেখানে জয়দেবের মেলাও শুরু হয়। এই জনসমাগমের সময়ে মাঝে মাঝে কলেরা রোগে অনেকে আক্রান্ত হয়। কালীমোহনবাবু জনসেবার উদ্দেশ্যে আমাদের ছাত্র ভলান্টিয়ারের দল নিয়ে মেলার কয়েকদিন পূর্বে কেন্দুলীতে গিয়ে উপস্থিত হতেন। অজয় নদীর পাড়ে আমাদের তাঁবু খাটান হত। প্রতিদিন শেষ রাত্রে চারটায় আমাদের জাগিয়ে দেওয়া হলে নদীর পাড়ে গিয়ে পরস্পরের থেকে কিছুটা দূরত্ব রেখে লাইন করে দাঁড়িয়ে যেতাম। আমাদের কাজ ছিল যারা বিনা জল পাত্র নিয়ে নদীর ধারে প্রাতঃকৃত্যাদি করতে যেত তাদের অনুরোধ করা জলপাত্র নিয়ে যাবার জন্য। জলপাত্র না নিয়ে নদীর জলে এসে জল খরচ করলে নদীর নীচের দিকে সেই জল পান করে অনেকে অসুস্থ হয়ে যেত, এমনি করে কলেরার সৃষ্টি হত। আমাদের পক্ষে কাজটি খুব সহজ ছিল না, সাধারণ গ্রাম্য লোকদের, এই সব কথা বলাতে অনেকে আমাদের উপর বিরক্ত হয়ে বেশ তর্ক

করত। ভোর থেকে বেলা আট, ন'টা পর্যন্ত এই ভাবে আমাদের ডিউটি দিতে হত। আমি এইভাবে ভলান্টিয়ারী কাজ করতে তাঁর সঙ্গে দু'বার কেন্দুলী মেলায় গিয়েছিলাম।

ধীরে ধীরে ব্রহ্মাচর্যাশ্রমের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। নূতন কয়েকজন অধ্যাপকও আশ্রমের কাজে এসে যোগ দিয়েছিলেন দেহলীর সংলগ্ন নতুন বাড়ির থেকে শিশু বিভাগের ছাত্রদের অন্যত্র থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তখন থেকে এই বাড়িতে পুরোনো কয়েকজন অধ্যাপক যেমন ক্ষিতিমোহন সেন, নেপালচন্দ্র রায়, কালীমোহন ঘোষ সপরিবারে বাস করতে লাগলেন। তখন কালীমোহনবাবুর অল্প বয়স্ক দুই পুত্রকে দেখেছিলাম। বড় ছেলে শান্তিদেব ঘোষ ও ছোটছেলে সাগরময় ঘোষ। পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও বিশেষজ্ঞ বলে শান্তিদেব যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন সাগরময় ঘোষও দেশ পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে সকলের কাছে পরিচিত। তাঁরা দুইজনেই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মাচর্যাশ্রমের ছাত্র।

গ্রীষ্মের ও পূজার ছুটিতে ব্রহ্মাচর্যাশ্রমের পূর্ববঙ্গের ছাত্রগণ দুইটি দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হত। ঢাকার দলকে অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন বাবু এবং ত্রিপুরার দলকে অধ্যাপক কালীমোহনবাবু নিয়ে যেতেন। কালীমোহন বাবুর বাড়ি ছিল চাঁদপুরে। গোয়ালনন্দ ষ্টিমার ঘাট থেকে ষ্টিমারে চড়ে পদ্মা ও মেঘনা নদীর পার হয়ে চাঁদপুরে পৌঁছাতে আমাদের সাত, আট ঘণ্টার মত সময় লাগতো। ছাত্র সংখ্যা পনের, কুড়ি জনের মত হত। আমরা সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী তাই ষ্টিমারের উপরের ডেকে সতরঞ্চি পেতে তার চারদিকে ট্র্যাঙ্ক, বাক্স দিয়ে নিজেদের সীমানা টেনে জায়গা দখল করতাম। যখন ষ্টিমারে চলতাম তখন হাতে বিশেষ কিছু করবার থাকতনা, তাই শুয়ে, বসে, গল্প করে, বই পড়ে সময় কাটাতাম। যে সব ছেলেরা গান গাইতে পারত তারা মাঝে মাঝে গুরুদেবের গান গাইত। তখন ষ্টিমারের যাত্রীরা গান শুনবার জন্য আমাদের চার পাশে এসে ভীড় জমাতো। রবীন্দ্রসঙ্গীত তখনও তাদের কাছে সম্পূর্ণ নূতন বলে সকৌতুকে চুপটি করে শুনে যেত। একবার পূজার ছুটিতে গোয়ালনন্দ থেকে ষ্টিমারে আমরা চাঁদপুরের উদ্দেশ্যে চলেছি। বিকালের আকাশ অস্তগামী সূর্যের রঙিন আলোতে উজ্জ্বল, তারই প্রতিফলন পদ্মার জলকেও রাঙিয়ে তুলেছে। আকাশের এক কোণে সামান্য একটুকরো মেঘও দেখা দিয়েছে। এই অপরূপ সৌন্দর্যের মধ্যে ছাত্রদের মিলিত কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাওয়া বেশ জমে উঠেছে। শেষের গানটি গাওয়া হল "সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছে তোমায় করিগো নমস্কার"। ফাল্গুনী অভিনয়ে "ওগো দক্ষিণ হাওয়া"র গানটি গেয়ে সমরেশ সিং খুব প্রশংসা পেয়েছিল, তবে গানটিও ছিল ভারি মিষ্টি। সেও এই দলে গান গাইছিল। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা এগিয়ে এল এবং আকাশের কোণের সেই ছোট্ট মেঘ ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলল, রঙিন আকাশ অন্ধকার করে প্রবল ঝড় শুরু হল। পদ্মার জল ঝড়ের বেগে সহস্র বিরাট ফণা তুলে ষ্টিমারের গায়ে আঘাত হানতে লাগলো। সে কি ভীষণ ঝড়, ভাবলে এখনও হৃদকম্প হয়। রুদ্রবেশে সত্যিই সেই সন্ধ্যায় প্রকৃতি কি যে অপরূপ সুন্দর বেশে দেখা দিয়েছিল যার স্মৃতি এখনও মন থেকে মুছে যায়নি। কলকাতা কলেজের অনেক ছাত্র ছাত্রীরাও পূজার ছুটিতে এই ষ্টিমারে বাড়ি যাচ্ছিল। ঝড়ের দাপটে অনেক কলেজের ছাত্রী ভয়ে

অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। ষ্টিমারের কর্মীরা এবং কলেজের ছাত্রগণ যাত্রী সবাইকে এসে সাবধান করে বলে গেল যে যেখানে বসে আছে সেখান থেকে কেও যেন না নড়ে। ষ্টিমারটি বিরাট ঢেউয়ের আঘাতে টলমল করছিল, যাত্রীরা ভয়ে এধারে ওধারে যদি চলে তবে ষ্টিমারটি ডুবে যাবার আশঙ্কা। ষ্টিমারের এক পাশে তারের রেলিঙের ধারে আমি চুপটি করে বসে ছিলাম। বৃষ্টির জল গায়ে এসে পড়ছিল নীচের পদ্মার অশান্ত বিরাট ঢেউগুলি দেখে গুরুদেবের "দেবতার গ্রাস" কবিতা মনে পড়ছিল। নীচের ডেকে স্তুপীকৃত মাল বোঝাই করা বস্তার অনেকগুলি পদ্মার ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। মাঝ রাতের কিছু পূর্বে ঝড় থেমে যায়। সারেং মাঝরাত্রে ষ্টিমারটিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে অস্বীকার করে এবং মাঝ দরিয়ায় নোঙড় ফেলে ষ্টিমারটিকে থামিয়ে রাখে। ভোরের দিকে চলতে শুরু করে লৌহজং ষ্টিমার ঘাটে যখন এসে পৌঁছায় তখন নদীর জলে মানুষের মৃতদেহ, মৃত গরু ইত্যাদি ভেসে যেতে দেখছিলাম। তীরের ঘর বাড়িগুলি ঝড়ে লাঞ্ছিত, দোকানপাট ছিন্নভিন্ন। শেষ পর্যন্ত চাঁদপুরের ষ্টিমার ঘাটে আমরা দুপুরের দিকে গিয়ে পৌঁছেছিলাম।

শ্রীনিকেতনে পল্লী সংগঠন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের চার পাশের অনুন্নত গ্রামগুলির আর্থিক অবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সর্ব বিষয়ে উন্নতি করে শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। পল্লী উন্নয়নের কাজে প্রয়োজন সেই সব দরদী কর্মীদের যাঁরা মুরুব্বিয়ানার মনোবৃত্তি ত্যাগ করে গ্রামবাসীদের অভাব অভিযোগ বুঝতে পারবেন, তাদের ভালবেসে সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে বিপদে আপদে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন। গুরুদেব কালীমোহন বাবুকে ভাল করে জানতেন। তাই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অধ্যাপনার কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়ে পল্লী উন্নয়নের কাজে শ্রীনিকেতনে পাঠিয়ে দিলেন। গরীব গ্রামবাসীদের প্রতি সর্বদা দরদী হওয়াতে তিনি আনন্দিত হয়ে এই কাজে মনে প্রাণে ব্রতী হলেন। এই কাজের বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি একদল কর্মী তৈরি করে নিলেন এবং সকলে মিলে গ্রামে গ্রামে গিয়ে কাজ করতে লাগলেন। অর্থহীন, ম্যালেরিয়া রোগে ভগ্ন স্বাস্থ্য হয়ে মরণাপন্ন গ্রামবাসীরা এঁদের সাহায্যকে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদরূপে গণ্য করে মাথা পেতে নিল এবং তাঁদের কাজে সহায়তা করে নিজেরা উপকৃত হতে লাগলো। প্রত্যেক গ্রামবাসী অন্তরের সঙ্গে ভালবেসে ও শ্রদ্ধাসহকারে পরদুঃখ কাতর কালীমোহনবাবুকে তারা আপনার লোক বলে ভাবতে পেরেছিল। তিনি আর ইহজগতে নেই কিন্তু তাঁর স্মৃতি এখনও শ্রীনিকেতনের কর্মীরা, গ্রামবাসীরা শ্রদ্ধা, ও ভালোবাসার সঙ্গে স্মরণ করে থাকেন। এমন ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

১৯৩০ সালে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ লন্ডন শহরে গিয়েছিলেন। কালীমোহনবাবুও তাঁর সঙ্গী ছিলেন। আমরা চারজন ভারতীয় শিল্পী লন্ডনে ইন্ডিয়া হাউসে দেয়াল চিত্র আঁকছিলাম। বাড়িটির প্রধান ডোমে ভিতরদিকে কাঠের বিরাট মাচা বাঁধা হয়েছে তাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা ছবি আঁকছিলাম। বেলা দুপুরের সময়ে কালীমোহনবাবু ইন্ডিয়া হাউস দেখতে এলেন। সংবাদ পেয়ে নীচের থেকে তাকে মাচার উপরে নিয়ে এলাম যেখানে ছবি আঁকছিলাম। তিনি আমার ছবি আঁকা দেখে খুব আনন্দিত হলেন ও উচ্চ

প্রশংসা করলেন। আমি তখন তাঁকে বলেছিলেন "মাষ্টার মশায়, এই প্রশংসার অনেকখানি ভাগ আপনার প্রাপ্য" এই কথা বলে সেই ছোটকালে শিশুবিভাগে বাস করবার সময়ে একটি ড্রইংকে উপলক্ষ্য করে তাঁর স্নেহলাভের সৌভাগ্য তখন আমার হয়েছিল বলে জানালে, খুশি হয়ে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, লক্ষ করলাম ভাবাবেগে তাঁর দু'চোখ ভিজে উঠেছে। ছোট বয়সে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষালাভের সময়ে যে সব আচার্যদের পদপ্রান্তে উপবেশন করে শিক্ষালাভ করবার আমাদের সৌভাগ্য হয়েছিল, যাঁদের অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসা, উপদেশ এবং তাঁদের আদর্শ আমাদের জীবনকে অনুপ্রাণিত করেছিল, শ্রদ্ধেয় কালীমোহন ঘোষ তাঁদেরই অন্যতম। তাঁর স্মৃতি কথা মনে হলে শ্রদ্ধায় আপনিই মাথা নত হয়ে আসে।

[শান্তিদেব ঘোষের পরিচালিত কলকাতা-রবীন্দ্রসদনে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'তাসের দেশ' অভিনয় উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে।]

শ্রীনিকেতনের প্রধান পুরুষ

প্রমথনাথ বিশী

কালীমোহন ঘোষ ছিলেন চাঁদপুরের লোক, স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানের ফলে সরকারের বিষ-নজরে পড়িয়া অবশেষে শান্তিনিকেতনে আসিয়া যোগ দেন। তখনকার দিনে সরকার কর্তৃক নিগৃহীত বহু ব্যক্তি শান্তিনিকেতনে ছিলেন—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও যে এইরকম একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি ছিলেন, তাহা এখনকার অনেকেই জানেন না।

প্রথমে কালীমোহনবাবু শিশুবিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। তার পরে শ্রীনিকেতন পল্লী-উন্নয়ন-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে সেখানকার অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। বস্তুত, এ দুই কাজের স্বরূপ ভিন্ন নয়। শিশুরা যেমন অসহায় আমাদের দেশের গ্রামের লোকও তেমনি অসহায়। শিশুদের মতোই তাহারা নিজেদের ভালোমন্দ বোঝে না ; তাহাদের দেখিবার কেহ নাই, তাহারা একান্ত নিঃসম্বল, নিরাশ্রয়। শিক্ষিতসমাজ তাহাদের ত্যাগ করিয়াছে; তাহাদের অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, ভগবানও যেন তাহাদের ত্যাগ করিয়াছেন। সত্যকার দৃষ্টিতে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন একই ভাবের ভিন্ন বিকাশ মাত্র ; একটি শিশুচর্যা-প্রতিষ্ঠান, আর একটি বয়স্ক-শিশুচর্যার স্থান।

যৌবনকাল হইতেই রবীন্দ্রনাথ পল্লীবাসীদের উন্নয়ন সম্বন্ধে সজাগ। প্রথমে তাঁহার চিন্তা কেবল রচনাতেই আবদ্ধ ছিল ; পরে পাবনা-রাজশাহীর নিজ জমিদারির মধ্যে চিন্তাকে কর্মে রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রৌঢ় বয়সে সেই চিন্তা ও চেষ্টার অভিজ্ঞতা প্রসূত প্রতিষ্ঠান সুরুলের শ্রীনিকেতন-পল্লী উন্নয়নসমাজ। শ্রীনিকেতন তাঁহার অভিজ্ঞতার তৃতীয় এবং শেষ ধাপ ; পূর্ববর্তী দুইটি ধাপ এই বিষয়ের সূচনা এবং নিজের জমিদারিতে ইহার প্রাথমিক প্রচেষ্টা।

শ্রীনিকেতন-প্রতিষ্ঠানকে অনেকে গৌণ মনে করেন, কিন্তু বস্তুত সেরূপ মনে করিবার কারণ নাই ; শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতন পরস্পর পরিপূরক ; শ্রীনিকেতনের মধ্য দিয়াই রবীন্দ্রনাথের আইডিয়া দেশের মধ্যে শিকড় সঞ্চালন করিয়া দিয়া যাহা ব্যক্তিগত তাহাকে দেশগত করিয়া তুলিবে। অদূর ভবিষ্যতে শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের প্রসারিত বাহুদ্বয়ের আলিঙ্গনে সমগ্র দেশ ধরা দিবে বলিয়া আশা করা যায়।

কালীমোহনবাবু ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান পুরুষ। তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল, নিরক্ষর নিঃসহায় গ্রামের লোকেদের অনায়াসে তিনি কাছে টানিতে পারিতেন। এ এক

রকমের প্রতিভা। কালীমোহনবাবুর মতো কর্মী না পাইলে রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত পল্লী-উন্নয়ন-ব্যবস্থা এত অল্প সময়ে এমন সার্থকতা লাভ করিত কি না সন্দেহ।

কালীমোহনবাবুর আর-একটি গুণ ছিল বাগ্মিতাশক্তি। বলিতে কহিতে অনেকেই পারেন, কিন্তু বাগ্মিতা বিরল গুণ। স্বরবিন্যাসের মধ্যে ঠিক কোথায় মূর্ছনাটি দিলে শ্রোতার মনের মধ্যে ছাঁত করিয়া উঠিবে এবং অকস্মাৎ তাহার অজ্ঞাতসারে, অনেক সময়েই তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও, সহানুভূতি বক্তার করতলগত হইয়া পড়িবে, ইহা জানা সহজ শক্তি নয়। কালীমোহনবাবুর এই বাগ্মিতাশক্তি প্রচুর পরিমাণে ছিল, আর এই শক্তিটার জন্য পল্লী-উন্নয়নের দুরূহ কাজ তাঁহার পক্ষে সহজ হইতে পারিয়াছিল। এই শিশুর মতো সরলপ্রাণ ব্যক্তিরও কয়েক বছর হইল মৃত্যু হইয়াছে।

[*রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন* থেকে সংকলিত]

প্রথম পদাতিক

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

কালীমোহন ঘোষকে আমার ছেলেবয়স থেকেই জানবার চিনবার সুযোগ হয়েছিল। পূর্ববঙ্গে আমরা ছিলাম একই অঞ্চলের অধিবাসী। তিনি আমার পিতৃদেবের অতি স্নেহের পাত্র ছিলেন। আমাদের গ্রামের বাড়িতে এক সময়ে তাঁর খুব যাতায়াত ছিল ; সেই তখন থেকেই তাঁকে আমাদের একান্ত আপনার জন বলে জানতাম।

আমার পিতা আদিযুগের রবীন্দ্রভক্ত। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি এ শতাব্দীর গোড়াতেই গ্রামাঞ্চলে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন এবং সেটিকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীদের মধ্যে কিছু সংগঠনের কাজ শুরু করেছিলেন। সে কাজে যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে কালীমোহন ঘোষ অন্যতম। কালীমোহন তখন বালক বললেই চলে, সবে কৈশোর পার করে যৌবনে পা দিয়েছেন। আমার তখনো জন্মই হয় নি।

আমি যখন স্কুলে নীচের ক্লাসের ছাত্র কালীমোহনবাবু তখন শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক। ছুটিছাটায় দেশে এলে এক-আধদিন এসে আমাদের বাড়িতে কাটাতেন। পিতার সঙ্গে নানা বিষয়ে তাঁর আলোচনা হত। তারই ফাঁকে মাঝে মাঝে তিনি আমাদের নিয়ে খুব গল্প জমাতেন, শান্তিনিকেতনের গল্প বলতেন। যেমন স্নেহপ্রবণ তেমনি আমুদে স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তাঁর কাছে বসে গল্প শোনাটা আমাদের কাছে খুব একটা লোভনীয় ব্যাপার ছিল। শুধু গল্প নয়, মাঝে মাঝে তিনি রবীন্দ্রনাথের ছোটোদের কবিতা বেশ জোর গলায় আবৃত্তি করে শোনাতেন। বেশ মনে পড়ে বীরপুরুষ এবং বন্দী বীর—এই দুটি কবিতা আমার দাদাকে খুব তালিম দিয়ে আবৃত্তি করতে শিখিয়েছিলেন। কদিন পরে দাদা এক সভায় বন্দী বীর কবিতাটি আবৃত্তি করে একটা প্রাইজ পেয়ে গেল। বলা বাহুল্য, আমি নিজে তখনো অতখানি তালেবর হই নি, ইস্কুলেই ভর্তি হই নি।

কালীমোহনবাবু যখন কলেজের ছাত্র তখন বঙ্গভঙ্গ নিয়ে সারা দেশ তোলপাড়। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ লেগেছে। কালীমোহনবাবু ছিলেন ভাবপ্রবণ অত্যুৎসাহী যুবক। কলেজ ছেড়ে দিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে স্বদেশী প্রচারে লেগে গেলেন। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর অঞ্চলে যখন প্রচারকার্যে নিযুক্ত তখন আস্তানা নিয়েছিলেন সোনারঙ গ্রামে। ক্ষিতিমোহন সেন মশায় ওই গ্রামের অধিবাসী। ছুটিতে যুবক ক্ষিতিমোহন এসেছেন গ্রামে। স্বদেশী যুবক কালীমোহনের সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়। দুদিনেই খুব ভাব জমে গেল। ক্ষিতিমোহনবাবু সবে রবীন্দ্রকাব্যের স্বাদ

পেয়েছেন। সারাদিন উচ্চকণ্ঠে কাব্য পাঠ করেন, কালীমোহনকে শোনান। কালীমোহনবাবুও কাব্যবিমুখ ছিলেন না, তবে কাব্যোন্মাদনাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল তাঁর স্বদেশী উন্মাদনা। সেজন্যে তাঁর গতিবিধির ঠিক-ঠিকানা ছিল না, আজ এখানে তো কাল সেখানে। ক্ষিতিমোহনবাবুকে নিয়েও নানান জায়গায় ঘুরেছেন, আমাদের অঞ্চলেও তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে আমার পিতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং পরেও যোগাযোগ হয়েছে। কালীমোহনবাবুর মৃত্যুর পরে তাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ক্ষিতিমোহনবাবু সে কথার উল্লেখ করে প্রবাসীতে লিখেছিলেন, 'বাবুরহাটের শিক্ষাগুরু সারদা দত্ত মহাশয়ও তরুণ কালীমোহনের অনেক নির্দেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতেন।'

১৯০৬ সাল, স্বদেশী আন্দোলন চলেছে জোর কদমে। প্রাদেশিক সম্মেলন বসছে বরিশালে। সেবারেই প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলনের সঙ্গে একটি বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনেরও আয়োজন হয়েছে। সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদানের জন্যে কালীমোহনবাবু গিয়েছিলেন বরিশালে। সেখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বেই তাঁর স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনা দেশবাসীর সুমুখে উপস্থাপিত করেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক উত্তেজনায় সারা দেশ তখন এমন মত্ত যে সংগঠনমূলক কাজে মন দেবার মতো স্থৈর্য কারোই ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এ কথাটা দেশবাসীকে বোঝাতে পারেন নি যে দেশ গড়ার কাজ শুধু মুখের কথা দিয়ে হবে না, হাতে-কলমে, খেতে-খামারে হাটে-গঞ্জে কাজে নামতে হবে। কোনো দিক থেকে সাড়া না পেয়ে ভেবেছিলেন নিজের জমিদারি এলাকায় ছোটো আকারে হলেও নিজেই পল্লী-সংগঠনের কাজে হাত দেবেন। বলেছেন, 'এ কথা যখন কাউকে বলে ক'য়ে বোঝাতে পারলুম না যে আমাদের স্বায়ত্ত-শাসনের ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষিপল্লীতে, তার চর্চা আজ থেকেই শুরু করা চাই, তখন...এ কথা আমাকে বলতে হল—আচ্ছা, আমিই এ কাজে নামব।'

প্রথম সাক্ষাতে কালীমোহনের সঙ্গে এ বিষয় নিয়েই তাঁর কথাবার্তা হয়েছিল। উৎসাহে ভরপুর সুদর্শন যুবকটির সঙ্গে কথা বলে রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছিল। অবশ্য মনে উৎসাহ যতখানি শরীরে তাকত ছিল না ততখানি, ম্যালেরিয়ায় ভুগে শরীর তাঁর জীর্ণ। কিন্তু কালীমোহন তাতে দমবার পাত্র নন। স্বভাবটাই ওই রকম, সারাক্ষণ উৎসাহে টগবগ করছেন। সে মুহূর্তেই কাজে লাগতে রাজি। কালবিলম্ব না করে চলে গেলেন শিলাইদহে। রবীন্দ্রনাথও অবিলম্বে তাঁকে লাগিয়ে দিলেন গ্রামের কাজে। পল্লী-সংগঠন কথাটি আজ বহু ব্যবহারে জীর্ণ ; সংগঠনকর্মীর সংখ্যাও অগণিত। কিন্তু আজ থেকে পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে এ কাজ ছিল অভিনব। অনেকেই ভুলতে বসেছেন যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এ অভিযানের প্রথম অধিনায়ক আর কালীমোহন তার প্রথম পদাতিক। 'রাশিয়ার চিঠি'তে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ কথাটির উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, 'এই সংকল্পে সহায়তা করবার জন্যে সেদিন একটিমাত্র লোক পেয়েছিলুম, সে হচ্ছে কালীমোহন। শরীর তার রোগে জীর্ণ, দু বেলা তার জ্বর আসে, তার উপরে পুলিসের খাতায় তার নাম উঠেছে।'

কাজে একবার মেতে উঠলে কালীমোহনের আর হুঁশ থাকত না, শরীরের কথা আদৌ ভাবতেন না। রুগ্‌ণ শরীর নিয়েই দিনমান গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। কাজের মধ্যে একেবারেই ডুবে যেতেন। কালীমোহনবাবুর কাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তিনি যাদের মধ্যে কাজ করতেন—সেই চাষী-মজুরদের সঙ্গে তিনি এতটুকু ব্যবধান রক্ষা করে চলতেন না। তাদের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে যেতে পারতেন, তারাও তাঁকে অনায়াসে ঘরের মানুষ বলে ভাবতে পারত। ভদ্রশ্রেণীর জীবদের তারা বলতে গেলে নখী দন্তী প্রাণী হিসাবে ভয়ে সম্ভ্রমে দূরে দূরেই রাখত। এই প্রথম ভদ্রঘরের একটি শিক্ষিত যুবককে তারা একান্ত আপনার জন বলে ভাবতে পারল। গায়ে পড়ে উপকার করতে গেলে লোকে উপকৃত বোধ করে না, বিব্রত বোধ করে। উপকারের মধ্যে একটা মুরুব্বিয়ানার ভাব আছে, সেটাতেই ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। কালীমোহনবাবুর মধ্যে মুরুব্বিয়ানার ভাবটি আদৌ ছিল না। সেজন্যে তারা তাঁকে যেমন ভালোবেসেছে তেমনি আবার মান্যও করেছে—কারণ যাঁকে লোকে ভালোবাসে তাঁকে কখনো অমান্য করে না। জনসেবার প্রথম শর্ত ভালোবাসা—এ কথাটি রবীন্দ্রনাথ গোড়াতেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন। কালীমোহন সে শর্তটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। ভালোবাসা দিয়েই গ্রামবাসীর সেবা করেছেন এবং ভালোবাসা দিয়েই তাদের হৃদয় জয় করেছেন।

এদিকে অতিরিক্ত পরিশ্রমে রোগজীর্ণ শরীর অধিকতর জীর্ণ হল। অবস্থা দেখে রবীন্দ্রনাথও ভয় পেলেন। শরীর সারাবার জন্যে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন গিরিডিতে। একটানা কয়েকমাস গিরিডিতে কাটিয়ে মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠলেন। সেখানে বেশ আনন্দেই ছিলেন। গিরিডিতে বহু ব্রাহ্ম-পরিবারের বাস। স্বভাবগুণে কালীমোহন এঁদের সকলেরই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। অনাত্মীয়কে তিনি অতি সহজেই আত্মীয় করে নিতে পারতেন। এঁদের সঙ্গে তাঁর সেই আত্মীয়তার সম্পর্ক আজীবন অটুট ছিল।

গিরিডিতে থাকতেই তিনি দু-একবার শান্তিনিকেতনে এসেছেন এবং দু-চারদিন এখানে কাটিয়ে গিয়েছেন। দেখে শুনে স্থানটি তাঁর খুব ভালো লেগেছিল। এদিকে স্বাস্থ্যের উন্নতি হলেও শরীর তখনো যথেষ্ট মজবুত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ ভাবলেন তখনই আবার তাঁকে গ্রামের কাজে পাঠিয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। আপাতত তাঁকে বিদ্যালয়ের কাজেই লাগিয়ে দিলেন। সেই থেকেই তাঁর শান্তিনিকেতনের কর্মজীবন আরম্ভ। এটা ১৯০৭/৮ সালের কথা। কালীমোহনবাবুর মহৎ গুণ—কাজের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা। যে কাজই দেওয়া হত সে কাজটিই তিনি প্রাণ দিয়ে করতেন। বেশ কিছুদিন তিনি শিশুদের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন : গৃহাধ্যক্ষ হিসাবে ছোটোদের আবাসগৃহে তাদের সঙ্গেই তিনি থাকতেন। তাদের সুখসুবিধার প্রতি তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। মিষ্টভাষী মিশুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বলে ছোটোদের সঙ্গে ভাব জমাতে তাঁর একটুও বিলম্ব হত না। পড়াতেন বাংলা এবং ইতিহাস। পুরোনো ছাত্রদের মুখে শুনেছি তিনি ক্লাসে গ্রীক রোমান ইতিহাসের কাহিনী পড়ে শোনাতেন আর অতিশয় স্বদেশবৎসল মানুষ ছিলেন বলে সেইসঙ্গে ভারতীয় বীরদের শৌর্য বীর্যের কাহিনীও খুব গর্বের সঙ্গে জাঁকিয়ে বলতেন। ছেলেরা খুব রোমাঞ্চিত বোধ করত।

বিদ্যালয়ে বছর-পাঁচেক কাজ করবার পরে উচ্চতর শিক্ষার জন্যে বিলেত যাবার এক সুযোগ এল। ১৯১২ সালে পুত্র এবং পুত্রবধূ সমেত কবি যখন বিলেত যান তার কিছুদিন আগেই কালীমোহনবাবু রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা লন্ডনে গিয়ে পৌঁছলে পর কালীমোহনবাবু এসে তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হলেন। অনতিকাল মধ্যেই গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ নিয়ে ইংরেজ-সুধী-সমাজে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। সারাক্ষণ গুণমুগ্ধদের আনাগোনা—রথীবাবু এবং কালীমোহনবাবু মিলে সে ভিড় সামলাতেন। ওই সুযোগে কবি ইয়েট্স্ এবং পাউন্ডের সঙ্গে তাঁদের দুজনেরই খুব ভাব জমে গিয়েছিল। রথীবাবু তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন—তিনি এবং কালীমোহনবাবু বহু সন্ধ্যা কাটিয়েছেন ইয়েট্স্-এর চিলেকোঠায় ; অনেক রাত অবধি গল্পগুজবে কাটত। এজরা পাউন্ডের সঙ্গে কালীমোহনবাবু বেশ একটু অন্তরঙ্গ ভাবেই মিশেছিলেন। ওই সময়ের আর-একটি কথাও উল্লেখযোগ্য ; কবিবন্ধু শিল্পী রোটেনস্টাইন পার্লামেন্ট হাউসে কয়েকটি ভারতীয় দৃশ্য আঁকবার ফরমাশ পেয়েছিলেন। একটি ছবির বিষয়বস্তু ছিল বারাণসীর ঘাট। ওই ছবির সুমুখ দিকে যে ব্যক্তিটি দাঁড়িয়ে—তার মুখের আদালটি কালীমোহন ঘোষের। বলা বাহুল্য, কালীমোহনবাবুকেই রোটেনস্টাইন মডেল হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

সেবারে কিন্তু কালীমোহনবাবু খুব বেশি দিন বিলেতে থাকতে পারেন নি। যাঁরা তাঁকে অর্থানুকূল্যের আশ্বাস দিয়েছিলেন তাঁরা শেষ পর্যন্ত কথা রাখতে পারেন নি। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন কিন্তু শিক্ষা অসমাপ্ত রেখেই তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছিল। ফিরে এসে আবার বিদ্যালয়ের কাজেই আত্ম নিয়োগ করেছিলেন। শিক্ষকতার কাজে যথেষ্টই পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন কিন্তু আসলে তাঁর মনটা ছিল জনসেবার দিকে—সেই শিলাইদহে একদা যে কাজে তিনি হাত দিয়েছিলেন। সে সুযোগ এল যখন বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে শ্রীনিকেতনে পল্লী-সংগঠন বিভাগের পত্তন হল। সে কাজে রবীন্দ্রনাথ প্রথম দফায় যে-ক'জন কর্মীকে লেনার্ড এল্মহার্স্টের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছিলেন কালীমোহন ঘোষ তাঁদের অন্যতম। সেই যে গ্রামের কাজে লেগে গেলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সে কাজেই ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর কাজের প্রধান গুণ ছিল তাঁর আন্তরিকতা। যে কাজে হাত দিতেন সে কাজে নিজেকে নিঃশেষে ঢেলে দিতেন। গ্রামবাসীরা বাবু-ভুঞাদের সহজে আপন জন বলে মনে করতে পারে না। তাদের কাছে কালীমোহনবাবু ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনি তাদের সুখদুঃখের শরিক ছিলেন। বিপদে আপদে তাঁর কাছেই সর্বাগ্রে ছুটে আসত। গ্রামবাসীদের ঝগড়াবিবাদ তো বটেই অনেক সময় মামলা-মকদ্দমাও তিনি আপসে মিটিয়ে দিয়েছেন। গ্রামের লোকদের সঙ্গে এতটুকু ব্যবধান রেখে চলতেন না। দিব্যি তাদের ঘরের দাওয়ায় চাটাই বিছিয়ে বসে তাদের ঘর-সংসারের, চাষবাসের খবর নিতেন, প্রয়োজন-মতো পরামর্শ দিতেন। হাতে-কলমে কাজ করিয়ে এদের মধ্যে থেকেই তিনি বেশ কয়েকজন গ্রাম-কর্মীও তৈরি করেছিলেন।

কালীমোহনবাবু মূলত ছিলেন স্বদেশবৎসল মানুষ। বালক বয়সে স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনা তাঁর রক্তে যে তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করেছিল সারা জীবনেও তা স্তিমিত হয় নি। সুবক্তা ছিলেন, আবেগময় ভাষণে সহজেই শ্রোতাদের মাতিয়ে তুলতে পারতেন। বহুকাল

পুলিসের নজর ছিল কড়া, শান্তিনিকেতন থেকে অপসারণের দাবিও উঠেছিল। ঠিক সে সময়টিতেই বিলেতে চলে যাওয়াতে পুলিস আর ও বিষয়ে বেশি উচ্চবাচ্য করে নি। পরে অবশ্য দেশের কাজ তিনি বক্তৃতামঞ্চ থেকে বাক্যপ্রয়োগে করেন নি, করেছেন শ্রমসাধ্য জনহিতকর কর্মযোগে। মনটি ছিল অতিশয় পরদুঃখকাতর। আবেগ-প্রবণ মানুষ ছিলেন ব'লে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে যেমন দপ করে জ্বলে উঠতেন তেমনি আবার দুস্থজনের দুঃখে দুর্যোগে অতি সহজে বিগলিত হতেন। তাঁর ওই স্বভাবজাত গুণটির কথা অতি সুন্দর করে বলেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর চৌপদীতে। বলেছেন—

কালীমোহনের অশেষ গুণ!
যে তাঁরে জানে—সে-ই জানে
দীন দুখে হৃদয়ে জ্বলে আগুন!
অবিচার সহে না প্রাণে॥

তিরিশের দশকে কালীমোহনবাবু আর-একবার বিদেশ ঘুরে এসেছিলেন। সেবারে এল্‌মহার্স্ট সাহেবই উদ্যোগী হয়ে তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে সমবায় আন্দোলন কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং সেখানকার সমাজজীবনকে কতখানি প্রভাবিত করছে সে-সব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে আসাই উদ্দেশ্য ছিল। এ উপলক্ষ্যে তিনি ইয়োরোপের এবং পশ্চিম এশিয়ার নানা দেশ পর্যটন করেছিলেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পরে তিনি বোলপুর অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে সমবায়রীতিতে কিছু স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। ঐ-সব স্বাস্থ্যকেন্দ্র গ্রামবাসীদের অশেষ কল্যাণ করেছিল।

অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরুন তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। কাজের চাপের সঙ্গে রক্তের চাপও বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু সেদিকে তাঁর নজর ছিল না, কাজেরও বিরাম ছিল না। জীবনের শেষ দিনটিতেও তিনি শ্রীনিকেতনের কর্মীদের সঙ্গে বসে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন। কর্মীরা বিদায় নেবার অল্পক্ষণ পরেই অকস্মাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর জীবনান্ত ঘটে। অকালমৃত্যুই বলতে হবে, কারণ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র আটান্ন। অবশ্য মানুষের পরমায়ুর হিসাব যদি কাজের পরিমাণ দিয়ে করা যায় তা হলে তাঁকে দীর্ঘায়ু বলতেও বাধা নেই। রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় গ্রামোদ্যোগ-কর্মে এতখানি নিষ্ঠা আর কেউ দেখান নি। এর স্বীকৃতি আছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে। বলেছেন, 'কর্মের সহযোগিতায় ও ভাবের ঐক্যে তাঁর সঙ্গে আমার আত্মীয়তা গভীর ভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। অকৃত্রিম নিষ্ঠার সঙ্গে আশ্রমের কাজে তিনি আপন জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর আন্তরিক জনহিতৈষা শ্রীনিকেতনের নানা শুভকর কার্যে নিজেকে সার্থক করেছে।' বিদ্যালয়ের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন সব সময় সর্বাগ্রে সতীশ রায়কে স্মরণ করেছেন তেমনি পল্লী-সংগঠনের ব্যাপারে যখনই কিছু বলেছেন তখনই সর্বাগ্রে কালীমোহন ঘোষের নামটি করেছেন। আমাদের শাস্ত্রে বলে—তস্য প্রিয়কার্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব—তাঁর প্রিয়কার্য সাধনই তাঁর উপাসনা। কালীমোহনবাবু রবীন্দ্রনাথের একান্ত প্রিয়কার্য—গ্রামবাসীর সেবার দ্বারাই তাঁর জীবনের পূজা সাঙ্গ করেছেন।

[*শান্তিনিকেতনের একযুগ* থেকে সংকলিত।]

আশ্রমিক কালীমোহন

অমিতা সেন

শতবর্ষ পূর্ণ উপলক্ষ্যে আজ শ্রদ্ধেয় কালীমোহন ঘোষকে আমি আমার অন্তরের তর্পণাঞ্জলি নিবেদন করি। শৈশবকাল থেকে তাঁকে এবং তাঁর সহধর্মিণী মনোরমা ঘোষকে আপন কোরে পেয়েছি, আমার পিতা ক্ষিতিমোহন সেন মাতা কিরণবালার পাশে পাশেই। পেয়েছি অজস্রধারায় তাঁদের স্নেহ-ভালবাসা। দুটি পরিবার আমরা আত্মীয়তার প্রীতি-বন্ধনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়েছিলাম।

সেই সেকালে 'দেহলী' বাড়িতে থাকতেন রবীন্দ্রনাথ। শ্রদ্ধেয় কালীমোহন ঘোষ এবং আমরা থাকতাম দেহলীর পশ্চিমে লাগা 'নতুন বাড়ি'তে, পাশাপাশি দুটি কোরে ঘরে। আমাদের পুবের দুটি ঘরে থাকতেন সপরিবারে সুধাকান্তদা (রায়চৌধুরী)। আর পশ্চিমের বড় ঘরটিতে থেকেছেন কখনো এণ্ডরুজ সাহেব, কখনো সপরিবারে নেপালচন্দ্র রায় কখনো-বা সপরিবারে নন্দলাল বসু। ভিন্ন ভিন্ন ঘরে রান্না হলেও খাবার সময়ে আমরা পিছনের টানা বারান্দায় পিঁড়ি পেতে বসে সবাই একসঙ্গে মিলে মিশে খেতাম। দক্ষিণে সামনের দিকে রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীর হাতে লাগানো মাধবী-মধুমালতীলতা-ঘেরা প্রাঙ্গণের মাঝখানে ছিল একটি বাঁধানো বড় চৌকো বেদী। সেটি ছিল বড়দের বৈঠকখানা, আমাদেরও খেলাঘর। সে কী আনন্দের দিনসব! সেদিনের কথা বার বার লিখেও যেন আশ মেটে না।

তারপর ১৯১৯-এ আমাদেরই জন্য আশ্রমের দক্ষিণের মাঠে গুরুপল্লী গড়ে উঠলে আমরা সবাই চলে গেল্যম সেখানে। রবীন্দ্রনাথও দেহলী থেকে উঠে গেলেন উত্তরে ধূ ধূ করা মাঠের প্রান্তে তাঁর নবনির্মিত বাড়ি কোণার্কে—যে বাড়িটিকে 'পর্ণকুটির'ও বলা হোতো। কিছুদিনের জন্য তখন কালীমোহনবাবুরা কলকাতায় চলে গেলেও যখন ফিরে এলেন রইলেন গুরুপল্লীতে আমাদেরই পাশের বাড়িটিতে। তাই আমাদের দুটি পরিবারের সম্মিলিত জীবন-যাত্রায় এতোটুকু চিড় ধরল না। শিথিল হল না আমাদের দৃঢ় আত্মীয়-বন্ধন। গুরুপল্লীতে দিনশেষে কর্মে পরিশ্রান্ত কালীমোহনবাবু প্রায়ই এসে বসতেন আমাদের বাড়ির খোলা চাতালে। আমার বাবার সঙ্গে চলত নানা আলোচনা। এলম্‌হার্স্ট সাহেবও মাঝে মাঝে এই বৈঠকে এসে যোগ দিতেন। মনে পড়ে আমার মা গেলাসে কোরে চা বানিয়ে এনে তাঁদের দিতেন। সেই সময়ে শান্তিনিকেতনে কারো

বাড়িতেই পেয়ালাপিরিচের অস্তিত্বই ছিল না। এরপর গ্রামের কাজের তাগিদে কালীমোহনবাবুরা চলে গেলেন শ্রীনিকেতনে তাঁদেরই জন্য তৈরি বাড়িতে।

কিন্তু এ তো গেল অনেক পরের সব কথা। আমার জানা কালীমোহনবাবুর ঘরোয়া কাহিনী আজকের মানুষদের শোনাতে গেলে আমায় ফিরে যেতে হবে আরও অনেক আগের দিনে, যখন আমরা কেউই জন্মাইনি। বিবাহও হয়নি কালীমোহন, ক্ষিতিমোহনের। যে সব কাহিনী আমাদের কাছে বলতে বলতে পরিণত বয়সেও তাঁদের দুজনেরই মুখ যেন যৌবনের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

কবেকার সে কথা—১৯০৩ সাল, দেশ তখন মেতে উঠেছে বঙ্গভঙ্গ-রোধের আন্দোলনে। কলকাতার পথে পথে সদলবলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সদ্য রচিত স্বদেশ-প্রেমের গান গাইতে গাইতে সকলের হাতে হাতে রাখী বেঁধে দিচ্ছেন। স্বদেশ-প্রেমের জোয়ারের সেই ঢেউ আছড়ে এসে পড়ল পূর্ববঙ্গে। উত্তাল কোরে তুলল পূর্ববঙ্গবাসীদের। ঘরে আর থাকতে পারলেন না দেশপ্রেমিক কালীমোহন ঘোষ। ঝাঁপিয়ে পড়লেন আন্দোলনে। গ্রামেগঞ্জে স্বদেশী বক্তৃতা দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে চাঁদপুরের বাজাপ্তি গ্রামের ছেলে কালীমোহন একদিন এসে হাজির হলেন ঢাকার বিক্রমপুরের সোনারঙ গ্রামে। আন্দোলনের সূত্রেই আলাপ হল সোনারঙ গ্রামের ছেলে ক্ষিতিমোহন সেনের সঙ্গে। তখনো তাঁদের দুজনের কারও সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যোগাযোগ না হলেও রবীন্দ্র-আদর্শ ছিল দুজনেরই জীবনাদর্শ। রবীন্দ্রকাব্য, সাহিত্য, মানবপ্রেমের বাণী ছিল দুজনেরই জীবনের পাথেয়। তাই প্রাণচঞ্চল দুই যুবকের মন গাঁথা পড়ে গেল রবীন্দ্র-অনুরাগের একই সূত্রে। বড় ভাই ক্ষিতিমোহন ছোটোভাই কালীমোহনের শুরু হয়ে গেল একত্রে গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে গ্রামের মানুষদের স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ কোরে তোলা।

শুনেছি অতি সুদর্শন দুটি যুবক যেখানেই গিয়ে দাঁড়াতেন সাড়া পড়ে যেতো সেখানেই। তার উপর কালীমোহনবাবুর বাগ্মিতায় ছিল খুবই সুনাম। তাঁর আবেগভরা কণ্ঠে আন্তরিক সুরের আকর্ষণে দলে দলে গ্রামবাসী সবাই এসে জড়ো হতেন তাঁদের পাশে।

সারাদিন গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা দিয়ে ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যায় ক্লান্ত শরীরে যখন সোনারঙ গ্রামে ফিরতেন, ক্ষিতিমোহন-জননী সস্নেহে দুজনকে বসিয়ে পাখা হাতে তাঁদের যত্নে খাওয়াতেন। মাতৃস্নেহস্পর্শে জুড়িয়ে যেতো দুই যুবকের মন। ক্লান্তি হোতো দূর।

কিন্তু তারপরও কি বিশ্রাম? না, আবার দুজনে উৎসাহে বই হাতে বসে যেতেন রবীন্দ্রসাহিত্য, রবীন্দ্রকাব্য, রবীন্দ্ররচনা পাঠে। রাত গড়িয়ে যেতো। গভীর রাতে আমার ঠাকুরমা নাকি সাহিত্যরসে ডগমগ দুই সন্তানকে জোর করে শুতে পাঠিয়ে দিতেন।

এইতো, মনে হয় যেন সেদিনের কথা। কালীমোহনবাবু শান্তিনিকেতনে আমার জেঠিমা, বীরেন্দ্রমোহনের মাকে বলছেন—"বৌঠান, সোনারঙ গ্রামে কতো জ্বালিয়েছি আপনাদের। সভা-সমিতি কোরে শেষ রাত্রে যখনই বাড়ি ফিরতাম কাঠের লাক্ড়ি জ্বেলে তখনই গরম গরম ভাত রেঁধে খাওয়াতেন আমাদের।" উত্তরে আমার জেঠিমা

বলতেন—"ঠাকুরপো, আজও তো আপনাদের নিজে হাতে রান্না করে খাওয়াতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আপনাদের পাই কই।"

সেদিন সোনারঙ যেমন হয়ে উঠল কালীমোহনের নিজের বাড়ি, তেমনি চাঁদপুরের বাজাপ্তি গ্রামে কালীমোহন-জননী কর্মক্লান্ত দুটি যুবককে দিনের পর দিন বেলা অবেলায় পাখা হাতে বসে সস্নেহে খাওয়াতেন।

কালীমোহনের মাতা তাঁর বড় পুত্রকে হারিয়ে ক্ষিতিমোহনকে বুকে টেনে নিয়ে সন্তানশোক ভুলে থাকতে চেয়েছিলেন। মাতৃভক্ত ক্ষিতিমোহনও নিজের মাকে যখন হারালেন তখন আঁকড়ে ধরেছিলেন কালীমোহনের মাকে। উচ্চস্বরে তাঁকে "মা মা" ডেকে মাতৃবিয়োগ-শোক ভুলেছিলেন। পরবর্তীকালে এই শান্তিনিকেতনে ক্ষিতিমোহনের কণ্ঠে কালীমোহন-জননীকে উচ্চস্বরে "মা মা" ডাক আমরাও শুনেছি। শুনেছি কালীমোহনের মাতার কণ্ঠে মাতৃস্নেহসিক্ত সাড়া। দেখেছি এই শান্তিনিকেতনে বাজাপ্তি গ্রামেরই মতো আবারও তিনি দুই সন্তানকে পাশাপাশি বসিয়ে আদরে যত্নে খাওয়াচ্ছেন।

সেই সেকালে বিবাহের পর আমার বাবা আমার মাকে নিয়েও বাজাপ্তি গ্রামে গিয়েছেন। সেদিনের সেসব কথা উঠলেই মা ৯০ বছর বয়সেও উদ্ভাসিত মুখে বলতেন—"বাজাপ্তি গ্রামের বাড়িতে গিয়ে দাঁড়াতেই বেগুনি রং-এর ডুরে শাড়ি পরে মনোরমা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমায় হাত ধরে নিয়ে গেল ওর শাশুড়ির কাছে। তিনি আমায় কতো আদর করলেন।" সেকালে আমাদের দুটি পরিবারের আত্মীয়-প্রীতিবন্ধনের কতো মিষ্টি মিষ্টি গল্পই না মা-খুড়িমাদের মুখে শুনেছি।

১৯০৬ সালে বরিশালে এক প্রাদেশিক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ হয়েছিল কালীমোহনের। আলাপ-আলোচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যেন খুঁজে পেয়ে গেলেন তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষার 'স্বদেশী সমাজ'-এর পরিকল্পনাকে রূপ দেবার যোগ্য লোক। কালীমোহনও পেয়ে গেলেন তাঁর জীবনের লক্ষ্য দরিদ্র নিরক্ষর হতস্বাস্থ্য গ্রামের মানুষের সেবা করবার সুযোগ। ধনী সুপ্রতিষ্ঠিত প্রখ্যাত আইনবিদ্ তাঁর শ্বশুরমশাই দীননাথ বসুর আশা আর পূর্ণ হল না। অর্থ উপার্জন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব কিছু ত্যাগ কোরে রবীন্দ্রনাথের ডাকে সাড়া দিয়ে কালীমোহনবাবু চলে গেলেন শিলাইদহে। সঁপে দিলেন নিজেকে গ্রাম সেবার কল্যাণ-কাজে। এরপর আর কখনো তিনি পিছন ফিরে তাকাননি। ভগ্নস্বাস্থ্য দারিদ্র্য যাতনা কোনো কিছুতেই আর তিনি বিচলিত হননি। কোনো প্রলোভনই আর তাঁকে আদর্শভ্রষ্ট করতে পারেনি।

কিন্তু শিলাইদহের আবহাওয়া তাঁর সইল না। স্বাস্থ্য ক্রমশই খারাপ হতে লাগল। তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শিক্ষকতার কাজে শান্তিনিকেতনে নিয়ে এলেন। কিছুকাল পর তিনি শ্রীনিকেতনে গ্রামোন্নয়নের কাজ হাত নিলেন, রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছায় এবং প্রেরণায়।

এর কিছুকাল আগে কালীমোহনের কাছে রবীন্দ্রনাথ শুনেছেন আমার পিতা ক্ষিতিমোহন সেনের কথা। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত কিন্তু সাহিত্যকাব্যরসিক ধর্মে মুক্ত মন—এমনই মানুষের অন্বেষণে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কালীমোহনের কাছে ক্ষিতিমোহনের পরিচয় পেয়ে তিনি সাদর আহ্বান জানালেন তাঁকে। ক্ষিতিমোহনও সাগ্রহে সব কিছু ছেড়ে চলে এলেন শান্তিনিকেতনে ১৯০৮ সালে।

একলব্যের মতো দূরে থেকে যাঁকে অন্তরে গুরুর আসনে বসিয়েছিলেন, দুই যুবক তাঁকেই অন্তরঙ্গভাবে পেয়ে গেলেন এই শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনে। এর থেকে আনন্দের কথা আর কি থাকতে পারে।

বলতে দ্বিধা করব না, এঁদের এবং এঁদেরই মতো কতিপয় নিবেদিতপ্রাণ বিদগ্ধজনেদের রবীন্দ্রনাথের প্রতি অটুট শ্রদ্ধা এবং ত্যাগের ভিতর দিয়ে গড়ে উঠেছে আজকের পৃথিবী-বিখ্যাত শান্তিনিকেতন—শ্রীনিকেতন। শ্রীনিকেতনের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা রইলো কালীমোহন ঘোষের নাম।

গ্রাম উন্নয়নের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করলেও কালীমোহন স্ত্রীপুত্র পরিবারের প্রতি উদাসীন ছিলেন না। স্বল্প আয়ের সংসারে পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে থাকতেন তাঁর ভাগ্নে ভাগ্নীরা, শ্বশুরমশাই-এর মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের কেউ কেউ, আরও কতো আত্মীয়জন। বিলাসিতা ছিল না তাঁর সংসারে। কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য সুখ আনন্দের ঘাটতি ছিল না এতোটুকু। অবিশ্যি এর পিছনে তাঁর সহধর্মিণী মনোরমার অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তেজস্বিনী আমার স্নেহময়ী খুড়িমার কাছে তাঁর স্বামীর ইচ্ছাই ছিল তাঁর ইচ্ছা। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত কি কঠিন পরিশ্রমই না করতে দেখেছি তাঁকে। সেদিন দরিদ্র আশ্রমের দরিদ্র সংসারের হাল যদি তাঁর সুদক্ষ শক্ত হাতে না ধরতেন তাহলে তাঁদের স্নেহের আশ্রয়ে থেকে আত্মীয়-পরিজন সবাই পরবর্তীকালে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন কি? আমাদের শান্তিদা। [শান্তিদেব ঘোষ] আমার বাল্যবন্ধু সাগরভাই [সাগরময় ঘোষ] আজ যে যশের উচ্চতম শিখরে সুপ্রতিষ্ঠিত তার পিছনে আদর্শবাদী পিতা এবং কল্যাণী মাতার উভয়েরই সমান অবদান। একই সৌভাগ্যে আমার স্নেহের ছোটো ছোটো ভাই সমীর [সমীরময় ঘোষ], সলিল [সলিলময় ঘোষ], মণ্টু [সুবীরময় ঘোষ] সবাই যার যার কর্মক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছে। মণ্টুভাই তো তার প্রাণখোলা উষ্ণ সরস ব্যবহারে নামী অনামী ছোট বড়, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলের মন মুহূর্তে কেড়ে নেয়। দূর হয়ে যায় আমাদের মনের সব ক্ষোভ অভিমান। আজকের দিনে উল্লেখযোগ্য বিরল চরিত্র নয় কি? আর তাঁদের একমাত্র কন্যা বাবার আদরের দুলালী সর্বগুণে গুণান্বিতা আমাদের ছোটো বোন বুড়ি—সুজাতাকে, অসহায় অসুস্থ আশ্রমবাসিনীরা শোকে দুঃখে আপদে বিপদে সর্বদা তাঁদের পাশে পেয়ে যান, এ কি কম গুণের কথা। আশ্রমের শ্রেষ্ঠ সন্তান ভুলু কালীমোহনবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শুভময়, যাকে অকালে আমরা হারিয়েছি তার স্বভাবগুণে আমাদের সবার হৃদয়ে চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়ে রইল। এদের সবাইকে নিয়েই তো কালীমোহনবাবুর পরিপূর্ণ ঘরোয়া কাহিনী।

কালীমোহনবাবুর বহুমুখী প্রতিভার কথা, বিদেশে গিয়ে সেকালের যশস্বী কবি, শিল্পীদের কাছে সমাদর পাবার কথা লিখবেন বিদগ্ধজনেরা। তাঁরাই বিশদভাবে লিখবেন গ্রামোন্নয়ন কাজে তাঁর বিশেষ বিশেষ অবদান—ব্রতীবালকদল গঠন, গ্রামীণ পত্রিকা প্রকাশ, ধর্মগোলা, কৃষি সমবায়, স্বাস্থ্য সমবায়, শিক্ষা সমবায়, শিল্প সমবায় আরও কতো কতো রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনাকে রূপ দেবার কথা। গ্রামের মানুষের সেবায় তাঁর আত্মোৎসর্গের কথার কি কোনো পরিসীমা আছে? আমি সেকালের আশ্রমকন্যা ; আজ

বয়েসের শেষপ্রান্তে এসে আমি কিন্তু সবাইকে শুনিয়ে যাব আমার চোখে দেখা তাঁর একান্ত সব ঘরোয়া কাহিনী।

কালীমোহনবাবুর বাড়িতে দেখেছি গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে আসা হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে মানুষের সমাগম। তাই বাড়ির সামনে সব সময়েই থাকত অপেক্ষমান কয়েকটি গরুর গাড়ি। চাষবাস শিক্ষা স্বাস্থ্য ছাড়াও নানাবিধ সামাজিক বিধিবিধান লঙ্ঘন, মামলা মোকদ্দমা সমাধানেও গ্রামের মানুষেরা জজ ম্যাজিস্ট্রেট ছেড়ে আসত তাঁরই কাছে। তাঁর বিধানই গ্রামবাসীরা প্রসন্ন মনে মেনে নিতো। তাঁকে যে তারা আপনজন বলেই জেনেছিল। পেয়েছিল তাঁর কাছে সম্মান এবং ভালবাসা। তাই তাঁর বিচারের উপর ছিল তাদের গভীর আস্থা। তাঁর কর্মের সাফল্য বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে রইল গ্রামবাসীদের এই নির্ভরতা এবং ভালবাসায়।

আদিবাসী সাঁওতালদের সামাজিক বিধিবিধানের প্রথা ছিন্নভিন্ন। আদিমযুগের নির্মম বিচার প্রথার চল তখনো কিছু কিছু চালু ছিল। এইসব ক্ষেত্রেও নিজের চোখে দেখেছি কালীমোহনবাবু ব্যাকুল হৃদয়ে প্রচলিত সামাজিক রীতি-ভঙ্গকারী আদিবাসীদের সেই নির্মম বিচারপ্রথা থেকে রক্ষা কোরে সবাইকে সুপরামর্শে শান্ত কোরে যার যার বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছেন।

গ্রামোন্নয়নের কাজে কালীমোহনের নাম তো সর্বজনবিদিত। কিন্তু তাঁর সূক্ষ্ম শিল্পীমনের পরিচয় আজ খুব কম লোকেই জানেন। ইদানীংকালে শ্রীনিকেতনে শিল্পসদন সেজে উঠেছে নানা শিল্পকাজে, তার পিছনে রথীদা [রথীন্দ্রনাথ], প্রতিমা বৌঠানের পাশাপাশি কালীমোহনের অবদানের কথা জানিনা কজন মনে রেখেছেন। হারিয়ে যাওয়া গ্রামীণ নানা শিল্পের পুনরুদ্ধারে আমরা দেখেছি তাঁর কতো আগ্রহ।

শুনেছি একদা অজয় নদীর ধারে ইলেমবাজার গ্রামটি ছিল দূর দূর থেকে আসা নানাবিধ জিনিসের বেচাকেনার বিশেষ স্থান। তাই বিভিন্ন জায়গা থেকে শিল্পীরা এসে এখানে ঘর বেঁধেছিলেন। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে ইলেমবাজারে সেই বেচা-কেনার রমরমা আর রইল না। ফলে একে একে শিল্পীরা অন্তরালে পড়ে গেলেন। কালীমোহনবাবু নতুন কোরে আবার খুঁজে খুঁজে বার করলেন তাঁদের। নিয়ে এলেন তাঁদের শ্রীনিকেতনে। নতুন কোরে আবিষ্কৃত গালা-শিল্পীদের কাছে কাজ শিখে রথীদা প্রতিমা বৌঠানের সহায়তায় শুরু হল শিল্পসদনে কতো সুন্দর সুন্দর গালা শিল্পের কাজ।

মনে পড়ে বিয়ের পর যখনই বাপের বাড়িতে আসতাম, (আশ্রমকন্যাদের তখন কিঞ্চিৎ অর্থ হাতে এসেছে), শ্রীনিকেতনের শিল্পসদনে গিয়ে আগ্রহে কিনে আনতাম রঙ-বেরঙ-এর ডিজাইনে কাঠের উপর গালার কাজ করা বড়ো ছোটো নানা সাইজের বাক্স, টেবিলে কাগজ চাপা, দোয়াত, পেপার কাটার এবং অতি রুচি সম্মত রঙিন ডিজাইনে বাঁধানো সুন্দর সুন্দর সব আয়না। বিদেশী পর্যটকেরা কিনে নিয়ে যেতেন গালার রঙিন কাজ করা টাই রাখবার লম্বা কাঠের বাক্স, মেয়েদের গয়না রাখার trinket box। সেকালের গালার শিল্পকাজের সুন্দর আয়না, সৌখিন বাক্স আজও কিছু কিছু আমাদের কাছে যত্নে রাখা আছে। কালীমোহনবাবু যদি এইসব হারিয়ে যাওয়া শিল্পীদের খুঁজে খুঁজে বার না করতেন, তবে শ্রীনিকেতনের শিল্পীরা এইসব কাজ শিখতো কার

কাছে? শুনেছি কালীমোহনবাবুর খুঁজে আনা একটি গালাশিল্পী পরিবার নাকি আজও শ্রীনিকেতনে স্থায়ীভাবে বাস করছে। তবে তাদের জীবিকা এখন অন্যপথে।

আজ আবার সেইসব শিল্পীরা অবহেলায় হারিয়ে গেলেন কি? শিল্পসদনে এখন আর তো দেখতে পাই না সেকালের সেইসব গালাশিল্পের সুন্দর সুন্দর সূক্ষ্ম কাজ।

বীরভূমে ডোমেরা নানাবিধ বাঁশের কাজ কোরে থাকে—মোড়া, ডালা, কুলো, চালুনি, মাছ ধরবার পোলো, মাথার টোকা, আরও কতো কি। কুমিল্লা চাঁদপুরের বেতের সূক্ষ্ম কাজের সুনাম সেদিনও ছিল। আজও আছে। ডোমেদের পটল-মাঝিদের কাছে শুনেছি চাঁদপুর কুমিল্লা থেকে বেতের সূক্ষ্ম নিপুণ কাজের নানা জিনিস এনে কালীমোহনবাবু বীরভূমের ডোমেদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে বলতেন—"বেত কোথায় পাবে তোমরা, এই বেতের সূক্ষ্ম সব কাজ দেখে দেখে বাঁশ দিয়েই চেষ্টা করো তোমাদের শিল্পের উন্নতি করতে, সৌন্দর্য বাড়াতে।" সুফল ফলল, আজ দেশ-বিদেশের পর্যটকরা এসে এখানকার ডোমেদের হাতে তৈরি উন্নতমানের মোড়া, মাথার টোকা, টেবিলে খাবার ঢাক্‌না, ফুল সাজানোর ঝাঁপি, আরও কতো কি কিনে নিয়ে যান। অতীতে এর পিছনে কালীমোহনবাবুর উৎসাহ ও প্রচেষ্টার কথা আজকের দিনে খুব কম লোকেই জানেন।

ডোম-দম্পতি এই পটল মাঝি এবং তার বৌকে কালীমোহনবাবুই নিয়ে গিয়েছিলেন রথীদা প্রতিমা বৌঠানের কাছে। উত্তরায়ণে যাবতীয় বাঁশের সৌখিন জাফ্‌রির কাজ এদেরই নিপুণ হাতে বোনা। এঁদের কাছেই কালীমোহনবাবুর অনেক গল্প শুনেছি।

এই প্রসঙ্গে আমাদের ছোটোবেলার একটি মজার গল্প শোনাবার লোভ সামলাতে পারছি না। গুরুপল্লীতে আমরা মুড়ি জলখাবার খাই কাঁসার বাটিতে। চাঁদপুর থেকে কালীমোহনবাবু একবার নিয়ে এলেন বাটির সাইজের কি সুন্দর ছোটো ছোটো সব বেতের ধামা। শান্তিদা, সাগর-ভাইদের সেই ছোটো ছোটো বেতের ধামায় মুড়ি খেতে দেখে আমার কি হিংসে। মুড়িশুদ্ধ কাঁসার বাটি মাকে ফিরিয়ে দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে কাঁদতে লাগলাম—"কাঁসার বাটিতে আমি মুড়ি খাব না। সাগরদের মতো বেতের ধামায় মুড়ি খাবে।" আমার কান্না শুনে ছোট্ট বেতের ধামা হাতে ছুটে এলেন খুড়িমা, কতো আদর করলেন আমায় চোখের জল মুছে গর্বিত মুখে বেতের ধামা কোরে মুড়ি খেতে লাগলাম সাগরদের মতো। ওঃ, সে কী তৃপ্তি। শৈশবকালের এইরকম ছোটো ছোটো কতো মিষ্টি গল্পই না আজ মনে পড়ছে।

ডোমেদের নিশাপতি মাঝিকেও আমরা দেখেছি মোড়া হাতে পথে পথে বেচে বেড়াতে। কালীমোহনবাবু আবিষ্কার করলেন তার মধ্যে প্রতিভা। মোড়া বেচার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নানাভাবে শিক্ষিত কোরে তুললেন। ফলে একদিন নিশাপতি মাঝি পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হলেন। পাল্টে গেল নিশাপতি মাঝির বাইরের রূপ। এইসব অবহেলিত শিল্পীদের চিনে চিনে বার করবার জহুরী কালীমোহনবাবু কিন্তু রয়ে গেলেন অন্তরালে।

তিন বছর বর্মাদেশে মান্দালয়ে কাটিয়ে ১৯৪০-এ স্বামীর সঙ্গে ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে কলকাতায় সবে ফিরেছি, সেখানেই পেলাম কালীমোহনবাবুর আকস্মিক মৃত্যুর

খবর। আশ্রমজীবনে স্নেহ পাবার প্রধান একজনকে হারানোর ব্যথা আজও মনকে বিষণ্ণ কোরে তোলে। সেদিন শান্তিদাকে সান্ত্বনা দিয়ে লেখা চিঠির শেষ দুটি লাইনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"লোকহিতব্রতে তাঁর যে জীবন, ত্যাগের দ্বারা পুণ্যোজ্জ্বল ছিল, মৃত্যু তার সত্যকে খর্ব কোরতে পারে না এই সান্ত্বনা তোমাদের শক্তিদান করুক।"

আমার স্মৃতিতে কালীমোহনবাবুর ঘরোয়াকাহিনী সম্পূর্ণ হবে না তাঁর সহধর্মিণী মনোরমার কথা আরও একটু না বলে।

১৯৭১-এ স্বামীকে হারিয়ে একা আছি শান্তিনিকেতনে শূন্য 'প্রতীচী' বাড়িতে। আকুল মন নিয়ে খুড়িমা প্রতিদিন সন্ধ্যায় এসে বসতেন আমার পাশে। আমাকে সান্ত্বনা দিতে হারিয়ে যাওয়া নিজের বুকের ধন ভুলুর কতো কথাই না বলতেন। বলতেন—"কতো অসহায় আমরা। ঈশ্বরের দেওয়া এতো গভীর শোকও আমাকে ভুলে থাকতে হচ্ছে।" শোক-সন্তপ্ত অশান্ত মনকে শান্ত করবার জন্য তিনি গিয়েছিলেন কাশীতে। শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রার থেকে একেবারে ভিন্ন ধারায় বয়ে চলে কাশীর জীবনযাত্রা। সেই ভিন্ন ধারায় বয়ে চলার পথ থরে চলেও ছিলেন কিছুদিন খুড়িমা। আমায় বলেছিলেন, "অমিতা, কাশীর জীবনযাত্রায় মনে কৌতূহল জাগতো। কাশীবাসীদের সঙ্গে ভোরে গঙ্গাস্নানে গিয়েছি, মন্দিরে গিয়েছি দেবদর্শনে, আবার দিনশেষে সবার সঙ্গে গঙ্গার ধারে বসে রামায়ণ পাঠও শুনেছি। ভালও লাগত। কিন্তু কই আমার ভুলুকে হারানোর ব্যথা তো একটুও জুড়োল না। আবার ফিরে এলাম শান্তিনিকেতনে। শেষ পর্যন্ত দেখলাম সুখে-দুঃখে-শোকে শান্তি-নিকেতনই আমাদের শান্তির একমাত্র স্থান। অন্য আর কোথাও নয়।"

আমার জীবনসায়াহ্নে শান্তিনিকেতনে 'প্রতীচী' বাড়িতে বসে যেন আজ অন্তরে শুনতে পাই মাতৃসমা আমার খুড়িমার গভীর অনুভূতির উক্তি—"শান্তিনিকেতনেই আমাদের একমাত্র শান্তির স্থান।"

শ্রদ্ধেয় কালীমোহন ঘোষ এবং তাঁর সহধর্মিণী মনোরমা ঘোষকে আজ বার বার প্রণাম জানাই।

কালীমোহন ঘোষ

লেনার্ড এলমহার্স্ট

LEONARD ELMHIRST ON KALIMOHAN GHOSE

Kalimohan Ghose : "He was the first to help the Poet in carrying out his plan of rural reconstruction in his ancestral estate. In the words of the poet : 'the responsibility of the work I took upon my shoulders, in the teeth of opposition of the educated gentry, was rendered easy of fulfilment by the fact of having Kalimohan at my side. We spent many hours together discussing the possibilities of rural reconstruction. I found in him the makings of a true social worker and without him my task would have been rendered veiy difficult indeed.' Later, he joined the school as a teacher and was sent by the Poet to England to gather knowledge about the various methods of primary education and adult literacy work. With the starting of the Institute of Rural Reconstruction at Sriniketan, he stepped forward to take up once again the duty of service to the humble and poor village folk in a spirit of selfless dedication."

Page-87 (Sriniketan Diary)
L. K. Elmhirst said the following to Rabindranath :
'...After all the area around Ilambazar was famous once for its lac work. Kalimohan has already discovered that of all the many families once engaged in this industry only four survive and they are almost ready for the burning ghat, but Kalimohan wants to rescue them and to establish the industry. We shall have to see what we can do.' (Kalimohan eventually succeeded in putting in the local lac workers back on their economic feet)."

Page-93
"Not long after my arrival Tagore had explained to me how, whilst he was absent in Europe and had left Andrews in-charge, politics had invaded his ashram and had won many of the staff and students away from education and in the direction of Gandhi's political programme. 'A handful only', he said, 'has remained loyal to my original plan and ideas and I hope you can make good use of one or two of them since they are hot very popular up here any more.' He then introduced me to Kalimohan Ghose, tall, lean with a fine romanesque nose, a ready sense of humour and packed with nervous energy.

I must have made a date with him immediately to spend Monday visiting farms and villages within reach on foot in the neighbourhood., No one else had yet suggested to me a visit to a village and this illustrated clearly the statement Tagore had made to. me a year ago, 'I have-an .educational institution which is. mainly academic and quite isolated from the villages around, which are in various stages of decay."

[From *Poet and Plowman* by L. K. Elmhirst.]

কালীমোহনকে : বিদেশী বন্ধুরা

LETTERS TO KALIMOHAN GHOSH

While residing in England for further education, Kahmohan Ghosh had a close association with eminent personalities of that country. No doubt, these personalities bore a deep affection for Kalimohan.
We print here some of the letters written to Kalimohan. Among the writers one Ezra Pound, the poet, and William Rothenstein, the sculptor, and other well-known personalities.

4, Edwards Sq. Studios.
W

Nov. 26, 1912
Dear Mr. Ghose,
Friday the 6th or Monday the 9th are the dates when Mr. Pound is free, and it will give us great pleasure if you come to tea on either of these afternoons to meet him at 4 O' Clock

Very truthfully
Miss Sinclair.

STATION } CHARLFORD
TELEGRAMS }

ILES FARM
FAR OAKRIDGE
NR. CHARLFORD, GLOS.
Jan 7–13

My dear Kalimohan,
I expect to be in London for a day or two next week. Will you be prepared to sit to me a-day a week, Tuesday next 14th at ten O' Clock? I hope you have been keeping well–many many thanks for getting me the 2nd Vol. of the book you so kindly gave me. I have been very happy here in the country, getting the direct inspiration of nature all day. Every day we have good news from the poet in America–I have brought no book here with me other than Gitanjali the unpublished poems of which I never tire, which are a constant source of happiness–inspiration to my mind.

Always your sincere friend
W. Rothenstein.

STATION }
TELEGRAMS } CHARLFORD. G. W. R

FAR OAKRIDGE
NEAR STROUD, GLOS.
June 17–13

My dear Kalimohun

I am not in Hampstead enough to able to make'- up of your kindness in sitting to me. Now I want you to tell me quite frankly whether you can manage to live comfortably without the small help my work has given you. I do not know whether the lessons you are giving Ananda Coomarswamy serve the same purpose. Please let me know just how you are situated, and if any help from me to make you to continue your studies will still be of material importance to you, you can count upon it. I often think of the pleasure the sittings gave me and of the many talks we had together and wish I could see you oftener. My short visits to London are always so crowded and breathless that I can make no real use of them so far as seeing my friends quietly is concerned although they have evoked me to see something of the good and greatman to whom we are all so deeply devoted. Please remember me to Ramananda Babu's son. Write and tell me what I am asking by return.

Always your sincere friend
W. Rothenstein.

House of Commons.
18.1.1913

Dear Sir,

My friend, Mrs. Grace Rhys's asked me to send you a copy of this leaflet I have written.

Yours truly.
I.King.

TELEPHONE
1668 WESTERN

SUN HOUSE,
CHELSEA EMBANKMENT.
Friday Oct. 2 1914.

My dear Kalimohon,

You will, I hope, receive by the same mail that brings this letter a copy of "The Challange", in which you will find an unsigned article, entitled "The Christian Warrior". I am sending it to you because the article is by Johnston and it explains, why, he, as a Christian, felt it right to go to war. I am sure you will be interested to read it, and it raises questions which need thinking about. He is still in camp on the downs near Portsmouth, busily engaged in training 200 very rough recruits. He thinks that his battallion perhaps be ordered to the front in November.

The papers this morning are full of the Indian troops. No doubt, the way India has come forward has profoundly changed the popular feeling about India in England. Two of my Indian friends have told me that they are conscious of being looked at with warm welcome, whenever they go to London. Someone else told

me that when the message from India was read in the House of Commons, the House was moved in a way which people present had never seen before. I hope that out of this new feeling, a day of better things may dawn for India. If for many nations the conflict will bring in the end a richer and truer life, those who give their lives will not have died in vain. The moment is big with possibilities, and it all depends how we use it

I hope I shall soon get another letter from you, telling me how this world-convulsion is affecting your quiet life in Bolepore.

Yours ever affectionately.
Edwyn Bevins.
Wales.

Dear Ghose,

I'm sorry but it was really tomorrow (Thursday) that I expected you to lunch. Do come then, if you. can.

I'm sorry to have been so indefinite.

Yours ever
Ezra Pound.

March 9th

Ganeshkhind Lodge
Westby Rood
Boscombe.

Dear Mr. Ghose.

I was very glad to get your letter and shall be very pleased indeed to see you when you can come to read the Bible rituals. If Tuesday next between 5.30 and 6 O' Clock, will suit you I shall be very glad and I will keep that time open till I hear from you. God means us to be dissatisfied apart from Him that He alone may satisfy us-as you the distractions of a city are great but God is just as near only it is difficult at times to realize this.

Hoping to see on Tuesday. We are down here for this week-end but hope to return on Tuesday morning.

Yours very sincerely
Evelyn. I. R. Hughes.

March 22nd

107. COLEHERNE COURT,
SOUTH KENSINGTON,
S. W.

Dear Mr. Ghose.

I hope that after all you did not get Influenza as you feared but this weather is very treacherous. I am so glad you are giving little time to Bible study this vacation. If you honestly desire to know Christ He will show you just how much of your life he wants and what place in it–Revelation is gradual but it is absolutely certain who, truly seeking to know the truth. I think you would find it better ro read a book rather than a chapter. For instance, if you can read through the epistle

to the Romans, one argument runs right through. Last night I heard a striking sermon on Pilate, this Judge apparently judging Christ but really being judged by Christ, You will find the account in Ins. 18 vers. 28. to the end of the chapter and' then it goes on in chapter 19. Yesterday as you know was the day on which we commemorate Christ's death on the cross and tomorrow His resurrection with all it means of a diring present Personal Christ who is interested in every little detail of our lives we rejoice to in the great certainly that Yester brings us of resurrection for ourselves, these we have lost for a while by death. Complete satisfication in this life and certainly for the next that is the gospel of Christ.

I hope you have good news from India every week ? With kind regards.

Yours sincerely
Evelyn. J. R. Hughes.

Should I not see you before going abroad will you address to me there.

C/o Miss Jwudie
Zes marrotniss.
Avenue Morimont
Lausamye
Switzerland.

Seal
Board of Education

29.8

Dear Mr. Ghose,

I am sorry that you have to go back to India so soon. Nevertheless you have contrived to see a good many of our best schools and the experience so gained ought to help you in furthering your own ideas.

Yours very sincerely
W. K. Spencer.

[*বিশ্বভারতী নিউজ*, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ সংখ্যা থেকে মুদ্রিত।]

পিতৃস্মৃতি

সলিল ঘোষ

কালীমোহনের চতুর্থ পুত্র সলিল ঘোষ বহুকাল যাবৎ মুম্বাই-প্রবাসী। এখন তাঁর বয়স ৮৬। কালীমোহনের ছয় পুত্র ও এক কন্যার মধ্যে একমাত্র তিনিই জীবিত এখন (২০০৫)। তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম পিতার স্মৃতিচারণ লেখার। তার উত্তরে সলিলবাবু লিখছেন রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে (১৯৩৫-১৯৪১) বিশ্বভারতীতে প্রবীণ-অধ্যাপক বিধুশেখর শাস্ত্রী, জগদানন্দ রায়, কালীমোহন ঘোষ, নেপালচন্দ্র রায় প্রমুখ তৎকালীন কর্তৃপক্ষের কাছে যে-ভাবে অপমানিত উপেক্ষিত হয়েছিলেন তার ইতিহাস আর না বলাই ভালো। ওসব লিখে লাভ নেই। শুধু মনে আছে শ্রীনিকেতনে এক পদস্থ সরকারি কর্মচারীকে নিয়োগ করা হয়েছিল। সেসময় বাবাকে নানাভাবে হেনস্থা করা হয়। বাবা তখনই উচ্চ রক্তচাপের রোগী হয়ে পড়েন। সেকালে তেমন কিছু ভালো ওষুধও ছিলনা। বাবাকে মা কেবল পাথরকুচি পাতার রস খাওয়াতেন রক্তচাপ কমাবার জন্যে। ... ওই সময়ে বাবা মাসে ২৫০ শো টাকা বেতন পেতেন। তাও মনে পড়ছে। মাকে ২০০ টাকা দিয়ে নিজের হাতখরচের জন্য রাখতেন ৫০ টাকা।...

বাবা ছিলেন সাদাসিধে মানুষ—পরনিন্দা পরচর্চায় থাকতেন না—ওখানকার ঘৃণ্যস্থানীয় পলিটিক্স বুঝতে পারতেন না। অত্যন্ত সরলমনা লোক। তাঁকেও 'ব্রিটিশের চর' বলে অপবাদ শুনতে হয় ক্ষমতালোভী কর্মচারীর কাছে বাবা তা সহ্য করেন নি—কর্মীদের চা-চক্রে উপস্থিত হয়ে সেই ব্যক্তিকে ভর্ৎসনাও করে এসেছেন।

আমার একটা ঘটনা খুবই মনে পড়ে। একবার ছেলেবেলায়, অজয় নদীতে প্রবল বন্যায় আশপাশের গ্রামগুলি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খবর পেয়ে বাবা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেখানে ভেদিয়া হয়ে। বাবা গ্রামের লোকদের সঙ্গে ত্রাণকার্য ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত—আলাপ-আলোচনা করছেন আমি একলা, এদিক ওদিক ঘুরে সব বিপর্যস্ত—বিধ্বস্ত গ্রাম দেখলাম। সে এক অভিজ্ঞতা। তারপরে সন্ধ্যার পরে রেললাইন ধরে হেঁটে বোলপুর ফেরা।...

বাবার মৃত্যু দিন (১০-৫-১৯৪০)। শান্তিনিকেতনে গরমের ছুটি—এখনও চোখের সামনে ভাসছে। বাবা সন্ধ্যাবেলায় সামনের বারান্দায় বসে শ্রীনিকেতনের ২/৪ জন সহকর্মীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। আমি ভিতরের ঘরে—মা রান্না ঘরে। দাদা (শান্তিদেব) তখন বাইরে—সংগীত ভবনে বা কোথাও। হঠাৎ বাবা মাথা ঘুরে পড়ে যান! সবাই তাঁকে ধরে ঘরে নিয়ে এসে খাটে শুইয়ে দেন। আমি ভাবছি এখুনি উঠে বসবেন। দাদা এসে, সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল নিয়ে ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনলেন। উনি এসে 'মৃত্যু' ঘোষণা করলেন—haemorrhage in brain তা-ও বলে দিলেন। আমি তখনও বিশ্বাস করিনি 'মৃত্যু' ঘটেছে! ভেবেছি ঘুমিয়ে আছেন। একটু পরে ঠিক উঠবেন। কিন্তু তা আর হল না। আমি শ্মশানে যাইনি। বারান্দায় বসেছিলাম। দাহ করতে নিয়ে যাওয়া হল। কেমন এক শূন্যতা আচ্ছন্ন করেছে আমাকে।

রচনাপঞ্জি

মুদ্রিত রচনা :

১ জাপানের গৃহধর্মনীতি, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২০
২ লোকশিক্ষা ও শিক্ষিত সমাজ[১], তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ও কার্তিক ১৩২১
৩ শৈশবে ভাষাশিক্ষার সহজপ্রণালী, প্রবাসী, মাঘ ১৩২৫
৪ মুক্তিদাপ্রসাদ[২], 'শান্তিনিকেতন' পত্র, আশ্বিন ও কার্তিক ১৩২৬
৫ ৭ই পৌষের মেলা, 'শান্তিনিকেতন' পত্র, মাঘ ১৩২৬
৬ প্রাচীন ভারতে শ্রমজীবী সমস্যা, 'শান্তিনিকেতন' পত্র, বৈশাখ ১৩২৭
৭ বীরভূমের সাঁওতাল প্রতিবেশী, 'শান্তিনিকেতন' পত্র, ভাদ্র ১৩২৭
৮ শৈশবে ভাষাশিক্ষার সহজপ্রণালী, প্রবাসী, মাঘ ১৩২৮
৯ পল্লীসেবা, সংহতি, প্রথম বর্ষ, আশ্বিন ও কার্তিক ১৩৩০
১০ বাউল গান (সংকলন), 'শান্তিনিকেতন' পত্র, শ্রাবণ ১৩৩১
১১ শ্রীনিকেতন পল্লী-সংগঠন বিভাগের প্রতিবেদন, 'শান্তিনিকেতন' পত্র, বৈশাখ ১৩৩৩
১২ ব্রতীসঙ্ঘ ও নৈশ-বিদ্যালয়, ব্রতীবালক, আষাঢ় ১৩৩৬
১৩ ম্যালেরিয়ার প্রতিকার, ব্রতীবালক, শ্রাবণ ১৩৩৬
১৪ শিক্ষাকেন্দ্র, ব্রতীবালক, আশ্বিন ১৩৩৬
১৫ ব্রতীবালক সম্মিলন, ব্রতীবালক, মাঘ ১৩৩৬
১৬ স্বদেশীশিল্প, ব্রতীবালক, বৈশাখ ১৩৩৭
১৭ কুটীরশিল্প ও বিলাতিবর্জন, ব্রতীবালক, আষাঢ় ১৩৩৭
১৮ বিলাতযাত্রীর পত্র, ব্রতীবালক, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৩৭
১৯ জার্মেনীর যুব-আন্দোলন, ব্রতীবালক, বৈশাখ ১৩৩৮
২০ কর্মী-সংগঠন, প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৯
২১ অন্ধ্রদেশে রবীন্দ্রনাথ, দেশ, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৩

১ দক্ষিণ চাঁদপুর সম্মিলনীর অধিবেশনে পঠিত। প্রবাসী 'কষ্টিপাথর' বিভাগে কার্তিক ১৩২১ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

২ প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ('মুলু') অকালমৃত্যুর পর সংকলিত, 'প্রসাদ'-এ পরবর্তীকালে অন্তর্ভুক্ত।

২২ সিংহলের কথা, দেশ, ৩০ জুন ১৯৩৪
২৩ পল্লীসংগঠনের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ, জয়শ্রী, কার্তিক ১৩৪৬
২৪ শ্রীনিকেতনে পল্লীস্বাস্থ্য সংগঠন, দেশ, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৩৯, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৪০
২৫ অস্পৃশ্যতা, মেঘনা, আষাঢ় ১৩৪৮
২৬ পল্লীর আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ, দেশ, ৩১ শ্রাবণ ১৩৪৮

অনুবাদ :
Certain Poems of Kabir, translated by Kalimohan Ghose and Ezra Pound, Modern Review, June, 1913
Towards the Village (translated from Kalimohan Ghose's unpublished diary). Community : Tagore Centenary Number, Visva-Bharati, 1961.

পুস্তিকা :
১ শ্রীনিকেতন পল্লী-সেবাবিভাগের প্রতিবেদন, ২৭ চৈত্র ১৩৩১
২ পল্লী-পরীক্ষণ : বল্লভপুর ১৩৩৩
৩ সভাপতির অভিভাষণ। ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা, ১৩৩৫
৪ কৃষি-উন্নতি। বিশ্বভারতী-শ্রীনিকেতন, ১৩৪১
৫ স্বাস্থ্যের কাজে শ্রীনিকেতন। শ্রীনিকেতন পল্লীসেবাবিভাগ, ১৩৪২
৬ বীরভূমের স্বাস্থ্য ও অন্নসমস্যা। শ্রীনিকেতন পল্লীসেবাবিভাগ, ১৩৪৩
৭ নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সম্মিলনী, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ। পঞ্চদশ অধিবেশন, কুমিল্লা, ১৯৩৬
৮ বাঁধগোড়া গ্রামে পল্লীসংগঠন। শ্রীনিকেতন পল্লীসেবাবিভাগ, ১৩৪৪
৯ দার্জিলিং-এ আলুর চাষ। শ্রীনিকেতন পল্লীসেবাবিভাগ, ১৯৩৮
১০ সাঁওতাল কেন্দ্রে পল্লীসংগঠন। শ্রীনিকেতন পল্লীসেবাবিভাগ, ১৩৪৫
১১ Rural Survey : Ballabhpur, Sriniketan, Village Welfare Department, Visva-Bharati, 1926
১২ Rabindranath Tagore, Educator and Economist, 1931
১৩ Raipur, Rural Survey of a Village in Birbhum, 1933
১৪ The Health Scheme of Village Welfare Work. Lohagarh—A Survey Report. Scheme and Programme of the *Brati Balaka* Activity, Sriniketan

অতিরিক্ত তিনটি মুদ্রিত রচনার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে কালীমোহন ঘোষের ব্যক্তিগত ফাইল থেকে :
১ শ্রীনিকেতন ও পল্লীসংগঠনের আদর্শ, আনন্দবাজার পত্রিকা ; তারিখ পাওয়া যাচ্ছে না
২ একান্নবর্তী পরিবারই পল্লী সমাজের ভিত্তি, কোনও দৈনিক পত্রিকায় মুদ্রিত, তারিখ পাওয়া যাচ্ছে না।
৩ লোক-শিক্ষা, নবশক্তি; তারিখ নেই

অপ্রকাশিত ডায়রি

পল্লীর পথে

স্বহস্ত লিখিত বা স্বাক্ষরিত পাণ্ডুলিপি এবং অপরের কৃত প্রেস কপি বা কপি :

১ বাংলার ভাব ও তাহার অভিব্যক্তি
২ ডেনমার্কের লোকশিক্ষা
৩ বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভার উদ্দেশ্য
৪ প্রাচীন ভারতে পল্লীসংগঠন
৫ শ্রীনিকেতনে কাজ শুরু ও কাজের অভিজ্ঞতা
৬ পল্লীর বর্তমান অবস্থা ও শ্রীনিকেতন পল্লী সংগঠন
৭ পল্লী সংগঠন সমিতির অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ, শ্রীনিকেতন
৮ লোহাগড়া মুসলগ্রামের রিপোর্ট
৯ বিশদ রিপোর্ট—সুরুল গ্রাম
১০ গ্রামীণ ক্রীড়া, ব্রত, পূজা—রায়পুর গ্রাম
১১ গ্রামীণ সামাজিক অবস্থা—বীরভূম
১২ সাম্প্রদায়িকতা ও পল্লী সংগঠন বিষয়ক বক্তৃতা
১৩ সামাজিক গোঁড়ামি—বীরভূম ও শ্রীনিকেতনের পার্শ্ববর্তী গ্রাম
১৪ শ্রীনিকেতন স্বাস্থ্য সংগঠন

এই রচনাগুলির কোন্‌টি প্রকাশিত ও কোন্‌টি অপ্রকাশিত তা অনুসন্ধানের বিষয়।

ইংরেজী রিপোর্ট : টাইপ কপি ও কিছু স্বহস্তলিখিত, বিদেশ ভ্রমণ ও তথাকার সমবায় আন্দোলন ও উদ্যোগ—১৯৩১ :

১ ডেনমার্ক
২ বার্লিন
৩ মিউনিক
৪ ভিয়েনা
৫ বুদাপেষ্ট
৬ প্যালেস্টাইন

শান্তিনিকেতনে হাতে-লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা :

কালীমোহন প্রথমবার বিদেশ থাকাকালীন শান্তিনিকেতন আশ্রমবিদ্যালয়ের ছাত্রদের, বিদেশে তাঁর বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অবলম্বনে অনেক রচনা (অধিকাংশই পত্রাকারে) পাঠিয়েছিলেন ; সেগুলি তৎকালীন শান্তিনিকেতনের একাধিক হাতে-লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ; ওই রচনাগুলিরও একটি তালিকা সংকলনযোগ্য।

প্রসঙ্গ : কালীমোহন
আলোচনায় স্মৃতিকথায় :

১ কালীমোহন স্মৃতি—পুস্তিকা। শান্তিনিকেতন

২ ব্রতীবালক—১৩৩৭, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ

৩ কালীমোহন স্মৃতি—ক্ষিতিমোহন সেন, প্রবাসী ১৩৪৭ আষাঢ়

৪ Visva-Bharati News—১৯৪০ জুলাই

৫ ঐ—কালীমোহন স্মরণ সংখ্যা, ১৯৪০ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি

৬ রাশিয়ার চিঠি—রবীন্দ্রনাথ

৭ শ্রীনিকেতনের রূপ ও বিকাশ—রবীন্দ্রনাথ

৮ পল্লীপ্রকৃতি, শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ—রবীন্দ্রনাথ

৯ রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১০ আমার সাহিত্যজীবন—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

১১ গুরুদেবের শান্তিনিকেতন—প্রফুল্লকুমার সরকার

১২ রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন—প্রমথনাথ বিশী

১৩ আমাদের শান্তিনিকেতন—সুধীরঞ্জন দাস

১৪ শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ—শচীন্দ্রনাথ অধিকারী

১৫ জমিদার রবীন্দ্রনাথ—অমিতাভ চৌধুরী

১৬ রবীন্দ্রনাথের চেনাশোনা মানুষ—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১৭ শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১৮ Poet And Plowman—এল. কে. এলম্‌হার্স্ট

১৯ আমার পিতৃদেব—শান্তিদেব ঘোষ, দেশ ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

২০ রবীন্দ্র-পত্রাবলী : তথ্যপঞ্জী—গৌরচন্দ্র সাহা

২১ শান্তিনিকেতনের একযুগ—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

২২ রবীন্দ্র-পরিকর—পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়

২৩ রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বচর : কালীমোহন ঘোষ—অমিতাভ ঘোষ, বিশ্ববীণা/১৫ বর্ষ/৩য় সংখ্যা ১৯৪০

কালীমোহন ঘোষকে উৎসর্গী-কৃত গ্রন্থ :

বিশ্ববিদ্যার আনন্দ-প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথ : ২য় খণ্ড—অমিতাভ ঘোষ

জন্মশতবার্ষিকী সংবাদ

KALIMOHAN GHOSH CENTENARY

The birth centenary of Kalimohan Ghosh was observed on 29 January 1929 at a ceremony held in the Amrakunja. Kalimohan Ghosh was a close associate of Rabindranath and had worked for many years in the Rural Reconstruction Department (Palli Samgathan Vibhaga Sriniketan) of Visva-Bharati. At the ceremony, presided over by Sri Pannalal Dasgupta, aspects of life at Santiniketan then and Kalimohans' contribution, especially in the field of upliftment, were highlighted. Sri Santideva Ghosh, son of Kalimohan, presented a biographical sketch of his father. Sri Upendra Kumar Das' talk contained reminiscences of Kalimohan Ghosh. Excerpts from Kalimohan Ghosh's letters and essays were read out by Smt. Suchandra Basu, Sri Samik Ghosh and other students of Visva-Bharati—Kundan Sasmal, Reena Mohdal, Suchismita Sanyal, Saikat Qudungu and Nibit Datta. At the end of the meeting the Chief Guest, Sri Pannalal Dasgupta, spoke about Rabindranath's aims and achievements concerning rural progress, and warned against neglecting those goals. The Upacharya, Sri Nemai Sadhan Bose, read out two of Rabindranath's letters, and asserted once again Kalimohan Ghosh's invaluable contribution to Santiniketan and Sriniketan.

An exhibition composed of photographs of Kalimohan and his associates was held at Rabindra Bhavana on this occision.

কালীমোহন ঘোষের
বংশধারা*

দীননাথ ঘোষ—শ্যামাসুন্দরী

কালীমোহন—মনোরমা (ছয় পুত্র ও এক কন্যা)

১. শান্তিদেব—ইলা (নিঃসন্তান)

২. সাগরময়—আরতি
↓
সারণী—সোমেশ
আলোকময়—মৈত্রেয়ী

৩. সমীরময় (অকৃতদার)

৪. সলিল—শার্লেট (নিঃসন্তান)

৫. সুবীরময় (অকৃতদার)

৬. সুজাতা—সুখময় মিত্র
↓
সুচন্দ্রা (আঁখি)—তরুণ বসু
শান্তনু—অনুরাধা
শুভাশিস—নীলাক্ষি

৭. শুভময়—সুপ্রিয়া
↓
শমীক—অনুত্তমা

কালীমোহন ঘোষের রচনা

পল্লীসেবা

বর্তমান শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষাতত্ত্ববিদগণ যেমন মনে করেন যে, শিশুদিগের মনোবৃত্তিকে উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহার স্বাভাবিক গতির বিকাশের অনুকূলতা করিতে হইবে—নিজের ছাঁচে শিশু গড়িয়া তুলিবার পুরানো পদ্ধতি আর চলিবে না, পল্লীগঠন সম্বন্ধে আমাদের মতও সেইরূপ।

পল্লীর একটি সমষ্টিগত মনোবৃত্তি আছে। সে নিয়তই কিছু সৃজন করিতেছে, তাহার পশ্চাতে সহস্র বৎসরের ধারাবাহিকতা রহিয়াছে। ইহার গতি কোন্ দিকে তাহা পর্যালোচনা করিয়া সেবকের জীবনকে তদনুযায়ী গড়িয়া তুলিতে হইবে। নতুবা শহরের বাঁধা মত অর্থাৎ political economy-র বাঁধা বুলিগুলি পল্লীর ঘাড়ে চাপাইয়া শিবের স্থানে বাঁদর গড়িয়া ফেলিবার ভয় রহিয়াছে। কথাটি আরো পরিস্ফুট করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব।

হিন্দু মুসলমানের মিলন সম্বন্ধে আমাদের ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক প্রকার ধারণা আছে। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষিতদের অগোচরে, সমাজের নিম্নস্তরের জনগণের মধ্যে এই মিলনের একটা চেষ্টা স্বভাবতই চলিয়াছে। তাহার ক্রিয়া প্রতিনিয়তই মিলনের নব নব ক্ষেত্র সৃষ্টি করিতেছে।

বীরভূম জেলার একটি মুসলমান পল্লীতে রাধু গোপ নামক একজন হিন্দুর লিখিত মহরম সম্বন্ধে একটি কাব্য পাওয়া গিয়াছে। তাহার উপরে লিখা "শ্রীহরি সহায়", ভিতরে মহম্মদের গুণগান।

এই কাব্যের ভিতরে দেখিতে পাই যে কবি একদিকে মুসলমানদিগের মহরমের ভিতরকার ভাবকে পরিপূর্ণ আবেগের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। অপরদিকে তারই মধ্য দিয়া কবি অগোচরে অলক্ষ্যে তাহার উপর হিন্দুর মনের ছাপ রাখিয়া দিয়াছেন। পল্লীসাহিত্যের মধ্য দিয়া এই যে ঐক্যের সূত্র হইতেছে তাহার মূল্য খুব বেশি।

২

আর একটি জিনিস এই বীরভূমে দেখিয়াছি যাহা আমার নিকট খুবই শিক্ষাপ্রদ বলিয়া মনে হইতেছে।

প্রত্যেক জাতির যেমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, প্রত্যেক জিলার লোকেরও তেমনি একটা বিশিষ্ট মনোবৃত্তি আছে। বীরভূম জিলা জয়দেবের ও চণ্ডীদাসের জন্মভূমি। তাই সঙ্গীতের অসাধারণ প্রভাব আমাদের সর্বত্র অনুভূত হয়। কীর্তনই এই জিলার বিশেষত্ব। প্রতি গ্রামে গ্রামে বৈষ্ণব কবির হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্বেও কৃষকগণ মাঠের কাজ শেষ করিয়া অবসর সময় কীর্তন কথকতায় আনন্দ অনুভব করিত।

তারপর মুসলমান আমলে নবাবী দরবারে ঠুংরি, খেম্‌টা ইত্যাদির হালকা সুর ও হালকা নৃত্য আসিয়া কীর্তনের ভাবাবেগপূর্ণ নৃত্য ও সঙ্গীতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে থাকে। অর্থাৎ রামায়ণ গান ও কীর্তনের পালার প্রতি ঝোঁক কমিয়া সাধারণ পল্লীবাসীগণ ঝুমুর খেমটায় মাতিয়া উঠিল। তখন পল্লীর ধর্মবুদ্ধির সহিত আমোদপ্রমোদের কুরুচিপ্রিয়তার বিরোধ বাধিল। তাই সঙ্গে সঙ্গে নতুন সৃষ্টির চেষ্টা জাগিয়া উঠিল। মুসলমানী পীরের গান বীরভূমের পল্লীতে প্রবর্তিত হইল। পীরের গান শুনিতে গিয়া মনে হইল যে, আমাদের দেশের প্রাচীন রামায়ণের প্রভাব ইহার উপর প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। পীরের গানের রচয়িতা হিন্দু ও মুসলমান কবিগণ পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদান দ্বারা অভিনব কাব্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন।

কথকতা ও গানের আশ্চর্য সমাবেশে সাধারণ কৃষক সম্প্রদায়ের উপরে ইহার প্রভাব অসাধারণ। ঝুমুর গানের ভিতর হইতে 'নটো' গানের উৎপত্তি। 'নটো'তে ঝুমুরের অশ্রাব্য ও কদর্য কলুষিত রুচি নাই। মুসলমান গ্রামেই এই গানের বিশেষ প্রাধান্য। হিন্দুদিগের যাত্রার ধরন ইহারা অনুকরণ করিয়াছে। কিন্তু তাহা হইতে এই 'নটো' অনেক সাদাসিদে ; ইহাতে কীর্তনের মতো অভিনয় অল্প, গান বেশি। নৃত্যের দিকেও ইহার ঝোঁক খুব প্রবল কিন্তু ঝুমুরের মতো কদর্য নহে। সঙ্গীতের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানী ভাব ও ভাষার অপূর্ব মিশ্রণে ইহা সাধারণের নিকট খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

এই জিলার জনসাধারণের চিত্তকে কোনো বড়ো ভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে সঙ্গীতের ভিতর দিয়াই তাহা সহজ হইবে। স্থানীয় সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানগুলিকে উপেক্ষা না করিয়া ইহাকেই বর্তমান ভাবধারার গতিবেগের অনুকূল করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য।

৩

শান্তিনিকেতনের ৭ই পৌষের মেলায় আমরা নিকটস্থ পল্লীগ্রামের কারুশিল্পের (Arts and Crafts) একটি প্রদর্শনী খুলিয়াছিলাম। তাহার উদ্দেশ্য কী ছিল? যেমন সঙ্গীতের ভিতর দিয়া পল্লীর সমষ্টিগত চিত্তের অভিব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি শিল্পেরও ভিতর দিয়া ও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

এ দেশের কামার কুমার ছুতার সকলের মধ্যেই দেখি কারিগর শুধু লৌকিক প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়া বিচার করিয়া কোনো জিনিস গড়ে না। সে তার চিত্তের একটি

ছাপ তার মধ্যে রাখিতে চেষ্টা করে। এই জন্য অতি সাধারণ সস্তা জিনিসের মধ্যেও এই ভারতীয় শিল্পীদের চারুশিল্পের যত প্রকার বৈচিত্র্য দেখা যায়, জগতের অন্য কোথাও তাহা দেখা যায় না। বিলাতি ধরনের খাড়া গ্লাস বা পেয়ালার আমদানি হওয়ার পূর্বে এ দেশে জল খাওয়ার গ্লাসের যে কত বিচিত্র নক্‌সা ছিল, তাহা এই বীরভূমের কোনো পুরাতন গৃহস্থের গৃহে গেলে দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। প্রকৃত art বা সৌন্দর্যের রসবোধ সমাজের অতি নিম্নস্তরের চিত্তকেও বড়ো বড়ো idea গ্রহণের উপযোগী করিয়া রাখিয়াছিল। বর্তমানে ইহার গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

মাটির দেয়াল ও খড়ের চালার ঘরের উপযুক্ত গৃহসজ্জার কারুকার্য এই জিলায় অতি মনোহর। পুরানো গৃহস্থের বাড়ির কড়ির কৌটা, ডিমের ঝাড়, বিচিত্র কারুকার্যময় সিকে, খেজুর পাতার তৈরি রঙীন নরম পাটি, মাটির কলসির উপর নানাবর্ণের চিত্র, চিত্রিত দেয়ালের গায়ে বিচিত্র নক্সায় সাজানো বাসন, কৃষক ললনাদিগের হাতের তৈরি চিকন কাঁথা প্রভৃতির চিত্রশিল্প দেখিয়া বড়ো বড়ো আর্টিস্টকেও বিস্মিত হইতে দেখিয়াছি।

ইচ্ছা করিলে এই সকল শিল্পের মধ্যে কতকগুলিকে আমরা এখনই উদ্ধার করিতে পারি। কিন্তু আমরা ঘরের দিকে দৃষ্টি না দিয়া শহর হইতে অনেক বিলাতি জিনিস পল্লীর ঘাড়ে চাপাইয়া তাহার সৃজনশক্তি বিনাশ করিয়া বিলাতি অনুসকরণ করিতে শিখাইতেছি। যথা, অনেক দেশসেবককে দেখিয়াছি, তাঁহার পল্লীর অনাথা স্ত্রীলোকদিগকে লেসের কাজ শিখাইতে ব্যস্ত। পল্লীর মেয়েদিগের বিলাতি লেসে নূতন করিয়া হাত মক্‌সো করানো অপেক্ষা বহুযুগের যে কাঁথা-শিল্পের রচনায় তাহারা হাত পাকাইয়াছে, তাহাকেই বর্তমানের উপযোগী করিয়া অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করা যে অধিকতর সহজ ও স্বাভাবিক, একথা তাঁহারা বোঝেন না।

যে সকল নক্‌সা বহুদিনের সাধনার ফলে আমাদের পল্লীললনাগণের চিত্ত-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য সৌন্দর্যের আধার হইয়াছে, কাঁথার মতো করিয়া আমরা সেগুলি টেবিলের কাপড়, শয্যা-আবরণ (bed cover) ইত্যাদিরূপে ব্যবহার করিতে পারি।

৪

যখন আমি চারিপাশের গ্রাম ঘুরিয়া গ্রাম্যশিল্প সকল সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলাম, তখন আমার কোনো শ্রদ্ধেয় বন্ধু মনে করিয়াছিলেন যে ইহা একটি সময়ের অপব্যবহার মাত্র। আমি তাহার এই উত্তর দিই।

প্রথম, আমি মনে করি সেবকরূপে আমার প্রধান কর্তব্য এইসকল কৃষক-সম্প্রদায়ের হৃদয়ের অভিব্যক্তির ধারাটিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করা। বহু শতাব্দীর পরাধীনতার কঠোর নিগড়ও ইহাদিগের এই নিজত্বটুকুকে একেবারে বিলোপ করিতে পারে নাই। সেই ধারাবাহিকতার রূপটিকে ভালো করিয়া জানা চাই। নতুবা অনেক ভালো ভালো সর্বত্যাগী বিদেশী সেবক ও মিশনারীর কর্ম যেন, প্রথমে খুবই জমকালো দেখায় কিন্তু 'কিছুদিন পর দেখা যায় তাহা যেন দেশবাসীর প্রাণের সহিত আর খাপ খাইতেছে না। কোথাও যেন একটা গলদ রহিয়া গিয়াছে। আমাদেরও সেই দশা

হইবে। এদেশে বিদেশী ত্যাগী সাধকদের কত বড়ো বড়ো সেবা অনুষ্ঠান রহিয়াছে, সে-সকল পবিত্র পুণ্য কাজগুলি জনসাধারণের চিত্তের সঙ্গে খাপ খাইতে পারে নাই কেন?

এই শিল্পসংগ্রহের দ্বিতীয় কারণ—শিল্পীমাত্রই চায় সমজদার। সমজদার থাকিলেই যেমন গায়কের প্রেরণা আসে, তেমনি পল্লীর কৃষক-শিল্পীগণের এক সময় সমজদার ছিল তাই তাহাদের প্রেরণাও ছিল। বিলাতি ঠুলি চোখে দিয়া আমরা দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছি। সেইজন্যই সমজদারের অভাবে দেশি শিল্পীর প্রেরণাশক্তিও লুপ্ত হইয়াছে। বিশ্বপ্রেরয়িতার কৃপায় বোলপুরের শান্তিনিকেতন আশ্রম ভারতের আত্মার যথার্থ স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইঁহারা এই পল্লীশিল্পের ভিতর দিয়া ভারতকে দেখিবার দৃষ্টিলাভ করিয়াছেন। এই সকল সত্যদৃষ্টিসম্পন্ন সমজদারগণের সহিত পল্লীশিল্পের যোগসাধন করা আমাদের একটি প্রধান কার্য। ইহা হইতে উভয়দিকের শিল্পে নবীন প্রাণের সঞ্চার হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

৫

'স্বদেশী সমাজে' বহু বৎসর পূর্বে আচার্য রবীন্দ্রনাথ দেশের মেলাগুলিকে গড়িয়া তুলিবার জন্য যে পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া আমরা গত বৎসর বীরভূমের প্রধান প্রধান মেলাগুলিকে ভালোরূপে জানিতে চেষ্টা করি। সর্বপ্রথমে আমরা কেন্দুবিল্বে জয়দেবের মেলা দেখিতে যাই। সেখানে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তাহার প্রভাব আজীবন আমাদের চিত্তে আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিবে। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই বিরাট মেলা চলিয়া আসিয়াছে। লক্ষ লোক কত দূর দূরান্তর হইতে ভক্তির আবেগে ব্যাকুল হইয়া এইখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। কোনো আশ্রয় নাই, কোনো ব্যবস্থা নাই— নদীতীরের উন্মুক্ত প্রান্তরে পৌষ-সংক্রান্তির প্রবল শীতে প্রাণের প্রাচুর্যে প্রকৃতির বিরুদ্ধতাকে উপেক্ষা করিয়া ভক্তগণ গানের ফোয়ারা ছুটাইয়াছে ; শত শত বাউল একতারা ঊর্ধ্বে তুলিয়া নৃত্যের ছন্দে, সুরের ঝঙ্কারে, ভাবের উন্মাদনায় সমস্ত প্রান্তরকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। সেখানে কোনো কর্তা নাই, কোনো কমিটি নাই, কোনো সেক্রেটারির উপদ্রব নাই। প্রত্যেকেই স্বাধীন। এই মেলা প্রত্যেকেরই আপনার জিনিস, হৃদয়ের জিনিস। যার প্রাণে যত রস আছে দীনতম দীন হইলেও সে ব্যক্তিই তত বড়ো। সভ্যসমাজের কৃত্রিমতা সেখানে নাই। সকলেই আত্মহারা হইয়া সুরেতে ভাবেতে নৃত্যেতে আপনার হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থিত যাহা কিছু সম্পদ তাহাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে।

আমাদের তথাকথিত সভ্য ও শিক্ষিত সমাজে যাঁহারা অবজ্ঞাত যাঁহাদের ভিতরকার অতুল সম্পদ আমরা সচরাচর আধুনিক শিক্ষার ঠুলির ব্যবধানে দেখিতে পাই না, তাহাদের অন্তরের এমন পবিত্র রূপ দেখিয়া বিস্মিত ও অভিভূত হইলাম। ফরাসীদেশীয় মনীষী সিলভাঁ লেভি মহোদয়ও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি সৌভাগ্য যে আমি এখানে আসিতে পারিয়াছি। এখানে আসিয়া বাঙালি জাতির যথার্থ পরিচয় পাইলাম। আমি ফিরিয়া গিয়া আচার্য রবীন্দ্রনাথকে বলিব যে, এই জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো ভয়ের কারণ নাই। যে জাতির অশিক্ষিত

জনসাধারণের হৃদয়ের মধ্যে এত বড়ো পবিত্র রসবোধ ও স্পন্দনশক্তি রহিয়াছে, সে জাতি অমর।" একদিকে যেমন পবিত্র সঙ্গীতের ভিতর দিয়া পুরাতন বাংলার খাঁটি প্রাণের রূপ দেখিতে পাইলাম, তেমনি রাস্তার দু'ধারে গাছের তলায় তলায় দরিদ্র দোকানদারের ঝুড়ির ভিতরে অতি সস্তার যে সকল হাঁড়ি-কুড়ি ঘট ও খেলনা দেখিলাম, তাহার শিল্পের ভিতর দিয়াও প্রাচীন বাংলার সৌন্দর্যবোধের এবং রসসৃজনশক্তির আশ্চর্য প্রকাশ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

শ্রদ্ধেয় শিল্পীবন্ধু একটি পুতুল দেখাইয়া বলিলেন, "দেখুন, ইহা যেন জীবন্ত। কি দুঃখ হয় যে এমন জিনিস বাংলাদেশ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই পুতুলটির সর্বাঙ্গে যেন হাসি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এক সময় এই 'আহ্লাদী' বাংলার গৃহে গৃহে কত হাসিই না ছড়াইয়াছে। আর আজ কেন্দুলী মেলা ছাড়া ইহার আদর নাই। চীনামাটির ভাবহীন মরা পুতুল বাঙালির রুচিকে বিকৃত করিয়া দিয়াছে।"

খালি খেলনা নয়, হাঁড়ি-কুড়ি, কত বিচিত্র নক্‌সার নানাবিধ বাসনপত্র দেখিলাম। প্রত্যেকটিরই ভিতরে যেন বাঙালির ভাব ও চিন্তার আনন্দ ও রসবোধের একটা ছাপ রাখিয়া দিয়াছে। এই মেলা দেখিয়া নূতন করিয়া আমাদের চোখ ফুটিল। শহর ও রেলের আক্রমণের বহুদূরে এই অনুন্নত ক্ষুদ্রপল্লীতে আমাদের ইংরেজী-নবিশী সভ্যতা এখনো ইহার প্রাণ নষ্ট করিতে সক্ষম হয় নাই দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।

৬

সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমরা হেতমপুরের মেলা দেখিতে গেলাম। ইহা হালফেসনের ইংরেজী শিক্ষানবিশী এক্‌জিবিসনের নিখুঁত মক্‌সো। বিপুল অর্থশালী জমিদার, ইংরাজি ধরনের বিশাল অট্টালিকা, সাহেব-সুবার আমদানি ইহাতে আছে। কৃষি-প্রদর্শনী, গো-প্রদর্শনী, ম্যাজিক লণ্ঠন, কলিকাতার থিয়েটারের বিচিত্র সুরের অভিনয়, যাত্রা, খেমটা, ঝুমুর, জুয়াখেলা সবই ইহাতে রহিয়াছে। কিন্তু নাই জনসাধারণের স্বাধীনতা। এখানে দারোগা আছে, পাইক-পেয়াদা আছে, সেক্রেটারি কমিটি আছে—কিন্তু নাই জনসাধারণের প্রাণের উত্তাল তরঙ্গ। তাহারা যেন এখানে ভিক্ষুক—ধনীর দরজায় আমাদের কৃপা-ভিখারী। বাউলের একতারার বদলে গভীর রাত্রে গাছের তলায় তলায় অশ্রাব্য কুরুচিপূর্ণ হালকা সুর, কুদৃশ্য নৃত্য বাঙালির পবিত্র সঙ্গীতের বোধশক্তিকে নষ্ট করিয়া দিতেছে। রাত্রের গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে কুৎসিত বীভৎস ভাবের বিষ সমগ্র হাওয়ায় ছড়াইয়া পড়িতেছে। কেন্দুলির তুলনায় মনে হইল ইহা অনুকরণের জিনিস, খাঁটি বাংলার প্রাণ ইহাতে নাই। কি উপায়ে বাংলার এই প্রাণের ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলা যায়, সেইটি আমাদের একটি প্রধান ভাবনা। নানা জিলাতে আধুনিক যে সকল প্রদর্শনী হয়, জনসাধারণের প্রাণকে তাহা খুব সামান্যই স্পর্শ করে। এই সকল মেলাতে বর্তমান কালোপযোগী ভাবের সঙ্গে হৃদয়ের পরিচয় করাইবার জন্য বায়স্কোপ, ম্যাজিক লণ্ঠন এবং তৎসঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার প্রয়োজনেরও একান্ত আবশ্যকতা রহিয়াছে ; কেন্দুলি মেলাতে ইহা আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। কিন্তু এইসকল মেলাকে এমনভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যেন জনসাধারণ সেখানে

আসিয়া তাহাদের অন্তরের দিক দিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা অনুভব করিতে পারে। প্রধানত তাহাদের মনের দিক দিয়া বিচার করিয়াই এই মেলাগুলিকে আমাদের গড়িয়া তুলিতে হইবে। এবং সেইটুকু বজায় রাখিয়া, তাহার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া আধুনিক শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের প্রবর্তন করিতে হইবে। এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আমরা গতবার শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের মেলাটি সেই ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।

৭

বিশ্বভারতীর পল্লীচর্চা বিভাগ হইতে হিন্দু, মুসলমান ও সাঁওতাল এই ত্রিবিধ গ্রামে কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করা হইয়াছে।

সাঁওতালগণ সত্যপ্রিয়, ন্যায়পরায়ণ, অল্পেতে সন্তুষ্ট। ইহাদের স্বভাব কোমল অথচ দৃঢ়। স্বাধীনতাই ইহাদের প্রাণ। ইহারা সর্বদাই বাহিরের অন্য সমাজ হইতে দূরে থাকিয়া নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে স্বাধীন থাকিতে ভালোবাসে, কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি ইহাদের মনে কোনো প্রকার বিদ্বেষ নাই। ইহারা চুরি কাহাকে বলে জানে না এবং সর্বদাই শান্তিতে থাকিতে চায়।

ইহারা সাঁওতাল পরগণা হইতে আরম্ভ করিয়া শালবনের ধারে ধারে ছোটো ছোটো উপনিবেশ স্থাপন করিয়া, জঙ্গল কাটিয়া অনুর্বর কাঁকরময় কঠিন ভূমিকে চাষের উপযোগী করিয়া তুলে। জমির উপর ইহাদের কোনো অধিকার নাই। জমি চাষের উপযোগী হইলেই জমিদার ও জোদ্দারগণ ইহাদের উপর উৎপাত শুরু করে। ইহারা কিছুদিন ধরিয়া অত্যাচার সহ্য করিয়া বেশি বাড়াবাড়ি দেখিলে জায়গা জমি ফেলিয়া দলকে দল সবাই অন্যত্র চলিয়া যায়।

ইহাদের ঘরবাড়ি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চারিদিকে মুক্ত প্রান্তরের মাঝখানে খোয়াইয়ের কাছে— যেখানে ঝরনার পরিষ্কার জল পাওয়া যায়, সেখানেই ইহাদের বসবাস। বিশুদ্ধ জল ও হাওয়া যেখানে নাই সেখানে ইহারা থাকে না। হিন্দু ও মুসলমান-প্রধান গ্রামগুলির ন্যায় সাঁওতাল গ্রামে স্বাস্থ্যসমস্যা গুরুতর নহে।

কঠোর পরিশ্রমের মধ্যেও এমন সদানন্দ জাতি আর বড়ো বেশি দেখি নাই। অত্যধিক অত্যাচারের যেমন ইহারা ভীষণ হইয়া দাঁড়ায়, সামান্য মিষ্টি কথায় তেমনি ইহাদের প্রাণ গলিয়া যায়। নৃত্যগীত ও শিকার প্রভৃতি নিত্য নূতন আমোদ-প্রমোদ ইহাদের লাগিয়াই আছে। তাহাতে সকলেরই সমান অধিকার। ইহার ভিতর দিয়া সামাজিক সাম্যভাব ইহাদের মধ্যে জাগ্রত থাকে।

এই জিলায় সাঁওতালদিগের মধ্যে পঞ্চায়েৎ-শাসন এখনও বিস্তৃতভাবে বিদ্যমান আছে। গ্রামের মোড়লকে ইহারা সর্দার মাঝি বলে। কোনো স্থানে নূতন উপনিবেশ স্থাপন করিবার সময় তাহারা একজনকে সর্দাররূপে নির্বাচিত করিয়া লয়। সেই সর্দারই জমিদারের নিকট জমি সম্বন্ধে দরবার করে, এবং গ্রামের আভ্যন্তরিক মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়া দেয়। সর্দার গ্রাম্য পেয়াদা "গোরেৎ" কে পাঠাইয়া আসামী ও ফরিয়াদীকে তাহার গৃহে আহ্বান করে। "গোরেৎ" অন্য অধিবাসীদিগকেও বৈঠকের সংবাদ জ্ঞাপন

করে। গ্রামের যে-কেহ এই বৈঠকে যোগদান করিতে পারে। সাক্ষ্য দিবার বা আসামী ফরিয়াদীকে প্রশ্ন করিবার অধিকার সকলেরই রহিয়াছে। সর্দার-মাঝি সকলের কথা অবগত হইয়া, সকলের মতামত আলোচনা করিয়া অপরাধীকে দণ্ড প্রদান করেন।

বিভিন্ন গ্রামের সাঁওতালদিগের মধ্যে কোনো বিবাদ হইলে গ্রামের বাহিরের বটগাছতলায় তাহার বিচার হয়। উভয় গ্রামের দুই সর্দার মাঝি ও প্রতি গ্রাম হইতে তাহাদের চারিজন করিয়া সহকারী বিচারের ভার গ্রহণ করে। কিন্তু উভয় গ্রামের যে কোনো লোক উপস্থিত হইয়া তাহার মতামত প্রকাশ করিতে পারে। তাহাতে মীমাংসা না হইলে ইহারা পঞ্চগ্রাম লইয়া সভা করিয়া থাকে।

ইলামবাজারের নিকটে পাঁচমাইলব্যাপী একটি বৃহৎ বন আছে। এই বনে ২৫/৩০টি গ্রামের বিশিষ্ট সাঁওতালগণ বৎসরের বিশেষ দিনে শিকার করিতে যায়। ২/৩ দিন পর্যন্ত ইহারা বনেই থাকে। সারাদিন শিকরের পর সন্ধ্যায় ইহাদের মহাসভার বৈঠক হয়। এই বৈঠকে সমগ্র বৎসরে ইহাদের মধ্যে যাহা কিছু গুরুতর অভিযোগের কারণ ঘটে তাহার মীমাংসা হয়। সমগ্র সাঁওতাল-সমাজের সাধারণ স্বার্থঘটিত ব্যাপারও এইখানে আলোচিত হইয়া থাকে।

এইরূপে এ প্রান্তরে ক্ষুদ্র বস্তির লোক হইয়াও সুদূর ভিনগাঁয়ের স্বজাতির সহিত ইহারা সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। নিজেদের এই বিপুল সমাজের আশ্রয়ে সাঁওতালগণ এতদিন পর্যন্ত বেশ ভালো করিয়াই সঙ্ঘবদ্ধ ছিল। ইদানীং আমাদের সংস্পর্শে আসিয়া এই সঙ্ঘবদ্ধ ভাব ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এখনও সাঁওতাল যদি গ্রাম্য পঞ্চায়েতকে উপেক্ষা করিয়া আদালতে অথবা জমিদারের কাছারিতে নালিশ করিতে যায় তাহা হইলে তাহাকে সমাজের সকলেই অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে।

প্রতিবেশী মুসলমান গ্রামগুলির তুলনায় সাঁওতাল গ্রামে মিথ্যা প্রবঞ্চনা নাই বলিলেই হয়। সাঁওতাল গ্রামে "উন্নি" আখ্যাধারী উকিল দালালগণের আনাগোনা নাই। তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত আইন-ব্যবসায়ীর সহিত পরিচয় অতি স্বল্প বলিয়াই ইহারা এখনও মিথ্যায় পাকা হইতে পারে নাই।

৮

বর্তমানে দেশে মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা যে কত বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ইহাতে দেশের সমূহ ক্ষতি হইতেছে। একবার কোনো মামলাপ্রিয় মুসলমানগ্রামে হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলাম যে, সমগ্র বৎসরের উৎপন্ন শস্য হইতে যে আয় হয় তাহার এক-তৃতীয়াংশ মোকদ্দমায় ব্যয় হইয়া থাকে। গ্রামের কোনো মঙ্গলকর কার্যে তাহারা অর্থ-সাহায্য করিতে পারে না। যখন হিসাব করিয়া দেখা হইল যে বৎসরে মামলা করিয়া যত অর্থব্যয় হয় তাহার এক-দশমাংশ ব্যয়ের দ্বারা ৫ বৎসরের মধ্যে এই গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি ও শিক্ষাবিস্তার করা যায়, তখন সেই গ্রামের অধিবাসীরা পঞ্চায়েৎ-সালিশী স্থাপন করিতে স্বীকৃত হইল। সালিশী বৈঠকে উপস্থিত হইয়া দেখি, উকিলের দালাল সেখানে উপস্থিত রহিয়াছে। ইহারা সর্বদাই সালিশীর বিরুদ্ধে লোককে উস্‌কাইয়া দিতে চেষ্টা করে। বহুদিন ধরিয়া উকিল ও তাহাদের দালালের নিকট মক্‌স

করিয়া এই গ্রামের অধিবাসীদের স্বভাবও বিকৃত হইয়া গিহয়াছে। উভয় পক্ষই মিথ্যা সাক্ষীর সাহায্যে এমনভাবে ঘটনা সাজাইয়া আনে, যে সত্য নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে।

উকিল ও আদালত কেবল যে পল্লীর আর্থিক দুরবস্থার কারণ তাহা নহে। ইহাদের কৃপায় পল্লীগুলি নৈতিক অধোগতিরও চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। যে সত্যনিষ্ঠা ও সহানুভূতির ভিত্তির উপর সমাজসৌধ প্রতিষ্ঠিত, ইহারা সেখানেই ফাটল ধরাইয়াছেন, মিথ্যার বিষ ছড়াইয়া ইহারা সমাজকে জর্জরিত করিয়াছেন ; এইজন্যেই মহাত্মা গান্ধী এ-দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আইন-ব্যবসায় বর্জন করিতে ও জনসাধারণকে আদালতের ত্রিসীমানায় না যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

৯

মুসলমান গ্রামগুলি মামলাবাজ হইলেও, তাহাদের একটা প্রধান গুণ এই যে, সামাজিক সাম্যভাব তাহাদের মধ্যে এখনও বিশেষরূপে জাগ্রত আছে। মস্‌জিদে তাহারা সমান আসনে উপবিষ্ট হইয়া নমাজ পড়ে। বৈঠকে তাহারা একই চাটাইয়ের উপর ধনী দরিদ্র সকলে সমবেত হয়। ধনী মোড়লের সহিত কৃষাণ মজুরও নির্ভীকভাবে সমানে সমানে তর্ক করে।

কিছুদিন আগে শ্রদ্ধেয় বন্ধু এল্‌মহার্স্ট সাহেবের সহিত আমি একটি মুসলমানগ্রামে উপস্থিত হই। দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মামলা-মোকদ্দমার জন্য এই গ্রামটির বীরভূমে বড়োই দুর্নাম ছিল। প্রতিবেশী নিরীহ হিন্দুদিগের উপর ইহারা যথেষ্ট অত্যাচার করিত। আমরা যাওয়ার পর সেখানে একটি সভা আহৃত হয়। আমরা সভায় গিয়া উপবেশন করিলে একটি বৃদ্ধ মোড়ল আসিয়া একেবারেই সাহেবের পাশে আসন গ্রহণ করিল এবং নির্ভীকভাবে বলিল,—"সাহেব, তুমি বলছ কি? এই বাবু বলছে বলেই যে আমরা তোমাদের কথামতো কাজ করব, তা করব না। আমাদের যদি বুঝিয়ে দিতে পার যে তোমরা যা বলছ তাতে আমাদের যথার্থই উপকার হবে, তবেই তোমাদের কথানুযায়ী চল্‌ব, নইলে নয়।"

খুব ভালো করিয়া বুঝিয়াছি যে এই নির্ভীকতাই ইহাদের প্রাণ, আর সংযমই ইহাদের প্রধান দোষ। সালিশী বৈঠকে বসিয়া হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া হাতাহাতি করিবে ; কিন্তু বিচারক যদি তাহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে, তবে পরমুহূর্তেই শত্রুকে দোস্ত বলিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে আলিঙ্গন করিবে। ইহারা সহজেই যেমন আত্মকলহে রক্তারক্তি করে, তেমনি আবার ইহাদের মধ্যে কোনো বড়ো হৃদয়াবেগ জাগাইয়া তুলিতে পারিলে অতি সহজে ঐক্যবদ্ধ হয়। এই গুণেই হিন্দু অপেক্ষা সংখ্যায় অল্প হইয়াও ইহারা অধিকতর শক্তিশালী।

ইহাদের মধ্যে যাইয়া ইহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া, কোনো কাজ করিতে হইলে, সর্বপ্রথমে ইহাদের চরিত্রগত এই বিশিষ্টতাটুকু বেশ ভালো করিয়া ধরিতে ও বুঝিতে হইবে। আর তাহা করিলে, ইহাদের চরিত্রের এই নির্ভীকতাকে বিনষ্ট না করিয়া, যাহাতে

প্রেমের দ্বারা, উচ্চ আদর্শের দ্বারা ইহাদিগকে সংযত ও উদ্বুদ্ধ করা যায়, তাহাই আমাদের প্রধান কর্তব্য হইবে।

১০

হিন্দু গ্রাম সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু বড়োই নিরাশাব্যঞ্জক। বীরভূম জিলার অধিকাংশ হিন্দুগ্রামেই প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী অন্ত্যজ। 'ছোটোলোক' নামে ইহারা আখ্যাত হয়। এই 'ছোটলোক'গুলি সর্বদাই 'ভদ্রলোকে'র ভয়ে ভীত। উৎসাহ ও উদ্যমের রেখাপাত ইহাদের চোখেমুখে আদৌ দৃষ্ট হয় না।

একদিন কোনো হিন্দুগ্রামে 'ভদ্রলোক' ও 'ছোটোলোকে'র বালকদের জন্য একটা ফুটবল লইয়া যাই। 'ছোটোলোকে'র ছেলেরা প্রথমটা খেলায় যোগ দিতে অস্বীকার করে, পরে আমার কথায় ভরসা পাইয়া দুটি একটি খেলিতে নামে। কিছুক্ষণ পরে দেখি অতি অল্পবয়স্ক 'ভদ্রলোকে'র ছেলে তাহার সমবয়সী একটি 'ছোটোলোকে'র ছেলের গণ্ডে সজোরে এক চপেটাঘাত করিয়া বসিল। আমি তিরস্কার করায় সে উত্তর করিল, "মশায়, আপনি খেলতে বলেছেন, তা খেলুক, কিন্তু তাই বলে গায়ে ধাক্কা দেবে কেন? আগে থেকে সাবধান না হলে 'ছোটলোকে'র আস্পর্ধা বেড়ে যাবে।" বুঝিলাম এই বালক প্রতিদিন তাহার অভিভাবক ও আত্মীয়দের মুখে যাহা শোনে, এ তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র!

শিক্ষিত ভদ্র বাবুসম্প্রদায় হস্তপদ চালনে একান্ত অক্ষম বলিয়া এই সকল 'ছোটোলোকে'রাই অতি সস্তায় মজুরি করিয়া অথবা মুনিবের জমি চষিয়া তাহাদের অন্নবস্ত্র জোগায়। কিন্তু এই উপকারের পরিবর্তে ইহারা পায় কি? আজ ইহাদের অবস্থাটাই বা কি? বহু শতাব্দীর জাত্যভিমানের নিষ্পেষণে ইহারা যে একেবারে মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িয়াছে, এই সকল অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকের দিকে তাকাইলে ইহাই তো বারে বারে চোখে পড়ে।

হাড়ি, বাউরী, বাগ্‌দী, মাল প্রভৃতি জাতি একসময় অসাধারণ বাহুবলে বঙ্গের সীমান্তদেশ রক্ষা করিয়া আমাদের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। ইহাদেরই পূর্বপুরুষগণ বিষ্ণুপুর রাজ্য স্থাপন করেন। বীরভূম ও বাঁকুড়া একসময় এই রাজ্যেরই অন্তর্গত ছিল। 'ধর্মমঙ্গল'-বর্ণিত ইছাই ঘোষ ও লাউসেনের লড়াই হইয়াছিল কেন্দুলীর অপর পারে অজয়ের অনতিদূরে। এই যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কালুবীরের বীরত্ব-কাহিনী এখনও বীরভূমের গৃহে গৃহে শোনা যায়। এই কালুবীর ডোমগণের পূর্বপুরুষ। এখনও বীরবংশী বলিয়া ডোমগণ গর্ব অনুভব করিয়া থাকে। 'ধর্মমঙ্গল' ডোম-কবির রচনা। বহু গ্রামে ধর্মপূজার পুরোহিত ডোম ছিল। এখন ধীরে ধীরে নানা কৌশলে ব্রাহ্মণগণ সেই পৌরোহিত্য গ্রাস করিয়াছেন। কালুবীর ও রমাই পণ্ডিতের বংশীয় ডোমগণ এবং স্বাধীন রাজ্যস্থাপক বাগদী ও মালগণের বংশধরগণ আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থার ফলে আজ পৌরুষ ও বীর্যহীন হইয়া কাপুরুষতার চরম সীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে। তাহাদিগকে শক্তিহীন করিয়া আমরাও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছি। আমি দেখিয়াছি যে একটি ক্ষুদ্র দুর্দান্ত মুসলমানপল্লীর ভয়ে ৬/৭টি হিন্দুগ্রাম সততই ভীত। এমনটি হয় কেন?

ইহার উত্তর বলিতে হয় হিন্দুগ্রামে ভদ্র বাবুগণ বীর্যহীন ও অকর্মণ্য। কিঞ্চিৎ কেতাবী বিদ্যার কুবুদ্ধি ও জাত্যভিমানের অন্ধ গোঁড়ামিই তাঁহাদের একমাত্র সম্বল। প্রাচীন হিন্দুসমাজের সহজ সরল অথচ সুদৃঢ় নিষ্ঠা ইঁহাদের মধ্যে নাই। অন্ত্যজ জাতির অন্তরেও ইহাদের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা ভক্তি নাই। কোনো ভদ্র-নামধারী কুচরিত্র কাপুরুষ যদি ঘরের সঙ্গে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া রাত্রিগুলা হাড়িপাড়ায় কাটায়, তাহা হইলে সমাজে তাহা লইয়া টুঁশব্দটিও হইবে না। কিন্তু তিনিই দিবালোকে কেহ 'হাড়ি'র জল ছুঁইলে সমাজ রক্ষার্থে রুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়া অত্যাচারের একশেষ করিবেন। এই অপমান তাহাদের হাড়ে হাড়ে বিঁধে। তাই ভদ্রলোকেরা যখন মার খায়, ওই তথাকথিত ছোটোলোকগুলি তখন ভগবানকে ধন্যবাদ দেয়।

একবার কোনো একটি সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়িতে পূজার অনিময় হওয়ায় পরিবারের স্ত্রীপুরুষ সকলের মধ্যে একটা আতঙ্কের সঞ্চার হয়। সকলের মনে ভয় হয় যে এ বৎসর তাহাদের সর্বনাশ হইবে। একটি 'ছোটোলোক' কথাচ্ছলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আহা তা কি হবে? ভগবান কি আছেন? আমাদের কান্না কি শুনেছেন? এরা ধ্বংস হলে আমরা বাঁচি।" কথাটা আবেগের মুখে বে-ফাঁস বাহির হইয়া যাইবার পরেই সে ভয়ে ত্রস্ত হইয়া আমার পায়ে ধরিয়া অনুরোধ করিল আমি যেন কাহারও নিকট একথা প্রকাশ না করি।

এইখানেই হিন্দুসমাজ শক্তিহীন। সাঁওতালদিগের উপর বেশি জুলুম চলে না। তাহারা নির্দিষ্ট সময়ে কাজ করিয়া স্বগ্রামে চলিয়া যায়। মুসলমান কৃষকদের বেলাও তাই। তাহারা স্ব স্ব গ্রামে স্বাধীন। আমাদের হিন্দুগ্রামে আমাদের স্বধর্মী ও স্বগ্রামবাসীগণের মনে সাহস নাই। বাবুদের সামনে তাহারা মুখ খুলিয়া কথা বলিতে সাহস পায় না। বাড়িতে কোনো বাবুকে অযাচিতভাবে উপস্থিত হইতে দেখিলে, অসময়ে বেগার খাটিতে হইবে মনে করিয়া সে হয় ধানের ডোলে লুকাইয়া থাকে, না হয় মুখ বাঁকা করিয়া পেটে হাত দিয়া কঠিন রোগের ভান করিতে থাকে।

১১

সমবায় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা আর্থিক উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করিবার জন্য আমরা একটি হিন্দুগ্রামে গমন করি কিন্তু আমাদের সে চেষ্টা বড়ো সহজে সফল হইবে না, কারণ সর্বাধিক সমবায় প্রতিষ্ঠানের মূল হইতেছে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও সহানুভূতি কিন্তু সেখানে তাহার বড়োই অভাব।

মুসলমানপল্লীতে যে প্রাণ ও ঐক্য দেখিতে পাই, হিন্দুপল্লীতে তাহার অত্যন্ত অভাব বলিয়া তথায় সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা অধিকতর কষ্টকর ব্যাপার। সমাজ সংস্কারের দ্বারাই হিন্দুসমাজে প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে। বর্তমানে সর্বপ্রধান কাজ অস্পৃশ্যতা দূর করা। যাহারা ছুঁৎমার্গ মানিয়া চলিবে পল্লীসেবায় তাহাদের অধিকার নেই। বঙ্গের সেবক সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের একান্ত অনুরোধ তাহারা যেন প্রকাশ্যে এই ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া অন্ত্যজ জাতির জল গ্রহণ করেন। বাঙলার বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের বাণী স্মরণ করিয়া আমরা যেন এই পথে অগ্রসর হইতে

চেষ্টা করি। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, "অস্পৃশ্যতা দূর না করা পর্যন্ত স্বরাজ-পতাকা স্পর্শ করিবার অধিকার আমাদের নাই।" হিন্দুপল্লীর জটিল সমস্যার সহিত যতই পরিচিত হইতেছি, ততই আমরা তাঁহার এই পবিত্র বাণীর গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছি।

কর্মী-সংগঠন

শ্রীনিকেতন—শিক্ষাশিবির

এ কথা সকলেই জানেন যে, আমাদের সঙ্গে পাশ্চাত্য সমাজের একটা প্রধান পার্থক্য এই যে, আমাদের দেশের বার আনারও অধিক লোক কৃষির উপর নির্ভর করে ; আর ইংলন্ড, ফ্রান্স, জার্মেনীতে বার আনা লোকে নির্ভর করে কলকারখানার উপর। সেইজন্য ইউরোপের অর্থনৈতিক চিন্তা ও গবেষণার ধারা ভারতীয় অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিবে কি-না সন্দেহ।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ জার্মেনীর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিগত যুদ্ধের পর জার্মেনী কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষরূপে মনোযোগী হইয়াছে। কৃষিকার্যে তাহারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে দেশের মধ্যযুগের কৃষক-সমাজ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। পল্লীগ্রামে দুই চারি জন ভূস্বামী হাজার হাজার বিঘা জমির মালিক। উন্নত বৈজ্ঞানিক কলকারখানার সাহায্যে তাঁহারা বিরাট চাষের ব্যবস্থা করিয়া প্রচুর লাভবান হইতেছেন বটে, কিন্তু অপর যাবতীয় পল্লীবাসী ইহাদের ক্ষেতের মজুর মাত্র। নিজেদের জায়গা-জমি নাই। মনিবের তৈয়ারী বস্তিতে ইহারা বাস করে।

মধ্যযুগের বলিষ্ঠ সঙ্ঘবদ্ধ কৃষক-সমাজ বিলুপ্ত হইয়াছে, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশেও এই অবস্থা। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর কলকারখানার যুগের ধনিক সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রবর্তিত অর্থবিজ্ঞানের ছাঁদনদড়ি গলায় জড়াইয়া পাশ্চাত্য পল্লীসমাজ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে।

জার্মেনীর বর্তমান গবর্ণমেন্ট গত যুদ্ধের পর এই সকল বৃহৎ জোৎদারদিগের নিকট হইতে জমি ক্রয় করিয়া তাহা একশত বিঘার এক এক খণ্ডে ভাগ করিয়া প্রজাবিলি করিতেছে। প্রবল বাধাসত্ত্বেও তাহারা এইরূপ দশ হাজার মাত্র প্রজা পত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

অতএব ইংলন্ড, জার্মেনী অথবা ফরাসী দেশের অর্থবিজ্ঞানের নীতি অনুসরণ করিয়া আমরা যদি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে চেষ্টা করি তাহা আমাদের দেশের সমস্যা সমাধানের অনুকূল হইবে না। কারণ যাবতীয় সম্পদের মূল উৎস কৃষি। কৃষি-প্রধান

ভারতে কৃষকই অর্থনৈতিক জগতের মেরুদণ্ড। ভারতীয় শিল্পের উপাদান এদেশের কৃষকগণই উৎপন্ন করে। অতএব এ-দেশীয় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মুখ্য অবলম্বন কৃষি ও কৃষক। গৌণ অবলম্বন শিল্পী ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান। এবং উভয়ই অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত থাকিয়া পরস্পরের অনুকূলতা করিয়াছে। এই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়াই প্রাচীন ভারতের পল্লীসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে পল্লীসমাজের যে আভাস পাই, তাহারই সুস্পষ্ট ছবি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম প্যালেস্টাইনে।

ডেনমার্ক একশত বৎসরের চেষ্টায় তাহার সমবায় প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া উন্নত কৃষক-সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহা অপেক্ষা শতগুণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও ইহুদীগণ গত চৌদ্দ বৎসরে যে-কয়েকটি পল্লী-প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছে, তাহা ইহুদীজাতি অসাধারণ সংগঠন-প্রতিভার পরিচায়ক।

প্রাচীন ভারতের পল্লীসমাজের ঐতিহাসিক ধারার মধ্যেই আমাদের ভাবী সমাজ গঠনের মূলভিত্তি আমরা খুঁজিয়া পাইব। কিন্তু প্যালেস্টাইন, ডেনমার্ক চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগশ্লভিয়া ইত্যাদি দেশে নবীন আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পল্লীসমাজ সংগঠনের যে-সকল পরীক্ষা চলিয়াছে তাহার সহিতও আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আবশ্যক।

ভারতের এই নবযুগে পল্লীসমাজকে ভিত্তি করিয়াই রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

নবীন ভাবের উন্মাদনায় আজ সমগ্র জাতির চিত্ত আলোড়িত। তাহার প্রয়োজনও রহিয়াছে। ভাবোন্মাদনা জাতির হৃদয়-ক্ষেত্রে অসাধারণ উর্বরতা দান করিয়াছে। কিন্তু গঠনমূলক সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই জাতিসৌধ নির্মাণ করিতে হইবে। এই জন্য চাই এমন একদল ত্যাগী সাধক বিনা-মাদকতায় সাধনায় অভিনিবিষ্ট হওয়ার শক্তি যাহাদের আছে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "দেশের সেবা সত্যভাবে করতে হবে, এই উৎসাহ সৌভাগ্যক্রমে আজ বাঙালি যুবকের মনকে বিচলিত করেচে।...দেশের যেখানে ক্ষুধাতৃষ্ণা, বেদনা, যেখান থেকে দেশ প্রাণ দেয় এবং প্রাণ দাবি করে, সেই পল্লী-নিকেতনে দেশের বাস্তব সত্তাকে প্রত্যক্ষ করবার ইচ্ছা জেগেচে।"

পল্লীর কৃষক বিচ্ছিন্ন, সেই জন্যই বর্তমান সঙ্ঘবদ্ধতার যুগে তাহারা সকল ক্ষেত্রেই হটিয়া পড়িতেছে। কৃষকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গ্রামে গ্রামে গঠন করিতে হইবে। সুচিন্তিত পল্লী-প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঐক্য সম্ভবপর হইবে। কারণ যে প্রতিষ্ঠান তাহার অন্ন-ব্যবস্থা করিবে তাহার উপর সকলেরই সমান দরদ পড়িবে। দেশে সুশিক্ষিত ত্যাগশীল দেশহিতব্রতী একদল যুবককে এই সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে।

এই কার্যের উপযুক্ত হইতে হইলে সর্বপ্রথমে দরকার পল্লীসমস্যাগুলির সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করা। সেই সকল সমস্যার সমাধানের জন্য যে-সকল বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা।

এইরূপ কর্মীই ভবিষ্যতে জাতিকে সুপথে পরিচালনা করিবে। এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়াই শ্রীনিকেতনে কর্মী তৈয়ার করিবার জন্য শিক্ষা-শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়। গত

১৯২৪ সন হইতে ১৯৩২ সন পর্যন্ত ষোলটি শিক্ষাশিবিরের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল শিবিরে ১৭৬ জন কর্মী পল্লী-সংগঠন সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিয়াছে।

শিখাইবার বিষয়

১। ব্রতীবালক সংগঠন—পল্লীগ্রামের ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর বয়সের বালকদিগকে লইয়া সমাজসেবার আদর্শে তাহাদের চিত্ত উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য দল গঠন করা।

২। সাধারণ পল্লীসমস্যা—সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সমস্যা কি? বর্তমান দুরবস্থার কারণ ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা।

৩। গৃহশিল্প—প্রত্যেক ছাত্রকে একটি-না-একটি গৃহশিল্প শিক্ষা করিতে হয়।

৪। কৃষি সম্বন্ধীয় প্রাথমিক শিক্ষা—গ্রামে যে-সকল ডোবা বুজান প্রয়োজন সেইগুলিতে এবং অন্যান্য পতিত জমিতে শাকসব্জী ও ফলের গাছ রোপণ ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়।

৫। পল্লী স্বাস্থ্য—ম্যালেরিয়া ইত্যাদি নিবার্য ব্যাধির প্রতিকার।

৬। প্রাথমিক চিকিৎসা।

৭। পল্লীশিক্ষা।

৮। ভারতের ইতিহাস—ভারতের অতীত যুগে যে-সকল মহাপুরুষ উন্নত আদর্শের সাধনা দ্বারা সমগ্র জাতিকে অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের চিন্তা ও কর্মের সহিত পরিচয় লাভ।

৯। জাতীয় সাহিত্য—বাংলার প্রধান প্রধান সাহিত্যিকদিগের চিন্তাধারা ও প্রকাশভঙ্গীর সহিত পরিচয়।

১০। ভারতের কোথায় কোন্ শিল্প-উপাদান উৎপন্ন হয় তৎসম্বন্ধে ভৌগোলিক জ্ঞান।

১১। সমবায়নীতি ও সমবায়সংগঠন।

১২। গো-পালন ও মুরগীর চাষ।

১৩। বয়নশিল্প—গামছা, শতরঞ্জি ইত্যাদি সহজবয়ন।

১৪। পল্লীপরীক্ষণ (economic survey of villages)

১৫। হিসাবরক্ষা

উল্লিখিত সকল বিষয়গুলিই প্রত্যেক শিবিরে শিক্ষা দেওয়া হয় না। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্র অনুযায়ী শিক্ষিতব্য বিষয়ের তারতম্য করা হয়।

১৯২৪ সালে মিঃ এলম্‌হার্স্ট যখন শ্রীনিকেতনে ছিলেন, তখন তাঁহারই প্রস্তাব অনুসারে পল্লীগ্রামের ব্রতীবালক-নায়ক তৈয়ারী করার জন্য প্রথম শিবির স্থাপিত হয়। এই বীরভূমের তৎকালীন ডিস্ট্রিক্ট স্কুল ইন্সপেক্টার মৌলবী আবুল হোসেন খানসাহেব এই শিবিরের শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া বীরভূমের মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের জন্য এইরূপ শিক্ষা-শিবিরের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন। শ্রীনিকেতনে কৃষি-বিভাগ, বয়ন ও কারুশিল্প বিভাগ, পশুপালন-বিভাগ ইত্যাদিতে এ সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি রহিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সমবায় স্বাস্থ্য সমিতির কার্যপরিচালনার জন্য উপযুক্ত ডাক্তারও রহিয়াছেন। এই সকল কারণে, বিশেষ অতিরিক্ত ব্যয় না করিয়াও প্রয়োজন-উপযোগী শিক্ষাদানের সুবিধা রহিয়াছে। ইহা অনুভব করিয়া মৌলবী আবুল হোসেন খান চৌধুরী মহোদয় ও বীরভূম জেলাবোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যান রায়-বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরোধে আমরা বীরভূম জেলার শিক্ষকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করি। এই সকল শিবিরে ব্রতীবালক সংগঠন, কুটিরশিল্প, প্রাথমিক কৃষি ও পল্লীস্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। এই জেলার প্রায় সকল হাইস্কুল ও যাবতীয় মধ্য-ইংরেজী স্কুল হইতে শিক্ষকগণ প্রেরিত হন।

অতঃপর বাংলার বিভিন্ন জেলা ও ভারতের অপরাপর প্রদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে পল্লীসেবক তৈয়ার করিবার জন্য কর্মী প্রেরিত হয়। যে-সকল প্রতিষ্ঠান হইতে কর্মী প্রেরণ করা হইয়াছে তাঁহাদের নাম ও শিক্ষার্থীদের সংখ্যা—

১।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৪ জন
২।	কলিকাতা হিতসাধনমণ্ডলী	২ ,,
৩।	রাঁচি ব্রহ্মবিদ্যালয়	১ ,,
৪।	সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন	১ ,,
৫।	প্রেম মহাবিদ্যালয়, বৃন্দাবন	২ ,,
৬।	নওগাঁ সমবায় সমিতি	৪ ,,
৭।	জিয়াগঞ্জ সমবায় কেন্দ্রীয় কোষ	১ ,,
৮।	ভদ্রক (উড়িষ্যা) সমবায় কেন্দ্রীয় কোষ	১ ,,
৯।	নলহাটি খাদী আশ্রম	১ ,,
১০।	বালি শিশুবিদ্যালয় (হুগলী)	১ ,,
১১।	বরোদা রাজ্য	৩ ,,
১২।	কো-অপারেটিভ সেন্ট্রাল ইউনিয়ান, হায়দ্রবাদ (দাক্ষিণাত্য)	১ ,,
১৩।	ময়ূরভঞ্জ ষ্টেস্ট	৮ ,,
১৪।	বঙ্গীয়শিক্ষা বিভাগ	৯ ,,
১৫।	বিশ্বভারতী কো-অপারেটিভ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক	১২ ,,
১৬।	বাংলার বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ	৩২ ,,
১৭।	অন্যান্য কর্মী	৯২ ,,
১৮।	ত্রিপুরা করদরাজ্য	১ ,,

ডেনমার্কের মত ক্ষুদ্র দেশে বয়স্ক কৃষক যুবকদের শিক্ষার জন্য ষাটটি শিক্ষাকেন্দ্র (folk high schools) রহিয়াছে। যে-সময় বরফের জন্য চাষবাস বন্ধ থাকে, তখন এই সকল কেন্দ্রে বয়স্ক কৃষকগণ বৎসরে পাঁচ মাসের জন্য জ্ঞানলাভ করিতে আসে। এই সকল বিদ্যালয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকগণের নিকট হইতে কৃষিপ্রধান ডেনমার্কের অর্থনীতি ও সামাজিক আদর্শ সম্বন্ধে নূতন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারা গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে। ডেনমার্কের এই সকল লোক-শিক্ষায়তনে যে-সকল দেশহিতৈষী নিষ্ঠাবান কর্মী তৈয়ার হইয়াছে তাহারাই আজ ড্যানিস্ পার্লামেন্টের এবং ডেনমার্কের যাবতীয় সমবায়-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক।

ডেনমার্কের পন্থা অনুসরণ করিয়া যুগশ্লাভিয়ার নবগঠিত জাতিও বয়স্ক কৃষকদের জন্য প্রতি জেলায় গ্রীষ্ম শিক্ষা-নিবাস (summer schools) স্থাপন করিয়াছে। গত কয়েক বৎসরে শ্রীনিকেতন শিক্ষা-শিবিরের অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে যুগশ্লাভিয়া ও ডেনমার্কের ন্যায় আমাদের দেশেও কৃষকদের জন্য শিক্ষায়তন গড়িয়া তোলা উচিত।

আমাদের দেশের সমস্যা উক্ত দেশগুলি হইতে যদিও স্বতন্ত্র, কিন্তু এই কৃষিপ্রধান দেশে বয়স্ক কৃষক যুবকদের জন্য উক্ত প্রকারের শিক্ষায়তনের বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে। শ্রীনিকেতনে অল্প ব্যয়ে এইরূপ শিক্ষায়তন গড়িয়া তুলিবার যে সুযোগ রহিয়াছে বাংলার অন্যত্র তাহা নাই। কারণ রবীন্দ্রনাথ বহুদিবসের চেষ্টায় পল্লীসমস্যা সমাধানের জন্য এখানে একটি কেন্দ্র প্রস্তুত করিয়াছেন। তথায় কৃষি, গো-পালন, পক্ষীপালন, স্বাস্থ্যোন্নতি, পল্লীশিল্প, পল্লীর অর্থনীতি (rural economics), পল্লীশিক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ রহিয়াছেন। ইঁহাদের সহযোগিতায় অল্প ব্যয়ে ডেনমার্কের ন্যায় কৃষকদের শিক্ষার জন্য শিক্ষায়তনের ব্যবস্থা করিতে পারি। তাহাতে কৃষকগণ বৎসরে চারি মাসের জন্য শিক্ষা লাভ করিবে। যাহারা অন্ততঃ উচ্চ প্রাইমারী পর্যন্ত বাংলা পড়িয়াছে এবং যাহাদের অন্যূন ৫০ বিঘার উর্দ্ধে জমি আছে অর্থাৎ বৎসরের আহারের সংস্থান আছে এইরূপ কৃষক যুবকদিগকে শিক্ষার জন্য আহ্বান করিতে হইবে। প্রথমে কয়েক বৎসরের জন্য ছাত্রদের আহারাদির ব্যয় সাধারণকে বহন করিতে হইবে। ইহাদিগের নিকট হইতে শিক্ষার জন্য কোনো বেতন লওয়া হইবে না। আহার্য ব্যয় মাসিক ১৫ টাকার অধিক পড়িবে না। জমিদারগণ তাঁহাদের প্রজাদিগের মধ্য হইতে মাসিক বৃত্তি দ্বারা কতিপয় ছাত্র পাঠাইতে পারেন। এতদ্ব্যতীত বাংলাদেশে কো-অপারেটিভ সেন্ট্র্যাল ব্যাঙ্কসমূহ আছে তাঁহারাও তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে যে-সকল পল্লীসমিতি আছে তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকটি ছাত্রকে বৃত্তি দ্বারা চারি মাসের জন্য পাঠাইতে পারেন। এতদ্ব্যতীত ন্যাশনাল কৌন্সিল অব্ এডুকেশ্যন, দেশবন্ধু পল্লী-সংস্কার সমিতি ও শ্রীনিকেতন পল্লীসেবা বিভাগ ইত্যাদির ন্যায় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণের সমবেত চেষ্টা ও পরস্পর সহযোগিতার এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশে গঠন করা কঠিন ব্যাপার নহে। এইজন্য এ বিষয়ে আমাদের দেশে গঠনমূলক কর্মপদ্ধতিতে যাঁহারা বিশ্বাসী এইরূপ দেশভক্ত নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।
[*প্রবাসী*, আশ্বিন ১৩৪৯।]

বীরভূমের সাঁওতাল প্রতিবেশী

আমাদের আশ্রমের চারিদিকের সাঁওতাল পল্লী হইতে প্রতিদিন বহুসংখ্যক সাঁওতাল শ্রমজীবী এখানে কাজ করিতে আসে। ইহাদের চাল-চলন, জীবন-যাত্রার প্রণালী, ও গৃহনির্মাণপদ্ধতি সবই বাঙালি হিন্দু-মুসলমান হইতে এত তফাৎ যে, অতি সহজেই সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

সাঁওতাল মেয়েরা গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপের মধ্যে যখন গুরুতর পরিশ্রমের কাজে রত থাকে তখনও তাহাদের মুখে প্রসন্নতা ও সরল হাসি ম্লান হয় না। তাহারা সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অপরাহ্ণে সহচরীদের গলা জড়াইয়া নৃত্যের তালে তালে গান করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করে। পথের ধারে কোথাও লাল ফুল দেখিলে দম্‌কা হাওয়ার মত হঠাৎ চঞ্চল হইয়া ফুলের জন্য কাড়াকাড়ি করিতে থাকে। ফুলের মঞ্জরী দ্বারা অলকগুচ্ছ অলঙ্কৃত করিয়া তাহারা নাচের তালে ও গহনার সুরে মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া পথ চলিতে থাকে। দিনের কঠোর শ্রম, বা দারিদ্র্যের দারুণ নিষ্পেষণ কিছুই ইহাদের সহজ উচ্ছ্বসিত আনন্দধারার গতি রোধ করিতে পারে না।

ইহারা ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু সর্বদাই খোলা জায়গায় থাকে বলিয়া ইহাদের দেহ সুগঠিত স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য মনোহর। ইহাদের সরল হাসির মধ্যে এমন একটি স্নিগ্ধতা আছে যাহা দেখিয়া দর্শকের মনে সহজেই ইহাদের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। সাধারণত ইহারা লম্বায় ৫ফিট্ ৭ ইঞ্চি, ওজনে প্রায় দেড় মন। ইহাদের চোখ চীনাদের মত সরু ও মিট্-মিটে, মাথার খুলি অনেকটা গোল, মুখের আকৃতিও গোল। নীচের চোয়াল ভারি। নাসিকা উপর দিকে ঈষৎ বক্র। হিন্দুদিগের অপেক্ষা ঠোঁট পুরু কিন্তু নিগ্রোদের মত তত মোটা নহে। গণ্ডদেশের অস্থি উন্নত, কিন্তু মঙ্গোলীয়ান্‌দের মত ততটা উন্নত নহে।

বীরভূম জিলার যে সকল সাঁওতাল দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের অধিকাংশেরই আদিম বাসস্থান পালামৌ ও রামগড়। ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগে অনাবৃষ্টি জনিত দুর্ভিক্ষের তাড়নায় বহু সহস্র সাঁওতাল বীরভূমে চলিয়া আসে। ১৮২৭ খৃঃ অব্দে এই জিলায় ৬,৯৫৪ জন মাত্র সাঁওতাল ছিল। কিন্তু ১৯০১ এর আদম-সুমারিতে তাহাদের সংখ্যা ৪৭, ২২১ হইয়াছে।

এই লোকবৃদ্ধির প্রধান কারণ এই যে, ইহারা খোলা মাঠে সর্বাপেক্ষা উঁচু জায়গায় গ্রাম স্থাপন করে এবং গ্রামের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে অন্যত্র গিয়া আবার উপনিবেশ স্থাপন করে। বীরভূমের হিন্দু অধিবাসীদের মত তাহারা বহু লোক অল্প জায়গায়

ঘেঁসাঘেসি করিয়া বাস করিতে ভালবাসে না। সেই জন্য ইহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। ইহাদের গ্রামগুলি হাড়ি, ডোম ইত্যাদি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু গ্রাম অপেক্ষা পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর বলিয়া ইহাদের সংখ্যা সহজে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সাঁওতাল পরগণার লোকসংখ্যা বাড়িতেছে বলিয়াও অনেক অন্নের সন্ধানে বীরভূমে চলিয়া আসিতেছে। বীরভূম জিলার পশ্চিমাংশের মাটি প্রস্তরময়। এই ঢালু ভূমির উঁচু ডাঙাগুলি চাষের পক্ষে অনুপযোগী। স্থানীয় হিন্দু গৃহস্থগণ ইহাদের শ্রমের সাহায্যে জমি তৈয়ারি করিয়া লয়, ইহারা দিন মজুরী খাটে মাত্র। জমির উপর কোনও স্বত্ব লাভ করিতে পারে না। জমিটি চাষের উপযোগী হইলেই জমিদারেরা ইহাদিগকে বেদখল করিয়া তাহা খাস্ করিয়া লয়।

জন্মের পর প্রথম সংস্কার দ্বারা সাঁওতালী-শিশু পরিবারভুক্ত হয়। পিতা শিশুর মাথায় হাত রাখিয়া পৈত্রিক দেবতাদিগকে স্মরণ করে। এই উৎসব অতি পবিত্র। পিতার পক্ষে দেবতাদিগের নিকট শিশুকে নিজ ঔরসজাত বলিয়া স্বীকার করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। নানাস্থানে এই উৎসবের প্রকারভেদ রহিয়াছে।

ইহারর পরের অনুষ্ঠানের নাম "নার্থা"। কন্যা জন্মিলে তিন দিনের দিন এবং পুত্র হইলে ৫ দিনের দিন এই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। শিশু জন্মিলে পরিবার অশুচি হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রসূতি শুচিতা লাভ করিয়া পুনরায় গৃহকর্মে নিযুক্ত হইতে পারে। এই সময় গ্রামের সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয়। ক্ষৌরকর্মের দ্বারা সকলে শুচি হয়। অনন্তর স্নানান্তে তাহারা নিমের পাতা ও আতপ চাউল সিদ্ধ করিয়া ফেন-ভাত খায়। ভাঁড়ে করিয়া তাড়ি রাখা হয়। প্রতিবেশীরা শিশুর চারিদিকে বসিয়া তাড়ি ও নিমের জল পান করে।

শিশু পুত্র হইলে পিতামহের নামের সহিত মিল রাখিয়া এবং মেয়ে হইলে মাতামহীর নামের সহিত মিল রাখিয়া নাম রাখিতে হয়। পিতাই নামকরণ সম্পন্ন করেন।

অনন্তর "ছোটিয়ার উৎসব"। এই উৎসবের সময় সাঁওতাল শিশু প্রথমে তাহার জাতির মধ্যে স্থান লাভ করে। এই অনুষ্ঠান ব্যতীত শুধু জন্মের দ্বারা সে সাঁওতাল হইতে পারে না। এই উৎসবের সময় তাহার বাম হাতের কব্জার উপরের দিকে একটি গোল পোড়ার দাগ দেওয়া হয়। এই দাগ দেওয়ার পূর্বে মৃত্যু হইলে শিশু দেবতার কোপের পাত্র হয়।

সাধারণত সাঁওতাল যুবকগণের ১৬/১৭ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। বিবাহের বয়স-সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। প্রতি গ্রামে একটি করিয়া ঘটক আছে। বরের পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলে, সে তাহার স্ত্রীর মত লইয়া ছেলে ও মেয়ের পরস্পরের মধ্যে দেখা-শোনার প্রস্তাবে সম্মতি দেয়। কোনো কার্যে বাজারে উভয়ের আলাপ পরিচয় হয়। ছেলের পছন্দ হইলে তাহার পিতা মেয়েকে কোনো উপহার প্রদান করে। কন্যা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া তাহা গ্রহণ করিলে বোঝা যায় যে, সে তাহার পুত্রবধূ হইতে সম্মত আছে। পরে কতকগুলি হলদে রঙের সুতো একত্র বাঁধিয়া প্রতিবেশীর গৃহে বিতরণ করা হয়। যে কয় গাছি সুতা একত্রে বাঁধা থাকে ততদিন পরেই বিবাহ হইবে। এই সঙ্কেত বুঝিয়া নিমন্ত্রিতগণ সমাগত হইবে। বরযাত্রিরা বিবাহের পূর্বে গ্রামে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহারা নিজেরা চাল ডাল লইয়া যায়, ও গ্রামের

বাহিরে গাছ তলায় রন্ধন করে। বিবাহের পূর্বে সকলে সমবেত হইলে বর ও কনেকে সরিষার তেল ও হলুদ মাখান হয়। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণও গায়ে হলুদ তেল মাখিয়া থাকে। বরকনে হলুদ্ রঙের কাপড় পরিয়া স্নান করে।

বর একটি ডালা নিয়া যায়। তাহাতে সিঁদুর ও কাপড় থাকে। ডালা ঘরে নিয়া গেলে কনে কাপড় পরিয়া তাহাতে বসে। পাত্র তখন কনের ভাইয়ের মাথায় তিন বা পাঁচ হাত কাপড় বাঁধিয়া দেয়। ২/৪/৬ ইত্যাদি জোড় অঙ্ক অমঙ্গলকর। তাহার পর বর একটি আম্র শাখা দ্বারা কন্যার ভাইয়ের মাথায় জল ছিটাইয়া দেয়। ছোট-ভাই এক্ষেত্রে কন্যার প্রতিনিধি। সেও বরের মাথায় জল ছিটাইয়া দেয়। তার পর বর-পক্ষের পাঁচ জন লোক ওই ডালায় উপবিষ্ট কন্যাকে ডালা সুদ্ধ তুলিয়া লইয়া উঠানে চলিয়া আসে। পূর্ব কালে ইহারা লড়াই করিয়া কন্যাকে কাড়িয়া নিয়া বিবাহ করিত, বর্তমানে তাহারই শেষ চিহ্ন রহিয়াছে। কন্যাকে বাহিরে আনা হইলে বর এক জনের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া কন্যার কপালে আঙ্গুল দিয়া একটি সিন্দুরের ফোঁটা দেয়। ইহাই তাহাদের বিবাহের প্রধান অঙ্গ।

বিবাহের স্নানের পর কন্যা ও বরের হাতে হলুদ্ ও ধানের পুটুলি বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তাহাদের বিশ্বাস, শীঘ্র ধানের অঙ্কুর দেখা দিলে কন্যা অচিরে পুত্রবতী হইবে। আর উহার ভাল অঙ্কুর বাহির না হইলে বিবাহের পক্ষে তাহা মঙ্গলকর নহে। বিবাহের সময় বরকে ১৬ টাকা পণ দিতে হয়। সাঙা করিতে ১২ টাকা পণ লাগে। ইহাদের মধ্যে বহু-বিবাহের চলন প্রায় নাই বলিলেই চলে। স্ত্রী পুত্রবতী না হইলে অথবা রুগ্ণ বা গৃহকর্মে অসমর্থ হইলে কখনও কখনও আবার বিবাহ করিতে দেখা যায়।

স্ত্রী অতি সহজেই স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারে। কেবল পণের টাকাটা ফিরাইয়া দিতে হয়। বিবাহের পূর্বে কোনো স্ত্রীলোক চরিত্রভ্রষ্ট হইলে সমাজে তাহা তত দূষণীয় বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু বিবাহের পর নৈতিক জীবনের পবিত্রতা রক্ষার প্রতি ইহাদের ঐকান্তিক নিষ্ঠা দেখা যায়।

সাঁওতালগণ সৌন্দর্যপ্রিয়। ইহারা বিবাহস্থানটিকে গোবর দিয়া লেপিয়া তাহার উপর সুন্দর রূপে আলপনা আঁকিয়া দেয়। বিবাহের আমোদপ্রমোদের মধ্যে নাচ গানই প্রধান। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সাঁওতালগণ দলে-দলে নাচিতে থাকে। বর ও কন্যাপক্ষ বিবাহের ঠিক পূর্বে নাচিতে-নাচিতে প্রতিবেশীদের বাড়িতে গিয়া কিছু কিছু গুড় খাইয়া আসে।

সাঁওতালগণ প্রকৃতির সন্তান। শাল গাছ ইহাদের নিকট অতি প্রিয়। শালবনের ধারে ইহারা বাস করে। বসন্তের প্রারম্ভে দক্ষিণ হাওয়ার স্পর্শ লাভ করা মাত্র হঠাৎ দুই চারি দিনের মধ্যে সমস্ত বৃক্ষ পত্রহীন হইয়া যায়। আবার হঠাৎ এক প্রভাতে সমগ্র বনভূমি নবীন কিশলয়ে রমণীয় হইয়া ওঠে। দুই তিন দিনের মধ্যে শালের ফুলের মৃদু গন্ধে চারিদিক বহুদূর পর্যন্ত আমোদিত হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতাল পল্লীতে চারিদিক হইতে মাদল বাজিয়া ওঠে। বসন্তের শুক্ল পক্ষে ইহারা কাজ-কর্ম করিতে চায় না। গভীর রাত্রি পর্যন্ত খোলা মাঠে নৃত্য করিয়া কাটায়। বসন্তোৎসবকে সাঁওতালরা "বাহা" বলে। এই উৎসবের কোনো নির্দিষ্ট দিন নাই। এই উৎসবের পূর্বে কেহ নবীন ফুল-সাজে সজ্জিত হইতে অথবা নতুন ফল-মূল ভক্ষণ করিতে পারে না।

পল্লীর বাহিরে পূজার স্থান নির্দিষ্ট করিয়া তাহারা তাহাতে উত্তমরূপে গোময় লিপ্ত করে। তথায় দুইটি পাথর বসাইয়া তাহাদের সিন্দুর লেপিয়া দেয়। ইহাই তাহাদের 'বোঙা' বা উপাস্য ভূত।

দেবতার উৎসর্গের জন্য তাজা ফল মূল ও মুর্গী সংগ্রহ করিয়া আনে। ইহারা দেবতাকে মুর্গী মানত করে। দেবতার সম্মুখে চাল ছড়াইয়া দেওয়া হয়। মুর্গীগুলি যখন চাল কুড়াইয়া খাইতে ব্যস্ত থাকে তখন তাহাদিগকে হত্যা করা হয়। তারপর সেই মুর্গীর মাংস ও চালে একপ্রকার খিচুড়ী রাঁধিয়া পরমানন্দে ভোজন করে। এই উৎসবের সময় প্রত্যেক সাঁওতাল নিজের গৃহ হইতে চাল মুর্গী ও পয়সা লইয়া যায়। সকলের চাল একত্র করিয়া মহোৎসবের আয়োজন হয়। এই উৎসবের প্রধান উপকরণ মদ্য। ইহারা পেট ভরিয়া তাড়ি পান করে। অন্য আহার্য দ্রব্যের পরিমাণ যথেষ্ট না হইলেও ইহাদের আপত্তি নাই। কিন্তু আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই পেট ভরিয়া তাড়ি খাইতে পারে এমন ব্যবস্থা চাই। উৎসবান্তে ইহারা বাড়ি গিয়া পরস্পরের গায়ে জল ছিটাইয়া দেয় এবং নিজেদের গ্রামকে আনন্দ কোলাহলে মুখরিত করিয়া তোলে।

অসুখ হইলে ইহারা ডাক্তার ডাকে না। গ্রামে যে ওঝা থাকে তাহার হাতেই তাহারা রোগীকে সমর্পণ করে। ওঝা তুক্‌তাকে মন্ত্র-তন্ত্র ঝাড়া-পোঁছা করিয়া রোগীর চিকিৎসা করে। তাহারা কোনো মঙ্গলময় দেবতাকে উপাসনা করে না। তাহাদের বিশ্বাস "বোঙা" বা ভূতই অনিষ্ট করে। তাই তাহারা পূজা করিয়া তাহাকে খুশী করিতে চেষ্টা করে। অসুখ হইলে ওঝা আসিয়া গাছের একখানা পাতায় তেল মাখাইয়া তাহা দেখিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে যে, কোন্ অপদেবতা তাহার রোগীর রক্ত শোষণ করিতেছে। মৃত্যু হইলে হিন্দুদেরই মত শব চিতার আরোহণ করাইয়া তাহারা মুখাগ্নি করা হয়। পুত্র মাথার খুলির তিনটি টুক্‌রা যত্ন করিয়া রাখিয়া দেয়, এবং পরে দামোদর নদে তাহা নিক্ষেপ করিবার জন্য যাত্রা করে। নিক্ষেপ করিবার সময় সে হাড়ের টুক্‌রা তিনটিকে মাথায় করিয়া ডুব দেয়। স্রোতের বেগে সেগুলি নিম্নাভিমুখে চলিয়া যায়। ইহারা দ্বারাই মৃত ব্যক্তি তাহার পূর্বপুরুষের সহিত মিলিত হইতে পারে।

সাঁওতালদিগের প্রত্যেক পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন দেবতা আছে। তাহাদিগকে "বোঙা" অর্থাৎ ভূত বলে। পরিবারের কর্তা কাহারও নিকট তাহার নাম প্রকাশ করে না। পিতা মৃত্যুর সময় জ্যেষ্ঠ পুত্রের কানে কানে গৃহ দেবতার নাম বলিয়া যান।

তাহারা পিতৃপুরুষদিগের প্রেতাত্মার পূজা করে। শালকুঞ্জে পিতাপুরুষের প্রেতাত্মা ঘুরিয়া বেড়ায়। দেবতারাও শাল গাছে বাস করেন। তাহার উপশাখাই সাঁওতাল দিগের জাতীয় পতাকা। ইহারা নানাবিধ ভূতকে দেবতার মত পূজা করে। ঝড়ে যেন চালা খানা উড়িয়া না যায়, ছেলেকে যেন বাঘে না খায় ইত্যাদি ধরণের প্রার্থনাই তাহাদের মধ্যে অধিক। নদীর দেবতার নাম "দা বোঙা" কূপ দেবতার নাম "দাদি-বোঙা" পর্বতের দেবতার নাম "বুড়ো-বোঙা"। বন দেবতার নাম "বীর-বোঙা"। 'বীর' শব্দের অর্থ 'বন'। সাঁওতালদিগের মধ্যে ৭টি কুল (tribes) রহিয়াছে। : তাহাদের নাম—বেস্‌রা সরেন্, সুর্মু, মার্দি, কিস্কু চিল্, বিঁধা, ছুড়ু। এক এক কুলের এক একটি আলাদা বোঙা আছে।

এক কুলের লোকেরা অন্য কুলের বোঙার পূজা করিবে না। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আহার ও বিহারাদি চলিতে পারে—কিন্তু পূজা চলিতে পারে না।

"মারঙ বুড়" অর্থাৎ 'বিরাট পর্বত'ই, তাহাদের জাতীয় দেবতা, ইহার আসন যাবতীয় কুল দেবতার উপরে। সমগ্র জাতির কল্যাণ তাহার উপর নির্ভর করে। এই দেবতাকে অবলম্বন করিয়াই তাহাদের বিভিন্ন কুলের মধ্যে জাতীয় একতা রক্ষিত হয়। রক্তের দ্বারা এই দেবতার পূজা করিতে হয়। বলি না জুটিলে অন্তত রক্তবর্ণের ফুল ও ফলের দ্বারা তাহার পূজা সম্পন্ন হয়। এই দেবতার নিকটই তাহারা পূর্বে নরবলি দিত। বর্তমান সময়ে আইনের ভয়ে নরবলি উঠিয়া গিয়াছে। ছাগল, ভেড়া, বৃষ, মুর্গী, ধান, ফল, পুষ্প, মদ এবং এক মুষ্টি মাটি এই পূজার উপকরণ।

সাঁওতালগণ যখন কোনো নূতন জায়গায় উপনিবেশ স্থাপন করে, তখন যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা প্রথম যায় সেই নূতন গ্রামের "মাঝি" অর্থাৎ মোড়ল হয়। তাহার মৃত্যুর পর আবার নূতন মোড়ল নির্বাচিত হয়। গ্রামের মধ্যে যখন কোনো বিচার নিষ্পত্তির প্রয়োজন হয় তখন গ্রাম্য মোড়লের বাড়িতে দরবার বসে। গ্রামের অধিকাংশ লোকের মতানুসারে মোড়ল তাহার আদেশ প্রচার করেন! কিন্তু সেই বৈঠকে যদি দুই পক্ষই প্রবল হয় তবে মোড়ল বাহির হইতে আরও দুই তিন গ্রামের লোকদিগকে আহ্বান করে। তাহারা গ্রামের বাহিরে বৃক্ষতলে সমবেত হয়। সেখানে অধিকাংশের মতে যাহা স্থির হইবে তাহা সকলকে মানিয়া লইতেই হইবে।

সাঁওতালগণ তাহাদের সমাজের নারীদিগকে অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখে। নাচের সময় পুরুষগণ মাদল বাজায়, বহুসংখ্যক নারী একত্র হইয়া নৃত্য করে। অনেকে একত্র হইয়া গায়ে গায়ে ঘেঁসিয়া দাঁড়ায়। কাহারও আলাদা নৃত্য ভঙ্গী যাই। অর্দ্ধ বৃত্তাকারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ইহারা নৃত্য করে। সমগ্র শ্রেণীটি এক সঙ্গে মৃদু তালে পা ফেলিয়া সংযত চলন-ভঙ্গীতে শোভন গতি সঞ্চার করে। মেয়েদের নৃত্যে কোনো উন্মত্ততা নাই। তাহাদের সেই অর্ধ বৃত্তাকার শ্রেণীর সম্মুখে একজন পুরুষ মাদল বাজাইয়া নৃত্য করে। তাহার নৃত্য উচ্ছ্বাসময় মুক্ত চলন ভঙ্গীতে উদ্ধৃত। সাঁওতালেরা মদ্য পান করে বটে, কিন্তু নাচের জায়গায় কখনও নারীদের প্রতি তিল মাত্র অসম্মান প্রকাশ করে না।

সাঁওতাল বালকেরাও আবার নিজেদের মধ্যে বালক দলপতি বা মোড়ল নির্বাচন করে। কিন্তু বিবাহ করিলে সে আর তাহাদের উপর মোড়লী করিতে পারে না।

সাঁওতাল গ্রামে চুরি ডাকাতি ইত্যাদি কম হয়। ইহারা সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ। ইহাদের মোড়লেরা নিঃস্বার্থ ন্যায়-বিচারক।

মুক্ত আকাশ ও বাতাস ইহাদের একান্ত প্রিয় তাই ইহারা এখনও স্বভাবের ক্রোড়ে স্বাভাবিক জীবন যাত্রার সরলতার মধ্যে বাস করিয়া চরিত্রের এমন কতকগুলি মহত্ত্ব রক্ষা করিয়াছে যাহা বর্তমান সভ্যতার জটিল কৃত্রিমতার যুগে উন্নত সমাজে একান্ত দুর্লভ।

[*শান্তিনিকেতন পত্র*, ভাদ্র ১৩২৭।]

প্রাচীন ভারতে শ্রমজীবি-সমস্যা

বর্তমান সময়ে সভ্য জগতের সর্ব্বত্র শ্রমজীবিদের সমস্যা গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ডারউইনের যোগ্যতমের উর্ধ্বতন কথার দোহাই দিয়া ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতাকেই আমরা বর্তমান যুগের বাণিজ্য-প্রধান সভ্যতার মূলভিত্তি করিয়াছি।' বিগত শতাব্দীতে পৃথিবীর সভ্য রাষ্ট্রগুলি একথা বিস্মৃত হইয়াছিল যে, শ্রমজীবিরা কেবল কোম্পানীর কর্তাদের অনুজীবী জীব নহে, তাহারাও সমগ্র সমাজদেহের অঙ্গীভূত। তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে যদি গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী যথোপযুক্ত আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা না হয়, তবে তাহারা যে হীন জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইবে, তাহার কুফল সমগ্র সমাজকেই ভোগ করিতে হইবে। দারুণ জীবনসংগ্রামে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া তাহারা যে সকল দুর্নীতির পঙ্কে নিমগ্ন হয়, তাহা সমগ্র সমাজেরই দেহকে অসুস্থ করিয়া তোলে। এই অস্বাস্থ্য অবস্থার প্রতিকারের জন্য বর্তমান জগতে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। শ্রমজীবিগণ সমাজের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা তাহাদের স্বচ্ছন্দ গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী মজুরী নির্দ্ধারণের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে রাষ্ট্রীয় শক্তিকে বাধ্য করিতেছে। কারখানার ধনীদিগের ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার হস্তে মজুরদিগকে সমর্পণ করিয়া রাষ্ট্রশক্তি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছে না।

আমাদের ভারতবর্ষেও বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে বড়-বড় ধর্মঘট করিয়া শ্রমজীবিরা সমাজকে নাড়া দিতেছে। তাতার লোহার কারখানার বহু সহস্র শ্রমজীবির মর্ম-বেদনা আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের মনে যখন এই সমস্যার আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে, তখন প্রাচীন ভারতের নীতিশাস্ত্রকারগণ এ বিষয়ে কিরূপ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে এ বিষয়ে কোনও আলোকরেখা পাওয়া যায় কি না, তাহা দেখিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে।

শুক্রনীতিতে আমরা শ্রমজীবি-সম্বন্ধে (২,৩৯৮) নিম্নলিখিত উক্তি দেখিতে পাই—

> "যথা যথা তু গুণবান্ ভৃতকস্তদ্ভৃতিস্তথা।
> সংযোজ্যা তু প্রযত্নেন নৃপেণাত্মহিতায় বৈ॥"

'শ্রমজীবীগণের গুণানুসারে রাজা যত্নের সহিত, তাঁহার নিজেরই হিতের জন্য তাহাদের মজুরী নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন।'

এখানে "আত্মহিতায়" কথাটী বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। রাজা যে, কেবল দুঃখী শ্রমজীবিদিগের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া এই ব্যবস্থা করিবেন তাহা নহে ; তাঁহার নিজের কল্যাণ ইহার উপর নির্ভর করে। ইহারা অন্নাভাবে অসন্তুষ্ট যাপন করিলে তাহা সমগ্র রাজ্যেরই পক্ষে অকল্যাণকর। ইহা হইতে অন্তর্বিপ্লবের সূত্রপাত হইতে পারে। "আত্মহিতায়" কথাটির মধ্যে এই ভাবটিই রহিয়াছে।

যাহারা অল্প বেতন পায় তাহারা যে রাষ্ট্র ও সমাজের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, পরবর্তী শ্লোকে (২.৪০০) তাহা আরও পরিস্ফুট হইয়াছে—

> "যে হীনভূমিকা ভৃত্যাঃ-শত্রবস্তে স্বয়ং বৃতাঃ।
> পারস্য সাধকাস্তে তু ছিদ্র-কোশ-প্রজা-হরাঃ॥"

'যে সকল ভৃত্য অল্প বেতন পায় তাহাদিগকে নিজেই শত্রু করিয়া তোলা হয়। তাহারা শত্রুর কার্য সাধনের সাহায্যকারী হয়, তাহারা ছিদ্রান্বেষী, অর্থপহারী ও প্রজাগণের উৎপীড়ক।'

এই শ্লোকে বেশ স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে যে, হীনভৃতিকেরা অসন্তুষ্ট হইয়া ছিদ্রান্বেষী হয়, অর্থাৎ ইহারা সর্বদাই অশান্তি সৃষ্টি করিকার সুযোগ অন্বেষণ করে ; ইহারা রাজকোষ অথবা ধনীর অর্থ অপহরণ করে, এবং রাজ্যের প্রজাগণের উপর নানাবিধ উৎপীড়ন করিতে থাকে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও শুক্রনীতি আলোচনা করিলে বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, শুক্রনীতির সময়ে শ্রমজীবি-সমস্যা জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। অর্থশাস্ত্র অপেক্ষা শুক্রনীতির ব্যবস্থা আরও ব্যাপক। ইহাতে আমরা এ বিষয়ে বহু অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাই। যখন ভারতে বিশাল নগরীর সংখ্যা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। সেই সকল নগরীর ধনিসম্প্রদায়ের পাশেই দরিদ্র ভৃতক-শ্রেণীর মধ্যে দারিদ্র্য-সমস্যা কঠোরতর হইয়া উঠিয়াছে।

ভৃতক-গণের[১] বেতন নির্দ্ধারণের মূলনীতি সম্বন্ধে চাণক্যের অর্থশাস্ত্র ও শুক্রনীতিতে কোনও বিশেষ ভেদ নাই। সাধারণ নিয়ম এই—প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে পরস্পরের সম্মতিতে যে সর্ত্ত স্থির হইবে তদনুযায়ী বেতন দিতে হইবে। পূর্বে কোনও প্রকারের চুক্তি স্থির না থাকিলে "কর্ম্মকালানুরূপ" বেতন স্থির করিতে হইবে। এই বিষয়ে উভয়ের মত এক। শুক্রনীতিতে (২.৩৯২) এ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"কার্যমানা কালমানা কার্যকালমিনিস্ত্রিধা।
ভৃতিরুক্তা তু তদ্বিজ্ঞৈঃ সা দেয়া ভাষিতা যথা॥"*

'কার্য অনুসারে, কাল অনুসারে, অথবা কার্য কাল উভয় অনুসারে বেতন স্থির করিতে হইবে। বিজ্ঞগণ বেতন নির্দ্ধারণের জন্য এই তিন প্রকার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে পূর্বে যে প্রকার কথা দেওয়া হইয়াছে তদ্রূপই বেতন দিতে হইবে।'

শুক্রচার্য দৃষ্টান্ত দ্বারা (২.৩৯৩-৯৫) বিষয়টীকে আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন। কোনও দ্রব্য অমুক স্থানে বহন করিয়া দিলে তোমাকে এই পরিমাণ অর্থ দেওয়া হইবে, এইরূপ, সর্ত্তকে 'কার্যমান' চুক্তি বলে। তুমি যে কার্য করিবে তজ্জন্য তোমাকে প্রতি দিন, মাস বৎসর হিসাবে এই পরিমাণে বেতন দিব, এইরূপ চুক্তিকে 'কাল-মান' বলে। আর এত সময়ের মধ্যে এই পরিমাণ কার্য করিলে তুমি এত অর্থ পাইবে, এইরূপ চুক্তিকে 'কার্য-কাল-মান' বলে।

কিন্তু উক্ত ত্রিবিধ চুক্তির কোন প্রকারই পূর্বে স্থির না থাকিলে কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে? এ বিষয়ে কৌটিল্য (১৮৩ পৃঃ) বলিতেছেন—

"কর্ষকঃ সস্যানাং গোপালকঃ সর্পিষাং বৈদেহকঃ পণ্যানামাত্মনা ব্যবহৃতানাং দশভাগ-মসম্ভাবিতবেতনো লভেত।"

১. ভৃতক-গণের : আমরা যে অর্থে 'শ্রমজীবী' বলি চাণক্যের অর্থশাস্ত্র ও শুক্রনীতিতে সেই অর্থে 'ভৃতক' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

* "কর্মকালানুরূপ-মসম্ভাবিতবেতনম্।"

'পূর্বে বেতন স্থির না থাকিলে, হলচালক উৎপন্ন শস্যের দশমাংশ লাভ করিবে, রাখাল উৎপন্ন ঘৃতের দশমাংশ লাভ করিবে, এবং ব্যবসায়ী পণ্যদ্রব্যের দশমাংশ গ্রহণ করিবে।'

নারদ এই দশমাংশই সমর্থন করিতেছেন—

"ভৃতাবানিশ্চিতায়াং ভু দশমং ভাগমাপ্নুয়ুঃ।
লাভে গোবীর্য্যশস্যানাং বণিগ্‌গোপকৃষীবলাঃ।"

বর্তমান সময়েও দেশের নানা স্থানে কৃষিপরিচালনায় এইরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রমজীবী গৃহস্থের জমির চাষ-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সমাধা করিয়া এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হয়। কোনও ফসল ক্ষেত হইতে তুলিয়া দিয়া ভৃতক তাহার পঞ্চমাংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

কৃষি, বাণিজ্য, ও গোপালন ছিল তখনকার দিনের প্রধান উপজীবিকা। এই সমস্ত বিষয়ে তখন অধিকতর সহযোগিতার ভাব বর্তমান ছিল। নির্দ্দিষ্ট বেতন গ্রহণ অপেক্ষা লভ্যাংশ গ্রহণ করিবার প্রথা প্রাচীন কালে এদেশে অপেক্ষাকৃত সফলতা লাভ করিয়াছিল। বৃহস্পতির মতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভৃতক লাভের তৃতীয়াংশ বা পঞ্চমাংশ গ্রহণ করিবে। ভৃত্য যদি আহার ও বস্ত্রাদি পায় তবে লাভের পঞ্চমাংশ গ্রহণ করিবে, নতুবা উৎপন্ন শস্যের তৃতীয়াংশ গ্রহণ করিবে।*

গোপালনে এই সহযোগিতার প্রথাই বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। মনুর মতে, কোনও গৃহস্থের দশটী গাভী থাকিলে তন্মধ্যে যেটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাখাল তাহার দুগ্ধ পাইবে। বহু ধেনুপালন সম্বন্ধে নারদ বলেন :—

"গবাং শতাদ্ বৎসতরো ধেনুঃ স্যাৎ দ্বিশতাদ্ ভৃতিঃ।
প্রতিসংবৎসরং গোপে সংদোহশ্চাষ্টমেহহনি॥"

'একশত গাভী রক্ষা করিলে রাখাল প্রতি বৎসর একটি পাইবে। দ্বিশত গাভী রক্ষা করিলে একটী ধেনু গ্রহণ করিবে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক অষ্টম দিনের সমস্ত দুগ্ধ তাহার প্রাপ্য।

'সমুদ্রগামী নাবিকদের বেতন সম্বন্ধে বৃদ্ধমনুতে (বিবাদার্ণবসেতু,[২] ১৬৮ পৃ) নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাওয়া যায়—

"সমুদ্রযাত্রাকুশলা দেশকালার্থবেদিনঃ।
নিয়চ্ছেয়ুর্ভৃতিং ষাং তু সা স্যাৎ প্রাগকৃতা যদি॥"

'পূর্বে কিছু নির্দ্ধারিত না থাকিলে সমুদ্রযাত্রায় কুশল, দেশকালার্থবিদ্‌গণ তাহাদের বেতন স্থির করিয়া দিবেন।'

অবশ্যপ্রতিপাল্য স্বজন বর্গের ভরণ পোষণের ক্লেশ না হয় শুক্রচার্য্য এইরূপ বেতন নির্দ্ধারণের জন্য উপদেশ দিয়াছেন (২.৩৯৯)—

"অবশ্যপোষ্যবর্গস্য ভরণং ভৃতকায় ভবেৎ।
তথা ভৃতিস্তু সংযোজ্যা তদ্‌যোগ্যভৃতকায় বৈ॥"

* বিবাদার্ণবসেতু, ১৬৮ পৃঃ। ± বিবাদার্ণবসেতু, ১৭৪ পৃঃ।

২. বিবাদর্ণসেতু. ১৬৮ পৃ:

শ্রমজীবিগণ অতিকষ্টে নিজ-নিজ উদরের অন্ন সংস্থান করিতে সমর্থ হয়। নিজের পিতা-মাতা, স্ত্রী, বিধবা ভগ্নী ইত্যাদি—অবশ্য-প্রতিপাল্য স্বজনবর্গের কথা দূরে থাকুক, তাহারা নিজের শিশুসন্তানেরও ভরণ-পোষণের উপযোগী বেতন লাভ করে না। সেইজন্য শিশুশ্রম (child labour) নামে নিদারুণ ব্যাপার এদেশের কল-কারখানার সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহে রক্ষণীয়া নারীগণকে যদি জঠর-জ্বালার তাড়নার কারখানা ঘরে প্রবেশ করিতে হয়, তবে দরিদ্র্যের দুঃখ-তাপের মধ্যে একমাত্র শান্তির স্থল যে গৃহ, তাহাও শ্মশানে পরিণত হয়। প্রাচীন হিন্দুগণ পারিবারিক আদর্শকেই সমাজসৌধের মূলভিত্তি মনে করিতেন বলিয়া শ্রমজীবিগণের পারিবারিক জীবন যাহাতে নষ্ট হইয়া না যায় এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া "অবশ্য-পোষ্যবর্গ" কথাটির উপর জোর দিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশে যেমন Old Age Pension, Providend Fund ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে, প্রাচীন ভারতে তদনুরূপ সুব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু এই ভাবটা একেবারে তখন অজ্ঞাত ছিল না। শুক্রনীতির নিম্নলিখিত শ্লোকে (২,৪১৪) আমরা তাহার পরিচয় পাই—

"ষষ্ঠাংশং বা চতুর্থাংশং ভৃর্তেভৃত্যস্য পালয়েৎ।
দদ্যাৎ তদর্দ্ধং ভৃত্যায় দ্বিত্রিবর্ষেহখিলং তু বা।"

'ভৃত্যের বেতনের ষষ্ঠাংশ বা চতুর্থাংশ রক্ষা করিবে। সময় বা অবস্থা বুঝিয়া) দুই কিংবা তিন বৎসর পর তাহার অর্দ্ধেক অথবা সমস্তই ফিরাইয়া দিবে।'

বিশেষ প্রয়োজনের সময়ে যাহাতে নিরাশ্রয় হইতে না হয়, তজ্জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

যে দেশে লোকে ইচ্ছা-সত্ত্বেও উপযুক্ত কার্য পায় না, সেখানে নানা অশান্তির সৃষ্টি হয়। এই বেকার সমস্যার (unemployment problem) মীমাংসা করাই রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রধান কর্তব্য।

এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, অযোগ্য লোকের সংখ্যা ত কম নহে, তাহাদের দ্বারা কি কার্য হইবে? তদুত্তরে শুক্রাচার্য (২.১২৬) বলিতেছেন—

"অমন্ত্রমক্ষরং নাস্তি নাস্তি মূল-মনৌষধম্।
অযোগ্যঃ পুরুষো নাস্তি যোজকস্তত্র দুর্লভঃ॥"

'এমন কোনও অক্ষর নাই যাহা মন্ত্র নহে, এমন কোনও মূল নাই যাহা ঔষধ নহে, এবং এমন কোনও পুরুষ নাই যে অযোগ্য। কেবল তাহাকে (যথাযথাভাবে) নিয়োগ করিবার উপযুক্ত লোকই দুর্লভ।'

বাস্তবিক আমরা দেখিতে পাই, অক্ষর মাত্রই শক্তিহীন বলিয়া প্রতিভাত হয়, কিন্তু কোনও সুনিপুণ কবি যখন অক্ষর সকলকে যথা স্থানে যোজনা করিয়া ছন্দের সাহায্যে ভাব সঞ্চার করেন, তখন সেই সকল অক্ষরই শক্তির আধার হইয়া উঠে। সাধারণ লোকের নিকট যে তরুগুল্মের কোনও মূল্য নাই, রোগ ও ঔষধ নির্ণয়ে সুনিপুণ বৈদ্যের নিকট তাহা কত মূল্যবান্। সেইরূপ মনুষ্যমাত্রই শক্তির আধার। মানুষকে বেকার বসিয়া থাকিতে দেওয়া প্রভূত শক্তির অপচয়-মাত্র। এই জগতের কর্ম্মক্ষেত্র এত বিচিত্র ও বিপুল যে, এখানে ছোট-বড় পণ্ডিত-মূর্খ সকলেরই করণীয় বহু কার্য রহিয়াছে। সেই

সকল মহাপুরুষ কোথায় যাঁহারা এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীক ব্যবহারের দৃঢ় সংস্কার সাধন করিয়া, ছোট-বড় সর্বশ্রেণীর মানুষকে যথাস্থানে যোজনা করিয়া, প্রত্যেকের জন্য কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দিবেন, এবং বাধাসঙ্কুল ব্যবস্থাকে অপসারিত করিয়া মানবের আত্মোন্নতির পথকে অব্যাহত করিবেন? সমগ্র জগদ্‌ব্যাপী গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে এই শ্রমজীবি-সমস্যা লইয়া হানাহানি চলিতেছে। কিন্তু ইহাদিগকে যথাস্থানে নিযুক্ত করিয়া সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে এমন যোগ্য লোক কোথায়? "যোজকস্তু সুদুর্লভঃ!"

[*শান্তিনিকেতন-পত্র*, বৈশাখ ১৩২৭।]

শৈশবে ভাষাশিক্ষার সহজ প্রণালী

আমাদের দেশে ভাষাশিক্ষা-প্রণালীর প্রধান ত্রুটি এই যে, শিশুদিগের বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে লিখন ও পঠনের সাহায্যই তাহাদের ভাষা শিক্ষার একমাত্র অবলম্বন হইয়া দাঁড়ায়।

লিখন ও পঠনে প্রধানতঃ চক্ষু ও রসনাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই পর্বে চক্ষুই তাহার ভাষা-শিক্ষা-সংগ্রামের প্রধান অস্ত্র। কিন্তু শিক্ষা-বিজ্ঞান-বিদ্‌ পণ্ডিতেরা বলেন যে, ভাষা শিক্ষার প্রথমাবস্থায় শিশুদিগের চক্ষুকে নিয়োগ না করিয়া কর্ণকেই সারথি করিতে হইবে। কর্ণ ও রসনা এই উভয়ের মিলিত শক্তির সাহায্যেই ভাষা শিক্ষার উদ্যোগ পর্ব অনায়াসে অতিক্রম করিয়া, শিশুরা দ্বিতীয় পর্বে চক্ষু রসনা ও কর্ণের ত্রিবেণীসঙ্গমে ভাষাকে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিবে।

কথাটা আরও একটু বিশদরূপে বুঝাইয়া বলিতেছি। শিশু যখন মাতৃক্রোড়ে ভাষা শিক্ষা করে তখন সে একটা শব্দ বারবার শোনে এবং তাহা উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করে, তারপর সেই শোনা কথা যে বস্তুর প্রতি প্রয়োগ করা হয় তাহার প্রতি তাহার লক্ষ্য যায়, এবং দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সে যথাবিষয়ে যথোপযুক্ত পদ ব্যবহার করিয়া থাকে। শিশুদিগের এই স্বাভাবিক বৃত্তি অনুযায়ী যে শিক্ষা চলে তাহাই সহজ ও সফল হয়। বিদ্র. ইহার ব্যতিক্রমে পুস্তকনিবদ্ধ যে পদ্ধতি তাহা আবার আয়াস সাধ্য ও সময়-সাপেক্ষ। যেমন, দুইটি ছেলে হিন্দী শিক্ষা অভিলাষী—কিন্তু তাহারা বিভিন্ন পন্থী। একজন শুধু পুস্তকের সাহায্যেই ভাষাকে আয়ত্ত করিতে চায়। অপরটি হিন্দী ভাষী লোকের সঙ্গে থাকিয়া কথাবার্তা আলাপ আলোচনায় অভীষ্ট সাধন করিতে ইচ্ছুক। ফলতঃ দেখা যাইবে প্রথমোক্ত ছেলেটির কেতাবের ভিতর দিয়া শুধু দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে অভিযান, তাহা হইতে দ্বিতীয় ছেলেটির শ্রবণ ও দর্শন উভয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রয়াস দ্রুততর অগ্রসর হইতেছে।

শিশুদের মাতৃভাষা শিক্ষার সময় আমরা দেখিতে পাই, প্রথমতঃ সে শোনে, তারপর সে বলে, ও বহুদিন পরে যে পড়িতে ও লিখিতে সক্ষম হয়। ইহাই ভাষা শিক্ষার স্বাভাবিক নিয়ম। মাতৃভাষা শিক্ষার সময় আমরা যে নিয়ম দেখিয়া থাকি, বিদেশী ভাষা শিক্ষায়ও

অল্পাধিক পরিমাণে সে নীতির অনুসরণ করিতে হইবে। এই প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণ করি না বলিয়াই আমরা বাঙ্গালী শিশুদিগকে বিদেশী ভাষা শিক্ষা দিতে গিয়া অকৃতকার্য হই। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম পর্বটা তাহাদের নিকট নীরস ও যন্ত্রণাদায়ক মনে হয়। বাঙ্গালী শিশুকে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দিতে হলে প্রথমতঃ কথোপকথনের দ্বারা ভাষার প্রতি তাহার আগ্রহ সঞ্চার করিতে হইবে। প্রতিদিন সে যাহা সম্মুখে দেখে ইংরেজি ভাষার মধ্য দিয়া সেগুলির সহিত নূতন পরিচয় লাভ করিবার পরে তাহাকে পড়িতে দিতে স্বভাবতই পাঠের প্রতি তাহার আগ্রহ জন্মে, এবং শব্দগুলির সহিত পূর্ব পরিচয়-হেতু সহজে তাহার পাঠ অগ্রসর হয়। শিশুদিগকে ভাষা শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে বাঙ্গালী শিশুদিগকে ইংরেজ শিক্ষা দিতে হইলে প্রথমতঃ ইংরেজি কথাবার্তার দ্বারা আয়ত্ত্ব করিতে হইবে। প্রথমেই অক্ষর এবং তারপরেই word book কণ্ঠস্থ করান অথবা বড় ও ছোট হাতের A, B, C, D লিখন ইত্যাদি চাপ হইতে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিতে হইবে। প্রথমতঃ কর্ণের সাহায্যে শিক্ষালাভ করিয়া পরে কর্ণ রসনা ও চক্ষুর সম্মিলিত ব্যবহার আরম্ভ করিতে হইবে।

শিক্ষাদানের দুইটি প্রণালী আছে। একটিকে inductive বা আরোহ পদ্ধতি বলে ; অপরটিকে deductive বা অবরোহ পদ্ধতি বলে। সংস্কৃত গ্রীক লাটিন ইত্যাদি ভাষা শিক্ষা করিবার সময় আমরা পূর্বে ব্যাকরণের বাঁধন সূত্র কণ্ঠস্থ করিয়া সেই বাঁধা রাস্তার মধ্য দিয়া ভাষার রাজ্যে প্রবেশ করি। কিন্তু ইংরেজি, ফরাসি, হিন্দি, বাঙ্গলা প্রভৃতি জীবন্ত ভাষা। এ-সকল ভাষা শিক্ষা দেওয়ার প্রারম্ভে ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্যই হইল শিশুর স্বীয় অনুশীলন বৃত্তিকে জাগ্রত করা। স্বীয় চেষ্টা দ্বারাই সে সত্যের পথে অগ্রসর হইবে। তাহার মধ্যে তত্ত্বানুশীলনের শক্তি সঞ্চার করিয়া দেওয়াই শিক্ষকের কর্তব্য। পর্যবেক্ষণ দ্বারা ব্যবহার করিতে করিতে সে নিজেই ব্যাকরণের সত্যগুলিকে ধরিতে শিখিবে। পূর্ব হইতেই সেগুলি কণ্ঠস্থ করাইলে তাহাকে স্বীয় আবিষ্কার-জনিত আনন্দ হইতে বঞ্চিত করা হয়। তাহাতে শিশুর আগ্রহ কমিয়া যায়। অতএব ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহাকে ভাষার মৌখিক রচনা শিক্ষা দিতে হইবে।

ইংরেজ শিশু যেমন মায়ের কথা অনুকরণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করে, বাঙ্গালী শিশুও তেমনি শিক্ষকের মুখে সহজ সহজ ইংরেজি কথা শুনিয়া তাহা অনুকরণ করিয়া শিখিবে। যথা—শিক্ষক নিজের হাত দেখাইয়া বলিবেন This is my hand ; শিশুও তখন তাহার নিজের হাত দেখাইয়া বলিবে This is my hand। এভাবে প্রথমতঃ অনুকরণ করিয়া শিখিবে। ইহাতে শিশু খেলার মত অনেকটা আমোদও পাইবে। শিক্ষক আগাগোড়া বক্তার আসনে বসিয়া থাকিবেন আর শিশু শ্রোতার ন্যায় নির্বাক থাকিয়া ভাষা শিক্ষা করিবে ইহা সম্ভবপর নহে। প্রথম হইতেই তাহাকে বলাইতে হইবে। সাধারণত: word book-এর কতগুলি কথার ইংরেজি প্রতিশব্দ শিখান হয়। তারপর আমাদের বাক্য রচনার পাঠ দেওয়া হয়। ইহাতে শিশুদের মস্তিষ্ককে অযথা ভারাক্রান্ত করা হয় মাত্র। প্রথম হইতেই অক্ষর পরিচয়েরও পূর্বে তাহাদের ইংরেজি বাক্য রচনা অভ্যাস করাইতে হইবে। শিশু যখন মাতৃভাষা শিক্ষা করে তখন প্রথম হইতেই বাক্য রচনার চেষ্টা করে। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে বাক্য-রচনার আনন্দ লাভ করিবে। শিক্ষক নিজে বসিতে গিয়া

বলিলেন I sit down ; শিশু তখনই তাঁহার উপবেশনের কার্য দেখিয়া কথাটির মানে সহজে বুঝিতে পারিল। এবং নিজে I sit down বলিয়া বসিয়া আনন্দ পাইল। আনন্দের কারণ এই যে, I sit down কথাটির সমগ্র মানেটা তাহার কাছে খুব পরিষ্কার হইল।

কিন্তু I এবং Sit down এই শব্দ দুইটির আলাদা আলাদা বাংলা প্রতিশব্দ শিখিয়া সে আনন্দ পাইতে পারে না। কারণ 'I' মানে 'আমি' বলিলে কোনও বাক্য শেষ হয় না। ইহাতে শিশুরা রস পায় না। সেইজন্য বাক্য রচনার সঙ্গে সঙ্গেই নূতন নূতন শব্দ শিক্ষা দিতে হইবে। পূর্বে আল্‌গা শব্দের তালিকা মুখস্থ করাইয়া পরে বাক্য রচনার চেষ্টা সম্পূর্ণ বর্জনীয়।

বস্তু পরিচয়ের দ্বারাই ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে। প্রথমতঃ সম্মুখস্থ বস্তুসমূহের নাম শিক্ষা দিতে হইবে যথা—man, pencil, book ইত্যাদি।

তারপর ক্রিয়ার ব্যবহার সুরু করিবে। যথা—I sit down, I stand, I walk, I run ইত্যাদি। কার্য দেখিয়া সে ক্রিয়ার ব্যবহার শিক্ষা করিবে।

ক্রিয়া ব্যবহারের ধারণা জন্মিলে বিশেষণের সহিত পরিচয়ের সূত্রপাত হইবে। Manটি কিরূপ? না, Fat man। Blue sky, white paper ইত্যাদির ব্যবহার ক্রিয়ার পর আরম্ভ করিতে হইবে। বিশেষণের পরে ক্রিয়ার বিশেষণের ব্যবহার। Slowly, loudly ইত্যাদি কথার ব্যবহারের সময় আমরা অনেকটা concrete হইতে abstractএ আসিয়া পড়িলাম। Adverbএর ব্যবহারও কার্যের দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিবে। যথা, I speak loudly, I speak gently, ইত্যাদি বলার সঙ্গে সঙ্গে বলার ধরণের মধ্যে যেন শিশুরা loudly ও gently কথার মানেটা বুঝিতে পারে।

সর্ব্বশেষে prepositionএর ব্যবহার। ইহার ব্যবহারের দ্বারা শিশুরা একটা বস্তুর সহিত অপর আরেকটি বস্তুর সম্বন্ধ কি তাহা বুঝিতে সমর্থ হইবে। যথা—আমার বইখানা টেবিলের উপরে নীচে কি পাশে তাহা বুঝাইবার জন্য preposition ব্যবহার। অর্থাৎ টেবিলের সঙ্গে বইখানার যথার্থ সম্বন্ধটা কি অবস্থার, তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝাইতেছে এই preposition। Concerete হইতে abstract-এর দিকে অগ্রসর হইতে হইলে প্রথমতঃ বস্তুর সহিত পরিচয়, তার কার্য্য, কি প্রকারের বস্তু এবং কার্য, বস্তুগুলির মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ ইত্যাদি প্রশ্নের মধ্য দিয়া আমাদের মন ক্রমে পাঁচটি ধাপ আরোহণ করে। এই পাঁচ ধাপের নামই হইল noun, verb, adjective, adverb, preposition.

অনেকে অনেক সময় বিদেশী ভাষায় কথোপকথন আরম্ভ করিয়া প্রথম হইতেই prepositionএর ব্যবহার চালাইয়া থাকেন। এরূপ এলোমেলোভাবে কথোপকথন শিশুদিগের ভাষা শিক্ষার প্রারম্ভে বড়ই ক্ষতি করে। শিক্ষক সর্বদাই শিশুদের মনস্তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তদনুযায়ী উল্লিখিত প্রণালীর সাহায্যে ভাষা শিক্ষা দিলে শিশুদিগের মনে সহজেই অনুরাগ বৃদ্ধি হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে—শিক্ষক যে বিষয়ে শিক্ষা দিবেন, তাহার প্রতি শিশুর মনকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা এবং তাহার চিত্তে সরস আগ্রহ সঞ্চার করিয়া দেওয়াই শিক্ষকের পক্ষে প্রধান কৃতিত্ব। শিক্ষিতব্য বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য থাকিলে পণ্ডিত হওয়া যায়, কিন্তু শুধু পাণ্ডিত্যের দ্বারা শিক্ষক হওয়া চলে না। শিশুগণপরিবেষ্টিত শিক্ষক যেখানে তাঁহার শিষ্যগণের সহিত নিজের মনের ব্যবধান অপসারিত করিয়া শিশু মনের

গতি অনুসরণে নিজের শক্তিকে প্রয়োগ করেন সেখানেই তাঁহার শিক্ষকতা সফলতা লাভ করিবে।

[*প্রবাসী* মাঘ, ১৩২৮।]

৭ই পৌষের মেলা

মহর্ষির দীক্ষার দিন ৭ই পৌষ। প্রতি বৎসর এই দিনে আশ্রম-সংলগ্ন প্রান্তরে দূরদূরান্তর হইতে বহু লোকের সমাগম হয়। এই মেলা উপলক্ষ্যে আশ্রমিকদের সহিত জনসাধারণের যাহাতে মিলন সাধিত হয়, এ বিষয়ে এবৎসরে চেষ্টা করিবার সঙ্কল্প ছিল। সেই জন্য এবারের মেলায় অন্যবারের তুলনায় কিছু স্বাতন্ত্র্য ছিল। একদিকে কীর্তনের আখড়া বসিয়াছিল ; আরেক দিকে দুই দল বাউল একতারা বাজাইয়া নৃত্য করিতে করিতে সঙ্গীতের সুরে সকলকে মুগ্ধ করিয়া বেড়াইতেছিল। কোথাও বা মন্দিরের গায়ক শ্যাম ভট্টাচার্য ও আশ্রমবালকগণ বৃক্ষতলে বসিয়া বাউলের সুরে গান গাহিতেছিল। মেলার এক প্রান্তে কৃষিবিদ্ শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার মহাশয় একটি গো-প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন। তিনি গো-জাতির স্বাস্থ্য ও উন্নতি সম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সাধারণকে বুঝাইয়া দিতেছিলেন।

ইলামবাজারে একদল কারিকর আছে। তাহারা উৎকৃষ্ট গালার দ্রব্য প্রস্তুত করে। মেলার আর একধারে তাহারা গালার দ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী সাধারণকে দেখাইতেছিল। আশ্রমের ছাত্রদিগের মধ্যে যে সমবায় ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে তাহার একটি দোকান মেলাতে খোলা হইয়াছিল। ছাত্রগণই তাহার বিক্রেতা ছিল। তাহারাই দোকানের হিসাব ইত্যাদি রাখিয়াছে। আরেক দল ছাত্র একটি সমবায় "খাদ্য ভাণ্ডার" খুলিয়া সাধারণের জন্য বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিয়াছিল। ছাত্রেরা নিজেরা মূলধন তুলিয়া নিজেরা দোকানের ঘরনির্মাণ ক্রয়বিক্রয় ও হিসাবরক্ষা ইত্যাদি যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই অল্পবয়স্ক বালক।

সন্ধ্যার সময় মেলায় একটি বড় সভা হয়। জেলার সহৃদয় ম্যাজিস্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নিকটবর্তী পল্লীসমূহের জলকষ্ট-নিবারণ, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, ম্যালেরিয়া হইতে আত্মরক্ষার উপায়নির্দ্ধারণ, সমবায় প্রণালীতে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন বিষয়ে আলোচনা হয়, এই সভায় স্থানীয় মুন্সেফ বাবু, হোসেন সাহেব ও অধ্যাপক মহাশয়গণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট্ মহোদয়ের সহিত কতিপয় কৃষক এ বিষয়ে মন খুলিয়া আলাপ করে। জনসাধারণ একান্ত আগ্রহের সহিত বক্তাদিগের কথা শুনিয়াছিল এবং কেহ কেহ নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া কথাগুলি ভালো করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

দ্বিপ্রহরে মেলায় পার্শ্ববর্তী গ্রামের সাঁওতালদের তীরচালনার প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রদর্শনীয় হইয়াছিল—সর্বপ্রথম সাঁওতাল ৩্ টাকা, দ্বিতীয় জন ২্ টাকা ও অন্যান্য সকলে ১্ টাকা করিয়া পুরস্কার পাইয়াছে।

মেলার জন্য ডা: দ্বিজেন্দ্র নাথ মৈত্র মহাশয় বঙ্গীয় হিতসাধন-সমিতির বহুসংখ্যক ছবি প্রেরণ করেন। ৮ই এবং ৯ই পৌষ উক্ত ছবিগুলির প্রদর্শনী হইয়াছিল। দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও নৈতিক দুরবস্থা সম্বন্ধে ১০৭ খানি ছবি দেখান হইয়াছিল। যাহারা লেখাপড়া জানে না, ছবি অবলম্বনে দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দিলে তাহা তাহাদের মনে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়া থাকে। এই ছবিগুলি সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষেই বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। আমরা ডাক্তার মৈত্র মহাশয়কে ইহার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

[*'শান্তিনিকেতন' পত্র,* মাঘ ১৩২৬।]

মুক্তিদাপ্রসাদ

আশ্রমের ভূতপূর্ব ছাত্র মুক্তিদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের অকস্মাৎ মৃত্যুসংবাদে আমরা বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। মুক্তিদা দুই বৎসরমাত্র এই আশ্রমে অধ্যয়ন করিয়াছিল, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই আশ্রমের বিবিধ কর্মানুষ্ঠানে তাহার প্রাণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। প্রথমে তাহাকে দেখিয়া মনে হইত কিছুতে যেন তাহার আসক্তি নাই। আশ্রমে নিয়মের দিকে জীবনযাত্রার যে কঠোরতা আছে বোধ হয় তাহার নিকট প্রথমে তাহা প্রীতিকর হয় নাই। কিন্তু দু'চারদিন পরেই সে দেখিতে পাইল, এখানে নিয়মই একান্ত নহে। বস্তুত এখানকার নিয়ম দাঁড়ের নিয়ম নহে তাহা নীড়ের নিয়ম ; এই নিয়ম-বেষ্টনীর মধ্যে হৃদয়ের স্বাধীনবিকাশের পক্ষে এই আশ্রমেই সর্বাপেক্ষা অনুকূল স্থান রহিয়াছে। এখানে ছাত্রেরা নিজেরাই নিয়মের চালনাভার গ্রহণ করিয়াছে, এবং এই নিয়মকে অবলম্বন করিয়াই ছাত্রদের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের অনুষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিতেছে। ভিতরের এই ভাষাটাকে উপলব্ধি করা মাত্রই মোক্ষদা সম্পূর্ণভাবে ইহাকে গ্রহণ করিল এবং এই নিয়মতন্ত্রকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় পূর্ণোদ্যমে নিযুক্ত হইল। তাহার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই সে একজন দক্ষ অধিনায়করূপে ছাত্রদের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিল। সহপাঠীদিগকে চালনা করিবার উপযুক্ত শক্তি ও তেজ তাহার মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সে রুগ্ন ছিল বলিয়া শরীররক্ষার জন্য তাহার সাবধান থাকার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কিন্তু যখন তাহার মনে কাজের উৎসাহ আসিত তখন স্বাস্থ্য বাঁচাইয়া চলিবার দিকে তাহার দৃষ্টি থাকিত না।

মুক্তিদার সব সক্রিয়তাগুণ আমরা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। এই আশ্রমের পার্শ্ববর্তী ভুবনডাঙ্গা গ্রামের্ অধিবাসী অনেকেই হাড়ি ডোম প্রভৃতি শ্রেণীভুক্ত। তাহাদের মধ্যে প্রায়সকলেই মজুরী করিয়া যাহা অর্জন করে তাড়ি খাইয়া তাহা উড়াইয়া দেয়। ইহাদের সন্তানগুলি ক্ষুধার তাড়নায় আশ্রমের রান্নাঘরের পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট কাড়াকাড়ি করিয়া খাইয়া থাকে। মাঝে মাঝে শিশুদের ঘরে ঢুকিয়া কাপড় জামা ইত্যাদি চুরিও করে। ইহাদের মুক্তিদার চোখে পড়ে। তাই এক সময়ে আমরা দেখিতে পাইলাম, বিকালে খেলার ঘণ্টা পড়িবামাত্রই তাহার বাড়ীর আঙিনায় সেই ছেলেরা আসিয়া জুটিতেছে

এবং মুক্তিদা নানাবিধ মজার গল্প বলিয়া তাহাদের চিত্তবিনোদন বলিতেছে। সে তাহাদের সঙ্গে খেলা করিত এবং তাহাদিগের লইয়া দল বাঁধিয়া মাঝে মাঝে বেড়াইতে যাইত। তাহার বন্ধু বিজয় বাসু এবং আরো দুই একটি ছাত্র তাহাকে সাহায্য করিত বটে, কিন্তু সেই ছিল প্রধান উদ্যোগী। ছেঁড়া কাগজ ও পুরানো খবরের কাগজ প্রভৃতি কুড়াইয়া বোলপুর বাজারে সে নিজে বহিয়া লইয়া যাইত এবং বিক্রয়, করিয়া যে টাকা পাইত তাহা হইতে বালকদের শ্লেট, পেন্সিল, খাতাপত্রের খরচ চালাইত। সে যেমন হৃদ্যতার সহিত এই সকল দরিদ্র বালকের সহিত আপন জনের মত মিশিতে পারিয়াছিল তেমন অল্প ছাত্রের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। দেখিতে দেখিতে তাহার বাড়ির কাছে পাঠশালা বসিয়া গেল, তাহার এই চেষ্টার ফলেই অতি অল্প দিনের মধ্যে ভুবনডাঙ্গায় একটি নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত হইল। আশ্রম প্রান্তের এই নৈশবিদ্যালয়টি এখনও মুক্তিদার সহৃদয়তার স্মৃতিচিহ্নরূপে বর্তমান।

তাহার শরীরের দৌর্বল্য তাহার চরিত্রের উদ্যমশীলতার যেন মাপ-কাঠি ছিল ; দেহের এই কৃশতা তাহার মনের উৎসাহশক্তিকেই সপ্রমাণ করিত। সাধারণ ছাত্রদের মত সে কেবলমাত্র আপনার পড়ার বই লইয়া থাকিত না, সাহিত্যসভা তর্কসভা প্রভৃতি ছাত্রমণ্ডলীর সকল অনুষ্ঠানেই সকল মন দিয়া সে যোগ দিয়াছিল। অনেক সময়ে দেখা যায়, যে সকল ছেলে সৎকর্মে উৎসাহী তাহারা অত্যন্ত বেশি গম্ভীর হয়, এমন কি, হাসি কৌতুককে তাহারা অন্যায় চাঞ্চল্য বলিয়া মনে করে। মোক্ষদা একেবারে ইহার উল্টো ছিল। তাহার মন হইতে সর্বদাই একটি নির্মল কৌতুকের ধারা উৎসারিত হইত। আশ্রমে গত ২রা বৈশাখে যে মেলা হইয়াছিল, সেই, মেলায় মোক্ষদা যে দোকান রাখিয়াছিল তাহাকে হাসির দোকান বলা চলে, বৈশাখের শান্তিনিকেতন পত্রে তাহার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

সাহিত্যসভায় তাহার মুখে হাস্যরসের কবিতা শুনিবার জন্য সকলেই উৎসুক হইত। সন্দেশের হাসির কবিতাগুলি সে বড়ই সরসতার সহিত আবৃত্তি করিয়া বালক এবং বয়স্ক সকল শ্রোতাকেই আনন্দ দিত।

মুক্তিদা অল্পদিন হইল আশ্রম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গিয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস, আশ্রম হইতে বুদ্ধির এবং চরিত্রের একটি বিশেষ উৎসাহবেগ সে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিল। আমরা আশা করিয়াছিলাম বড় হইয়া একদিন সে তাহার তেজস্বী সত্যব্রত দেশহিতানুধ্যায়ী পিতার উপযুক্ত সন্তান হইতে পারিবে। পৃথিবীতে সে আশা পূর্ণ হইল না। আমরা কবির এই গানটী স্মরণ করিতেছি,

যে ফুল না ফুটিতে
ঝরিল ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে
হারাল ধারা
জানি গো জানি তাও
হয় নি হারা।

[*'শান্তিনিকেতন' পত্র*, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৬।]

আকরগ্রন্থ

জীবনের ধ্রুবতারা : শান্তিদেব ঘোষ
রবিজীবনী : প্রশান্তকুমার পাল
রবীন্দ্র-জীবনী : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্র-পরিকর : পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্র প্রসঙ্গ : *আনন্দবাজার পত্রিকা* : চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন : প্রমথনাথ বিশী
শান্তিনিকেতনে পরিবেশচর্চা : দেবীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতনের একযুগ : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত